স্মৃতির পাতা থেকে

পি এ নাজির

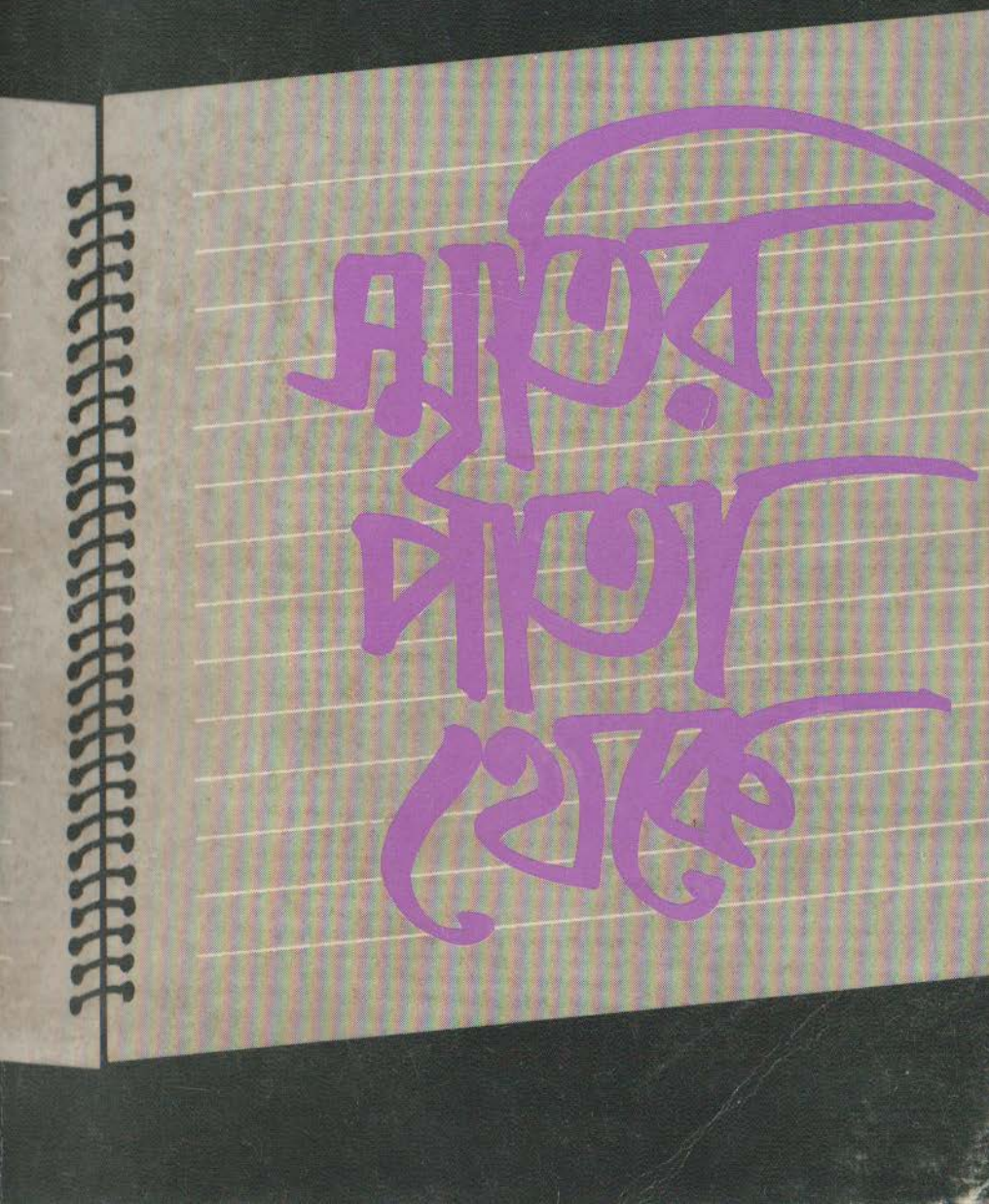

স্মৃতির পাতা থেকে

পি এ নাজির

নতুন সফর প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রকাশকঃ মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের পক্ষে
মুহম্মদ আশরাফ হোসেইন

প্রথম প্রকাশঃ ১৭ আষাঢ়- ১৪০০, ৮ মহররম-১৪১৪, ১ জুলাই- ১৯৯৩

প্রচ্ছদঃ আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজঃ বর্ণক কম্পিউটার্স
৭/এ, সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণঃ মাসরো প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
১৪৩/বি, ১৪৫/বি, আরামবাগ ঢাকা-১০০০

মূল্যঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র
US $ 10.00 only.

যোগাযোগঃ নতুন সফর প্রকাশনী
৪৪, পুরানা পল্টন (দোতলা), ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ২৪৩৮৮৮

SMRITIR PATA THEKE
(MEMOIRS OF P A NAZIR)
BY P A NAZIR
First Edition: July 1993

www.pathagar.com

কৈফিয়ত

স্মৃতির পাতা খুলতে গেলাম কেন- এ প্রশ্ন অন্যের মত আমারও। আমা হেন সমাজের একজন নগণ্য মানুষের আবার এই বিলাসিতা কেন? আমার স্মৃতির পাতা কার কি কাজে আসবে- আর কেইবা এর পাতা উল্টাবে?

রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, গায়ক, কবি, শিল্পী, খেলোয়াড়, নাট্যকার, বুদ্ধি-ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ডাকাত, খুনী, চোরাচালানী এমনকি কোন কীর্তিমান চাকুরীয়া- এসবের কোনটাই তো আমার বিশেষণ নয়- তাহলে এই স্মৃতির পাতা থেকে লেখার ধৃষ্টতা কেন?

আসলে এই প্রশ্নটির জবাব আমার কাছে নেই। এটাই হচ্ছে খাঁটি সত্য কথা- কেউ মানুক আর নাই মানুক। তাহলে লিখতে গেলাম কেন- এর একটা কৈফিয়ত দরকার।

বন্ধুবর আশরাফ হোসেইন এক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠানের নাম 'সেবা'। মাঝে-মধ্যে দাওয়াত করতেন তাঁর কোন কোন অনুষ্ঠানে কিছু বলার জন্য। এর জন্মদিন ওর মৃত্যুদিন- এই দিবস ঐ দিবস- এছাড়া দু'একটা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন- ঈদ পুনর্মিলনী, রমজানের ফজিলত ইত্যাদি বিষয় বস্তুর ওপর আলোচনা হতো।

যেতাম সেখানে মাঝে-মাঝে- যা প্রাণ চায় নিজের অনুল্লেখ্য কর্মজীবনের ছোটখাট ঘটনার আলোকে উপস্থিত যা মনে আসত তাই বলে ফেলতাম নিঃসংকোচে। বলা শেষ করে ভাবতাম বক্তা হবার একটা প্রাকটিস হিসেবে এটা মন্দ নয় আর শ্রোতাদের এক আধটুকু আনন্দ দিতে পারলে নিজের খুব ভাল লাগত।

মাঝে-মধ্যে অন্যতম বক্তা থেকে প্রধান বক্তার পদোন্নতিও হয়ে যেত এই সব সভাগুলোতে। শ্রোতা দেখতাম প্রায় সব বয়সের। উপস্থিতদের মধ্যে থাকতেন মাঝে-মধ্যে বেশ নামজাদা দু'একজন। নিজেকে তাঁদের সারিতে দেখে কারনা ভাল লাগে বলুন? অবশ্য এই সব বকাবাজীর শেষে সংগঠক আর শ্রোতা উভয়েই আমাকে এগুলো লেখার জন্য বেশ পীড়াপীড়ি করতেন। ভাবতাম হয় আমাকে নিজের তেল পুড়িয়ে

www.pathagar.com

সভায় আসার জন্য একটু তুষ্ট করা নয়তো সেবার নিজস্ব পত্রিকায় লেখা সংগ্রহ করার মতলবেই এইসব।

যাহোক এসডিও হিসেবে আমার প্রথম মহকুমার অভিজ্ঞতার একটা ছোট বর্ণনা দিলাম সেবার পত্রিকা 'সংলাপে'। এরপর শুরু হল আরো লেখার জন্য চাপাচাপি– তারই শেষ পরিণতি এই বই 'স্মৃতির পাতা থেকে।' এখানে একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। এক সন্ধ্যায় সেবার সভায় বক্তৃতা দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ান নিজের গাড়ীটায় উঠতে যাচ্ছি এমন সময় অন্ধকার ঠেলে এক ভদ্রলোক পেছন থেকে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'স্যার, আমরা চাঁদা তুলে হলেও আপনার লেখাগুলো বই আকারে ছাপাব, আপনি দয়া করে লিখে যান।' আমি কি জবাব দেব ঠিক করতে পারলাম না।

তাঁকে স্বকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ীতে উঠে চলে এলাম। জানিনা তিনি কে– আজ অবশ্য তিনি আমার স্মৃতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বন্ধুবর আশরাফকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাইনা তাঁর উৎসাহ এবং সহযোগিতার জন্য। বই বের করার জন্য যা কিছু পরিশ্রম সবই বলতে গেলে তাঁরই। যে সব পাঠক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্র মারফত তাঁদের অনুভূতি জানিয়েছিলেন এবং যেসব শ্রদ্ধেয় গুণিজন আমার এই কাঁচা হাতের লেখার তারিফ করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং যাঁরা দু'–একটি পত্রিকায় লেখার নয়, আমার সমালোচনা করে তাঁদের মূল্যবান সময় এবং মেধা ব্যয় করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই অনেকের কথা বা প্রসঙ্গ এসেছে আমার এ লেখায়। কাউকে খাট বা হেয় করার জন্য জ্ঞাতসারে আমি কোন চেষ্টা করিনি। কারণ এঁদের কারো প্রতিই আমার ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ বা অনীহা নেই। কিন্তু তবুও যদি এ লেখা পড়ে কেউ মনে কষ্ট পান সে জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

খ্যাতনামা সুসাহিত্যিক ও কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটির মান বাড়িয়েছেন। এজন্য আমি সত্যিই তাঁর কাছে ঋণি।

আমিতো স্বেচ্ছায় একাজে হাত দেইনি– এটাতো শ্রোতা আর পাঠকদের দাবী পূরণের চেষ্টা করেছি মাত্র। এতে কার না ভাল লাগে বলুন?

১৩৮, গুলশান এভেনিউ,
ঢাকা

– পি এ নাজির
১.৭.৯৩

www.pathagar.com

একটি বিরল গ্রন্থ

সাধারণত একজন ব্যুরোক্রাট বা আমলার জীবন মামুলি জীবন। তিনি যদি চান, ব্যুরোক্রেসীর স্টীল ফ্রেমের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রেখেই, নিরুদ্বেগ চাকরি-জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। তাঁর নিয়মিত প্রমোশন, আয়েশ-আরামের জীবন এবং পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ একরকম সুনিশ্চিত। এভাবে একদিন লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেলেও তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁকে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কোথাও কোনো ঢেউ না তুলেই শান্তিতে কাটিয়ে দেবার সুযোগ করে দেয়। তিনি যদি তাঁর কর্মস্থলে সাধারণ মানুষ থেকে গা বাঁচিয়ে চলেন, তাদের সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক না রাখেন, এতে তাঁর অযোগ্যতা বা ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। প্রভু-সুলভ দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিত্বের সার্টিফিকেট লাভের সহায়ক হয়। ব্যুরোক্রেসীর স্টীল ফ্রেমের কঠিন বাঁধন অক্ষুন্ন থাকে বলে এধরনের কর্মচারী সরকারের কাছে বাহবা পেয়ে থাকেন। এমন অনুগত আমলা বাহিনীই ব্যুরোক্রেসীর প্রধান অবলম্বন। জন-বিছিন্ন এসব আমলা সব সময়ে কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকেন। পান থেকে চুন না খসলেই সরকার মনে করেন কর্মচারীটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, অনুগত। এধরণের আমলা কোনো সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টি করেন না বলে, প্রশাসন অর্জন করে নিস্তরংগ মসৃণতা। এঁরাই সগৌরবে বহন করেন 'মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট'-এর ঐতিহ্য।

গোলামী আমলের এই ঐতিহ্য সাধারণভাবে আমলাদের কাছে পবিত্র মনে হলেও, কচিৎ কখনো কোনো কোনো আমলা এই স্টীলফ্রেম ভেঙে বেরিয়ে আসেন; একটা স্বাধীন দেশের কর্মচারী হিসাবে, জনগণের ভাগ্যের সাথে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উপলব্ধি তাঁদের নিয়ে আসে জনতার একেবারে মাঝখানে। অশিক্ষিত, সুবিচার-বঞ্চিত, পশ্চাৎপদ, হতোদ্যম জনগোষ্ঠীর দীনতা, মানবেতর জীবন তাঁদের ক্লিষ্ট করে; তাঁরা আমলার গতানুগতিক ঐতিহ্যকে ডিঙিয়ে, জনতার সঙ্গে স্থাপন করেন একাত্মতা। ন্যায় ও ইনসাফ-চেতনা তাঁদের নিকট আইনের প্রথাগত অর্থের অন্তরালে নিহিত আসল তাৎপর্য উন্মোচিত করে দেয়। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে সেই তাৎপর্য অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করেন আমলা ও জনগনের মধ্যে নতুন সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বলেই নাজির লিখতে পারেন- 'আমি মাঠে মাঠে মানুষের সরল অন্তরের সন্ধান পেয়েছি- সেই লোভ দমন করতে পারছি না।

www.pathagar.com

মানুষ তার সারাদিনের ঘাম মোছা গামছায় আমার কপালের ঘাম মুছে, তার পাতার কুড়ে ঘরে পিড়িতে বসিয়ে পান্তাভাত, চিড়া-গুড় খেতে দেয় এই লোভ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা কি সহজ ব্যাপার?'

জনাব নাজির, ব্যুরোক্রেসীর স্টীল ফ্রেম ভেঙে বেরিয়ে পড়ে শামিল হয়েছিলেন জনতার কাতারে, শতাব্দীর জড়তা, পশ্চাৎপদতা ও হীনমন্যতায় নুয়ে পড়া মানুষগুলোর মধ্যে আত্মশক্তির বোধনের জন্য তিনি প্রথমে হতে চেয়েছিলেন একজন কল্যাণব্রতী শিক্ষক; ছাত্রজীবন শেষ করে ঢুকেছিলেন কলেজে। কিন্তু আখতার হামিদ খান, এদেশে পল্লীউন্নয়ন বিপ্লবের কিংবদন্তীর নায়ক, সেই চাকুরী ছেড়ে আসা খামার-কর্মী আইসিএস যিনি ছিলেন নাজিরের কর্মজীবনের প্রেরণার উৎস, তাঁরই একান্ত 'জবরদস্তির' কারণে তিনি অধ্যাপকের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে হলেন, সিএসপি। আখতার হামিদ খান তাঁকে বুঝালেন 'যদি একজন মানব খেদমত করতে চায় তো এই সার্ভিসে রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ।' আখতার হামিদ খান তাঁর প্রিয় শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নাজির, আমি আমার জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, লাভবান হয়েছি। আমি চাই তুমিও তোমার জীবন নিয়ে কিছুদিন এক্সপেরিমেন্ট করো।' শেষ কথা বললেন, 'তখত ইয়া তাউস'- ইংরেজী করে বললেন 'আইদার দি থ্রোন ওর দি গ্যালোজ।' হয় সিংহাসন না হয় ফাঁসি কাষ্ঠ।' ব্যক্তিত্ববান মানুষ, যার মধ্যে পুরুষকার বিদ্যমান সে তো তার জীবনে এই বাজি রেখেই খেলে- 'হয় সিংহাসন না হয় ফাঁসি।'

জনাব নাজিরের প্রথম কর্মস্থান নাটোর। এইখানেই শুরু হলো তাঁর জীবন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। এ দেশে তখন যুক্তফ্রন্টের রাজত্ব- মাত্র নয় মাস ছিলেন নাটোরের এসডিও। এ সময়ের মধ্যে তিনি মানুষের মনে প্রবেশ করেছিলেন 'তাদের কুড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে গুড়-চিড়া আর পান্তাভাত খেয়ে, তাদেরই একজন হয়ে। গাড়ী হাকিয়ে, চেয়ারে টেবিলে শান-শাওকাত আর যৌলুস দেখিয়ে নয়'। তিনি যখন নাটোরের দায়িত্ব নিলেন, ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে,- 'পাকিস্তানের বয়স তখন প্রায় দশ বছর। কিন্তু তখনো মহকুমায় সার্বিকভাবে মুসলমানেরাই গরীব এবং অনগ্রসর-তাদের কপালে কিছু জোটেনি পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে।' রাণী ভবানীর যে দেশের এই পদ-দলিত নিগৃহীত মানুষগুলোর মধ্যে জীবনের গতিবেগ সৃষ্টির জন্য প্রচন্ড কর্মো-উন্মাদনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নাজির। গ্রামের অনগ্রসর মানুষগুলোকে প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দিলেন তিনি। তার ফল হলো, নাজিরের নিজের ভাষায় 'নাটোর শহরের মানুষ কাজের নেশায় পাগল হয়ে গেছে। এক পাগল সবাইকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছে।' তাঁর আমলার ঐতিহ্য-বহির্ভূত কর্মকান্ডের জন্য জুটলো দুটি অভিধা। 'পাগল আর সাম্প্রদায়িক', আইসিএস হ্যাচ বার্নঅয়েল- তাঁকে বললেন- 'ট্রাবল শুটার'- নিস্তরংগ স্বাভাবিকতার মধ্যে যারা তোলে তরংগ, যারা উজানে নাও বাইতে শুরু করে, তারাই পায় এধরনের খিতাব। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন- নাজিরের চাকুরী জীবনের শুরুতেই তাঁর জীবনের স্থির লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন। চিরাচরিত সুবিধাভোগীরা, যাদের অনেকেই ছিলো দুর্নীতির মধ্যে নিমজ্জিত, তাদের যখন তিনি শায়েস্তা করতে গেলেন, তখন তাঁর

www.pathagar.com

খেতাব যুটলো 'সাম্প্রদায়িক', কারণ এদের অনেকেই ছিল অমুসলিম,– আবার গ্রামের নিগৃহীত বঞ্চিত, পিছিয়ে–পড়া মাটির মানুষগুলোকে যখন তিনি টেনে তুলতে চাইলেন, তখনো তিনি সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হলেন, কারণ ঐ লোকগুলো বেশীরভাগই ছিলো মুসলমান। জনাব নাজির কোনো পরোয়া না করেই তাঁর আন্দোলন চালিয়ে যান। নাটোরের মানুষ এই প্রথম বুঝতে পারলো পাকিস্তানের অর্থ, স্বাধীনতার তাৎপর্য!

নাটোর থেকে নয় মাস পর তিনি বদলি হলেন সিরাজগঞ্জ। তখনো যুক্তফ্রন্টের রাজত্ব এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। এখানেই অসম সাহসী নাজির তাঁর চাকরির তোয়াক্কা না করে, আইন ভংগের অপরাধে একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর সামনেই তাঁকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। আইনের কাছে সকলেই সমান, এই বিশ্বাস ও নীতি যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, তাঁর ভয় পাবার কিছুই নেই। নাটোরের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সিরাজগঞ্জে উত্তেজনাময় কয়েকমাস কাটানোর পর তাঁকে বদলি করা হয় কুষ্টিয়া– কুষ্টিয়া থেকে ফরিদপুর। ফরিদপুর থাকতে থাকতেই জারি হয় মার্শাল ল। পরপর তিনি নাটোর, সিরাজগঞ্জের এসডিও এবং কুষ্টিয়ার এডিসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন যুক্তফ্রন্টের আমলে। এর মধ্যে তাঁকে মুকাবিলা করতে হয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের, মন্ত্রীর, প্রধানমন্ত্রীর এবং বহু বিচিত্র মানুষের। একজন মর্দে মুমিন, কতটা সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন সমস্যা মুকাবিলা করতে পারেন, তার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত নাজিরের জীবন। জনগণের খীদমতের সঙ্গে, তাঁর এইসব দ্বন্দ্ব–সংঘর্ষের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাঁর স্মৃতির পাতায়, উপন্যাসের মত আকর্ষণীয় ভংগীতে। মার্শাল ল ও মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে তাঁকে মুকাবিলা করতে হয় নতুন নতুন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়– গভর্ণর ও প্রেসিডেন্টের, সামরিক অফিসার ও জেনারেলদের। আগা–গোড়াই তাঁর শিরদাড়া ছিলো অনমনীয়।

বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে পেলেন আদম শুমারীর দায়িত্ব– চীপ কমিশনারের অধীনে। এখানেও তাঁকে সম্মুক্ষীণ হতে হয় নানা সমস্যার। পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে ঐ অঞ্চলের সমস্যার সঙ্গে হলেন পরিচিত। ১৯৬২–এ চট্টগ্রামে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড়ের সময় তিনি চট্টগ্রামেই ছিলেন। এরপর এলেন ঢাকায়, শিক্ষাবিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারী (উন্নয়ন) হিসাবে। এই সময়েই এদেশের একজন মহত শিক্ষাবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে তিনি উল্লেখ করেছেন সে ঘটনার। ডঃ রশিদকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি কত টাকা মাইনেতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদ গ্রহণ করতে রাজি আছেন– তখন তিনি বললেন, তিনি দু'হাজার টাকার বেশী বেতন নেবেন না। নাজির তখন বললেন দেশের অন্যান্য ভিসিরা মাসে চারহাজার টাকা মাইনে নেন, তিনি কম নিলে কেমন দেখাবে– জবাবে ডঃ রশিদ বললেন, তিনি দু'হাজার টাকাই নেবেন, এর বেশী নেবেন না। পরে দু'হাজার টাকা বেতনেই তিনি ভিসি হন।

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে নাজির গেলেন রাজশাহী- জেলা ম্যাজিস্টেট হয়ে- দু'বছর কাটালেন রাজশাহী, তারপর ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্টেট এবং সর্বশেষ ঢাকার জেলা ম্যাজিস্টেট। এই দীর্ঘ সময়ের ছোটোবড়ো অসংখ্য অভিজ্ঞতার কথা নাজির বর্ণনা করেছেন তাঁর স্মৃতির পাতায়। একজন ঈমানদার, সত্যনিষ্ঠ, মানবদরদী কর্মকর্তা কীভবে প্রশাসনের জটিলতা ও সমস্যাবলীর মুকাবিলা করেন, নিজের চাকুরীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে পরোয়া না করে, যা সত্য ও ন্যায়-সংগত, যা তাঁর মতে বিবেকের নির্দেশনা, তাকে অনুসরণ করার জন্য জীবন নিয়ে বাজি খেলেন, নাজিরের স্মৃতির পাতায় বর্ণিত হয়েছে তারই প্রাণবন্ত কাহিনী ও স্মৃতি কথা। একজন আমলার গতানুগতিক স্মৃতি কথা নয়, একটা নতুন রাষ্ট্রের পশ্চাদপদ জনগনের জীবনে নব-জন্মের উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য একজন আমলার উদ্দীপনাময় এ কাহিনী। বাংলা ভাষায় এধরনের সাহিত্য একটা বিরল জিনিস। আমার সন্দেহ নেই তাঁর এ কাহিনী আমাদের নিকট-অতীতের ইতিহাসের উপর থেকে যবনিকা তুলে ধরে, আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে সত্যের মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দেবে- আজকের নতুন কর্মকর্তারা এতে পাবেন প্রচুর অভয় এবং অনুপ্রেরণা।

দেশবাসীকে এমন চমৎকার একটি গ্রন্থ উপহার দেবার জন্য জনাব নাজিরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

বনানী, —শাহেদ আলী

ঢাকা ১.৭.৯৩

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সিগারেট লাইটার জ্বেলে	ঃ	১০
গ্রাম নয়— শহর	ঃ	৫৪
গুড় ভর্তি সিন্ধুক	ঃ	৭৫
চৌদ্দা সালকা সাজা	ঃ	৮২
লস এঞ্জেলেসের সূর্যাস্ত	ঃ	৯৬
ডেভিডের প্রেতাত্মা	ঃ	১০০
চার হাজারী নয়— দু'হাজারী	ঃ	১১২
আপ ওধার যাইয়ে	ঃ	১২০
সকাল হলেই বুঝবে	ঃ	১৬৯
টেলিফোন বয়	ঃ	২২১
অর্ধচন্দ্র	ঃ	২৬২

www.pathagar.com

সিগারেট লাইটার জ্বেলে

তোমার নাম কি?

আমার নাম হুজুর- গেদু পরামানিক।

তোমার বাপের নাম কি?

কালু পরামানিক।

জাতি?

মুচুনমান, হুজুর।

বাড়ী?

দিঘাপতিয়া, হুজুর।

তুমি মুসলমান তো ধুতি পরে এসেছ কেন?

হুজুরের কোর্টে ভদ্দরলোক হয়ে আসার জন্য ধুতিটা পরেছি, হুজুর।

নাটোরের এসডিও কোর্টের এজলাসে ফরিয়াদির জবানবন্দী লিখছিলাম। ১৯৫৬ সালের শেষ ভাগ। সরকারী চাকরিতে আমার প্রথম কর্মস্থল নাটোর মহকুমা। প্রথা অনুসারে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ঘন্টা দুই কোর্টে কাজ করতাম। জেনারেল ফাইলটাও এসডিও নিজেই করতেন। উপরের সওয়াল-জবাব আমার ও এক ফরিয়াদির মধ্যকার। তার নাম শুনে সে হিন্দু না মুসলমান ঠাহর করার উপায় ছিল না। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান কায়েম হবার পর নয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু দেখে-শুনে মনে হয়, নাটোরের এই মানুষগুলোর গায়ে সে বাতাস আজো লাগেনি।

এজলাসের কাজ সেরে সহকর্মী সেকেন্ড অফিসার (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি! এখানকার মানুষগুলোর নাম এ রকম কেন? আমাকে যে দুজন আর্দালী দেওয়া হয়েছে তার এক জনের নাম 'চান্দু মিয়া' আর অন্যজনের নাম 'সুজ্জ'। মুসলমানী নামের এত দুর্ভিক্ষ কেন এখানে? নতুন সিএসপি অফিসার। এখানে এসেছিও নতুন। তা ছাড়া আমি বাঙালী না সিন্ধি তাও এখনো পরিষ্কার নয় আমার

www.pathagar.com

সহকর্মীদের কাছে আমার নামের কারণেই। তাই সম্ভবত একটু সতর্ক হয়েই জবাব দিলেন ভদ্রলোক, 'রাণী ভবানীর দেশ তো স্যার, সে জন্যই নামগুলো একটু হিন্দু-ঘেঁষা।'

সন্ধ্যায় ঢাকার অধিবাসী মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আমার বাংলোয় এলেন। তিনি ছিলেন মহকুমা পর্যায়ে বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার। তাঁর কথা-বার্তায় আন্দাজ করলাম সকলে মিলে তাঁকে আমার কাছে পাঠান হয়েছে- আমার মেজাজ-মর্জি আঁচ করতে। আমার নাম নিয়েও দেখলাম তাঁর কৌতূহল রয়েছে। সেই সময় সিন্ধু প্রদেশে এক রাজনৈতিক নেতার নাম ছিল পীর আলী রাশিদী। আমার নামের প্রথম অংশটিতে একটু উচ্চারণ বিভ্রাট করে সবার মনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে আর কি!

. ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম কতদিন তিনি আছেন এখানে। জবাবে জানালেন, তিন বছর পার করে ফেলেছেন। এবার কিছুটা নিশ্চিত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার রোগীদের নাম বিশেষ করে মুসলমান রোগীদের নাম নিয়ে কোন বিভ্রাট হয় নাকি?' ভদ্রলোক খুব হুঁশিয়ার। বুঝতে পেরেছেন কেন এ প্রশ্ন করেছি। বললেন, 'এই মহকুমায় হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশী। প্রায় দশ বছর হয় পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাতে কি? আপনি দেখবেন মুসলমান বাড়ী বাচ্চা পয়দা হলে ছ'দিন পার হবার পর বাচ্চাটাকে নিয়ে বাবুদের বাড়ীর দরজার সামনে হাত জোড় করে ছেলে বা মেয়ের বাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আর মা জড়সড় হয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে স্বামীর পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকে, বাবু কখন বেরুবেন। বাবু দরজা দিয়ে বের হলে জোড়া হাত কপালে ছুঁইয়ে মাথা নত করে বলে, 'বাবু, একটা নাম রেখে দিন।' বাবু অত্যন্ত করুণা স্বরে বলেন, 'তোর পোলা হয়েছে বুঝি? তা বেশ। কি নাম রাখবি- পচু বলেই ডাকিস। আর দেখিস কখনও গো-মাংস খাবি না, আর ওকেও খাওয়াবি না। কথা না শুনলে কিন্তু ছেলে অক্কারাম। একেবারে প্রাণে মারা পড়বে।' খুব আগ্রহভরে ডাক্তার সাহেবের কথা শুনছিলাম। আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিস্ময় ও দুঃখের এক মিশ্র অনুভূতি। ডাক্তার সাহেব একটু থেমে তারপর ক্ষোভের সাথে বললেন, 'দেখুন না এসডিও সাহেব, আজ তিন বছরেরও বেশী আছি এখানে। একটা মহকুমা শহর কিন্তু গরুর গোশ্ত পাওয়া যায় না। ছুটিতে ঢাকার বাড়ী গিয়ে তবে গরুর গোশ্ত খাবার শখ মিটাতে হয়। এটা রাজা-মহারাজাদের জায়গা। মুসলমান ভদ্রলোক বলতে এখানে পাবেন দু'এক জন। তাঁরাও গরুর গোশ্ত ছুঁবেন না। তাঁদের নাকি অসুখ করে ঐ জিনিস খেলে। বলবেন, ডাক্তারে মানা করে দিয়েছেন।' এসব

www.pathagar.com

বলতে বলতে তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাঁকে শান্ত করলাম এ-কথা সে-কথা বলে।

মহকুমার কার্যভার গ্রহণ করার পর সরকারী কাজের বাইরে প্রথম যে কাজ করব ঠিক করলাম তা হল মহকুমা শহরের সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। আছেই মাত্র তিনটি হাইস্কুল। একটি অতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- জিন্নাহ্ স্কুল। দ্বিতীয়টি মহারাজা স্কুল এবং তৃতীয়টি বালিকা স্কুল। জিন্নাহ্ স্কুল কাছারির কাছেই। একদিন গেলাম সেখানে। প্রধান শিক্ষক বেশ মার্জিত শিক্ষাবিদ। স্কুলের পরিবেশ দেখে মনে হল শিক্ষকমন্ডলী দায়িত্ব-সচেতন।

পরদিন গেলাম মহারাজা স্কুলে। প্রধান শিক্ষক বেশ তারিক্কি কিসিমের লোক, একটু যেন লা-পরওয়া গোছেরও। ক্লাস রুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ছেলেদের দু'একটা প্রশ্নও করলাম। খুব মামুলি ধরনের যেমন- নাম কি, বাড়ী কোথায়, বাপ কি করেন? ইত্যাদি। দেখলাম শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র আরবী শিক্ষকই মুসলমান, বাকী সবাই হিন্দু। সবিস্ময়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সামনের বেঞ্চ খালি থাকা সত্ত্বেও সেখানে মুসলমান ছাত্রদের বসতে দেওয়া হয়নি। যে গুটিকয়েক মুসলমান ছাত্র স্কুলে আছে তাদের স্থান চতুর্থ ও পঞ্চম সারিতে। প্রতিটি ক্লাসে একই অবস্থা। দশম শ্রেণীতে প্রশ্ন করলাম, 'কায়েদে আজম কে?' প্রশ্নটা অবশ্য করেছিলাম প্রথমসারির ছাত্রকেই। কিন্তু সে নীরব রইল, জবাব দিতে পারল না। অবাক হলাম। বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না যে আমি পাকিস্তানের সরেজমিনে একটা স্কুল পরিদর্শন করছি। কিন্তু আমি জানতাম না তখনো যে আমার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে। দশম শ্রেণীর একটা হিন্দু ছেলেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। আরো কিছু প্রশ্ন করলাম, কিন্তু সবাই লা-জবাব। হেড মাস্টার সাহেবকে বললাম, 'কি ব্যাপার, আপনার ছেলেরা তো কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারছে না।' হেড মাস্টার যা বললেন তা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'এ প্রশ্নগুলোর সাথে তো আমিও পরিচিত নই।'

বৃথা সময় নষ্ট করতে চাইলাম না। ক্লাস রুম থেকে সরাসরি চলে এলাম শিক্ষকদের কমনরুমে। কয়েকটি বইয়ের আলমারী। আলমারীগুলোর মাথার উপর দেওয়ালে টাঙ্গান রয়েছে বেশ কতগুলো লাইফ-সাইজ রঙ্গীন ছবি। এতে ছিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাস এবং মহারাজা। হেড মাস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কায়েদে আজমের ছবি কোথায়?' জবাব পেলাম, 'ওটা আমাদের স্কুলে নেই।' শুধু মাথাটায় নয়, সত্যি বলতে কি, সারা শরীরে উষ্ণ রক্ত বহু আগে থেকেই সঞ্চালিত হচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। কিন্তু সর্বশেষ প্রশ্নের জবাব শুনে রক্তের সে গতি আরো বহু গুণ বেড়ে গেল। বুঝতে পারলাম আর এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। কি থেকে কি ঘটে যায় কে জানে! চলে এলাম। কিন্তু আসার সময় হেড মাস্টার সাহেবকে সংযত

www.pathagar.com

অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় বললাম, 'আমি পরশু আবার আপনার স্কুলে আসব। বাবায়ে কওমের অর্থাৎ আমাদের সবার বাবার ছবিটা এই রুমে দেখতে চাই এবং কাল থেকে কওমী ঝান্ডা সমবেত জাতীয় সঙ্গীতের সাথে উত্তোলন করতে হবে'।

পরদিন আমাকে একটু অবাক করে দিয়েই মহারাজা স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব আমার বাংলোয় এলেন। কাল তাঁকে বলে এসেছিলাম যে, পরশু আমি তাঁর স্কুলে যাব। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে সেই দাওয়াত দিতে এসেছেন। তাঁর এই আচরণ আমার খুব ভাল লাগল। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে গেলাম। স্কুল মাঠে ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথমবারের মত জাতীয় পতাকা উড়ছে। আমাকে ছেলেরা অভ্যর্থনা করল 'ব্রতচারী' গান শুনিয়ে। শিক্ষক কমন রুমে এলাম। দেখলাম, কায়েদে আজমের ছোট্ট মানের ছবির ফ্রেমটা খুব উঁচুতে স্থাপন করে একটা রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে এবং একটা রশি লাগিয়ে রুমালটা টানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাকে পর্দা ' উন্মোচন' করার জন্য অনুরোধ করা হল। আমি রশি টানলাম। সবাই করতালিতে কামরাটা মুখর করে তুলল। ফ্রেমের মধ্যে ছবিটা পোস্ট কার্ড সাইজের।

এবার বক্তৃতার পালা। কিছু বলতে হবে। বললাম, 'যে গতিতে আপনারা অগ্রযাত্রা শুরু করেছেন, তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।' মনে হল তারাও খুব খুশী হয়েছে এসডিওকে খুশী দেখে। কিন্তু তারা এটা মোটেও আঁচ করতে পারেনি যে এই ব্যাটা এসডিও কাল আবার স্কুল বসার সময় সশরীরে এসে হাজির হবেন।

পরদিন সকাল ঠিক দশটায় গিয়ে মহারাজা স্কুলে উপস্থিত হলাম। স্কুলের ত্রিসীমানার কোথাও জাতীয় পতাকার নাম-নিশানা পাওয়া গেল না। এতে অবশ্য আমি অবাক হলাম না। শিক্ষকদের কমন রুমে গিয়ে ঢুকলাম। 'কায়েদে আজম' উধাও। এটাও অপ্রত্যাশিত ছিল না আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম হেড মাস্টার সাহেবকে, 'ছবিটা কোথায় গেল?' কোন উত্তর পেলাম না। কারো মুখে রা নেই। সবাই হতচকিত ও বিহবল হয়ে পড়েছেন। এরকম একটা ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে এটা যেন তারা কল্পনাও করতে পারেননি।

এই নীরবতা ভঙ্গ করে আমার এক নতুন আর্দালী এক পানের দোকানদারের হাত ধরে প্রায় টেনে-হেঁচড়ে আমার সামনে হাজির করল। 'ব্যাপার কি?' জানতে চাইলাম। সে যা বলল তা হল কাল যে ছবিটা এখানে টাঙ্গানো হয়েছিল সে ছবিটা এই ব্যাটা দোকানদার ওর দোকানে টাঙ্গিয়ে রেখেছে আজ। কত বড় সাহস! পান দোকানদার কাচুমাচু হয়ে যা বলল তা হল, এতে ওর কোন অপরাধ নেই। এই ছবিটার প্রকৃত মালিক সেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ কাল কিছুক্ষণের জন্য এই ছবিটা তার কাছ থেকে ভাড়া করেছিল। কাজ শেষে কালই আবার তাঁরা ছবিটা তাকে ফেরত দিয়েছে। এমনভাবে এঁদের হাটে হাঁড়ী ভাংবে এঁরা ভাবতেও পারেন নি।

www.pathagar.com

একজন শিক্ষক (হেডমাস্টার নন) বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলব। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'নির্ভয়ে বলুন।' তিনি বললেন, 'স্যার, আপনি যা চাচ্ছেন তার সাথে যদি আমরা একমত না হই তবে কি আমরা বিনা ঝামেলায় পদত্যাগ করতে পারব?' জবাবে শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'নিশ্চয়ই পারবেন, খুশী মনে পারবেন। কোন ঝামেলাও হবে না।' এবার হেড মাস্টার মরিয়া হয়ে মুখ খুললেন, 'স্যার, এই স্কুলের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট কলকাতাবাসী মহারাজা, এসডিও নন।' বললাম, 'সে আমি খুব ভাল করেই জানি। এসডিও হিসাবে আমি জানি আমাকে কি করতে হবে এবং আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন।'

হেড মাস্টার সাহেব আর কিছু বললেন না। আমি পায়চারি করতে করতে হেড মাস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ স্কুলটির এ্যাফিলিয়েশন কি কলকাতার সঙ্গে না ঢাকার সঙ্গে?' উত্তর পেলাম না। হেডমাস্টার সাহেবের চেহারা আরো গম্ভীর হল।

হঠাৎ কাঁচের আলমারীর ভিতর একটা বইয়ের উপর নজর পড়ল। The Calcutta University Calender 1956 বইটা দেখতে চাইলাম। একজন শিক্ষক নীরবে বইটা আমার হাতে তুলে দিলেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে কাংক্ষিত জায়গা পেয়ে গেলাম। নাটোর মহারাজা হাইস্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত। আগের বছর এই স্কুলের কত জন ছাত্র পাস করেছে তারো একটা হিসাব এতে আছে।

আমার মনে নানা ধরনের সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি দিলেও, সত্য বলতে কি, আমি এতটা ভাবতে পারিনি। ইট ইজ টু মাচ! এই স্কুল সম্পর্কে যা সিদ্ধান্ত নেবার তা নিয়ে ফেলেছি তৎক্ষণাত, নিজের অজান্তেই। চুপচাপ চলে এলাম নিজের বাংলোয়। সরকারী স্কুলের একজন অবসরপ্রাপ্ত হেড মাস্টার নাটোরের কানাইখালিতে থাকতেন। তাঁকে রেষ্টর নিয়োগ করে মহারাজা স্কুলে পাঠালাম পরদিন।

এদিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহী থেকে আমার কাছে এক বার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি জানালেন যে, কলকাতায় বসবাসকারী মহারাজা প্রাদেশিক গভর্নর এ কে ফজলুল হক সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহারাজা অভিযোগ করেছেন, এক ছোকরা এসডিও তাঁর স্কুলটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সুতরাং হক সাহেব যেন ত্বরিত ব্যবস্থা নেন।

ঐ দিন বিকেলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং নাটোরে তশরিফ আনলেন। সোজা নিয়ে গেলাম তাঁকে মহারাজা স্কুলে। শিক্ষকদের কাছে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম এই বলে যে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা এই যে, মহারাজা স্কুলের নব অগ্রযাত্রাকালে আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুদূর রাজশাহী থেকে আপনাদের আশীর্বাদ করার জন্য স্বয়ং হাজির হয়েছেন।' আরো বললাম, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনাদের এই যাত্রা শুভ হবে, কামিয়াব হবে।' জেলা

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মনে যাই থাক, তিনি তাঁর বক্তৃতায় আমার কথাগুলোরই পুনরুক্তি করলেন মাত্র।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর সদর দফতরে ফিরে গিয়ে মহারাজা স্কুল সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন জানি না। তবে সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি আমাকে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'এটা কি করে সম্ভব হল– যে স্কুলটি এই দেশে অবস্থিত, স্কুলের পাঠ্য বইগুলো এখানকার টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অথচ ছেলেরা পরীক্ষা দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস অনুসারে, তাঁকে এ তথ্যও দিয়েছিলাম, যে কটি মুসলমান ছেলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তারা হয় প্রাইভেট পরীক্ষা দেয় নতুবা পাশের দিঘাপতিয়া স্কুলের ছাত্র হিসাবে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ স্কুল থেকে যারা মেট্রিক পরীক্ষা দেয় তারা সবাই হিন্দু ছাত্র এবং পরীক্ষা দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস অনুসারে।

যা হোক, মহারাজা স্কুলের কীর্তিমান হেড মাস্টার এবং তাঁর চার জন সহকর্মী শিক্ষক হঠাৎ এক দিন লাপাত্তা হয়ে গেলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, তাঁরা সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে তাঁরা স্বেচ্ছা কৌমার্য পালন করে আসছিলেন বহু বছর যাবত।

সুখের কথা যে, নাটোর মহারাজা স্কুল তার নবযাত্রা সফলতার সাথে সম্পন্ন করল। এদিকে এসডিও 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যায় ভূষিত হলেন। এই সম্মানসূচক ভূষণ আনুষ্ঠানিকভাবে হাসিমুখে গ্রহণ করলাম স্কুলে প্রথম বারের মত একটা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। এ মাহফিলে সানন্দে ঘোষণা করলাম যে, 'নিজেকে একজন মুসলমানের সন্তান বলে পরিচয় দিতে আমি নিঃসন্দেহে গর্ববোধ করি।'

আসলে দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাবাহী সরকারী চাকরির ক্যাডারভুক্ত হয়ে দেশ-বিদেশে প্রশাসন বিষয়ে নানা রকম ট্রেনিং পেয়ে নাটোরে এসেছিলাম নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মস্পৃহাকে কাজে লাগিয়ে একটি অনগ্রসর মহকুমাবাসীর সাধ্যমত সেবা করে যাবার আকাংক্ষা নিয়ে। পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময়ে এমনিতেই এসডিও, ডিএম, কমিশনাররা ছিলেন ক্ষমতাধর অধিকর্তা। তার ওপর দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও নানা দেশের প্রশাসন যন্ত্রের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে স্বাভাবিকভাবেই নিজের কর্মস্থলে তার একটু ছাপ রেখে যাবার ইচ্ছা এবং আশা সকলেরই থাকে নিশ্চয়ই। তা ছাড়া, আমার কর্ম জীবনের ভবিষ্যৎ-ও এখানকার পারফরমেন্সের মূল্যায়ন করেই সরকার স্থির করবেন। কিন্তু প্রথম কর্মস্থলেই আমার যে অভিজ্ঞতা হল তা খুব সুখের নয়।

www.pathagar.com

মহকুমা হিসাবে নাটোর ছিল খুবই ব্যাকওয়ার্ড– পশ্চাৎপদ। এসডিও সাহেবের বাংলোর উপরে ছিল খড়ের ছাউনি। এটা ছিল অনেকটা ব্যারাক টাইপের ঘর– মাঝে পার্টিশন দিয়ে চারটে কামরা বানান হয়েছে। বহু পুরাতন বাড়ী; সিলিং বাঁশের তরজা দিয়ে আঁটা। শুনেছি ওতে বড় বড় সাপ, পায়রা ইত্যাদি প্রাণীরাও নির্বিঘ্নে বসবাস করে। সামনে একটা মাঝারি সাইজের মাঠ এবং তারপর কোর্ট বিল্ডিং। বাংলোর বাম দিকে একটা পুকুর। তার ওপারে সাবজেল। ডানদিকে একটা কৃষিখেত এবং অফিসার্স ক্লাব ও নারদ নদী। এসডিওর বাহন হচ্ছে একটি দু'চাকার সাইকেল, মফস্বল সফরের সময় টমটম গাড়ী। রাজশাহী সদর থেকে সপ্তাহে দু'দিন ব্যবহারের জন্য ডিএম সাহেবের তিন নম্বর জিপটি আসে। অবশ্য যদি জিপটির স্বাস্থ্য এবং মেজাজ–মর্জি ভাল থাকে। বেচারার বয়স হয়েছে অনেক, তাই প্রায়ই চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। প্রায়ই সদর থেকে এত দূর সফর করে ড্রাইভার ওর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার পাতি খুঁজতেই দিন পার করে দেয়। পরের দিন দুপুরের পর ঘরে ফিরতে হবে ডিএম সাহেবের কড়া হুকুম। সুতরাং যাবার প্রস্তুতিতেই সকালটা প্রায়শ কেটে যায়। বেচারা এসডিওর জন্য দুচাকার সাইকেলই ভাল। ডিএম সাহেবের সাথে ত্বরিত যোগাযোগের কোন উপায় নেই। নাটোর থেকে আবদুলপুর জংশন হয়ে রাজশাহী ট্রেনেই যেতে হয়। এতে শত অসুবিধার মাঝে একটা সুবিধাও ছিল। সেটা হচ্ছে অনভিজ্ঞ এসডিও নিজ দায়িত্বে একটা কিছু করে বসলে ডিএম, কমিশনারের সহানুভূতি পাওয়া যেত। তাঁদের মূল্যবান উপদেশ নেবার সুযোগ কম। পরিস্থিতি সবসময় তো কাউকে প্রয়োজনীয় সময় নাও দিতে পারে। সুতরাং ভাবলাম, এই অসুবিধাগুলোর সুযোগ নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মূল্যবান পরামর্শ নিতে গেলে আর অত সহজে মহারাজা স্কুলকে 'জাতীয়করণ' করতে পারতাম না। হয়তবা কাজটা আদৌ করা যেত না।

একদিন এসডিওর চেম্বারে শহরের গণ্যমান্য বক্তিদের ডাকলাম পরিচিত হতে। সকল রাজনৈতিক দলের প্রধানদের, উকিল–মোক্তার বারের প্রধানদের এবং মহকুমা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের। সময়টা ছিল জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ। প্রসঙ্গক্রমে স্থানীয় সমবায় কর্মকর্তা বললেন, নাটোর ইলেক্ট্রিসিটি সমবায় সমিতির কথা। হঠাৎ কথাটা মাথায় লেগে গেল। বলে ফেললামঃ 'Natore shall get electricity on the first Republic Day that is on 23rd March.' যাঁরা কথাটা শুনেছিলেন তাঁরা একটু হতচকিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন, কিন্তু মুখফুটে তেমন কিছু বললেন না। একজন প্রাক্তন পারলামেন্টারিয়ান বললেন, এসডিও সাহেব, আমাদের জেনারেটার, তার, খুঁটি কিছুই তো নেই। অর্থও নেই। এত

www.pathagar.com

অল্প সময়ে এ-কাজ সমাধা করা যাবে কি?' জবাব দিলাম, 'সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য পাব এবং এই সামান্য কাজটা পড়ে থাকবে না। বলুন, সবার নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন পাবো কি না?' সকলেই হ্যাঁ-সূচক ধ্বনি করলেন। তারপর সবাই চলে গেলেন। সকলেই ভাবছিলেন লোকটা আস্ত 'পাগল'। এই ভূষণটিও ঐ নাটোরেই অর্জন করেছিলাম। এতে অবশ্য আমি মোটেই বিচলিত হইনি, বরং আনন্দই বোধ করতাম। কারণ ছোটবেলা মুরুব্বীদের নিকট প্রায়ই শুনতাম যে, দুনিয়ায় ভাল ও বড় কাজ করতে গেলে পাগল আখ্যা পেত হয়। এ কথাটাই একদিন এক এমপিকে বলেছিলাম।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই সমিতির পরবর্তী মিটিং-এ গোপালপুরস্থ নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের জেনারেল ম্যানেজারকেও শরীক হবার অনুরোধ জানালাম। ভদ্রলোক মিটিং-এ এলেন এবং আমাদের প্রত্যয় দেখে তিনি নিজেও খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। শুধু কারিগরি জ্ঞান দিয়েই আমাদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করলেন না, অন্যান্য ব্যাপারেও সৎ পরামর্শ দিলেন। তিনি জানালেন যে, কুষ্টিয়ার জন্য একটা জেনারেটর আমদানি করে তা চট্টগ্রামে ফেলে রাখা হয়েছে। কী কী কারণে জেনারেটরটা ওখানে পড়ে রয়েছে- সে তথ্যও তিনি আমাদের দিলেন। যদি জেনারেটরটা আমরা হাসিল করতে পারি তবে খুঁটির সমস্যাও সমাধান করা যাবে। নাটোরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কাঠের বল্লি সংগ্রহ করে তা খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এবার উত্থাপিত হল অর্থ প্রসঙ্গ। টাকা আসবে কোথা থেকে? সবাই চিন্তিত। অবশেষে সবাই দায়িত্বটা আমার কাঁধে চাপিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

হাতে সময় দু'মাসের চেয়ে সামান্য বেশী। এত অল্প সময়ে এত বড় কাজ কি সম্ভব- আরাম কেদারায় বসে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে না গিয়ে সরাসরি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম; মহকুমার সর্বস্তরের মানুষের পেলাম অকুণ্ঠ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা। নাটোর শহরের মানুষ কাজের নেশায় পাগল-প্রায়। বলা যায়, এক পাগল সবাইকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছে। অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে সমবায়ের শেয়ার বিক্রির জন্য গেলাম প্রতিটি থানায়।

আমাদের ইস্পাত-কঠিন সংকল্প এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটল ২৩ মার্চ সন্ধ্যায়। সারা শহরে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। ২৩ মার্চের প্রজাতন্ত্র দিবসের এই দিনটি অবিস্মরণীয় হয়ে রইল নাটোরবাসীর জীবনে। আমার মনে আছে, যখন উদ্বোধনী সুইচ টিপলেন সমবায় মন্ত্রী আবদুর রহমান-একজন

www.pathagar.com

সার্কেল অফিসার ক্লান্তি ও আনন্দের আতিশয্যে বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সেখানেই।

ভীড়ের মধ্যে লোকজন বলাবলি করছিল যে, এই এসডিও যা বলবেন তাই করে ছাড়বেন। এ কথাটা শুধু নাটোরে অতিক্রান্ত পরবর্তী সময়েই নয়, আমার বাকী কর্মজীবনেও আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

শহরে তো বিজলী বাতি জ্বললো। কিন্তু শহরের কোন রাস্তাতে একটুকরা ইটও কোথাও নেই। শুধু ধূলা আর কাদা। টেষ্ট রিলিফের টাকার বরাদ্দ পেলাম। আড়াই লাখ টাকার মতো। সরকারী নির্দেশ মাটি কেটে রাস্তা ও খাল সংস্কার করতে হবে গ্রামে-গঞ্জে। তবে দু'একটা অতি প্রয়োজনীয় কালভার্ট করা যেতে পারে। এবং সব কাজ মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে করতে হবে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকা হল। প্রায় সকলেই বললেন, নারদ নদী নাটোরের দুঃখ। এটিকে সংস্কার করা উচিৎ। তাছাড়া বিভিন্ন থানা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তাঁদের এলাকার দু'একটা রাস্তার কথা বললেন। সভাশেষে ঠিক করলাম তাঁদের কথা তাঁরা বলেছেন। এখন আমরা ভেবে-চিন্তে তাঁদের কথা বিবেচনায় রেখে যা করা সম্ভব তাই করব। কোর্টপাড়া থেকে জিন্নাহ স্কুলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আধ মাইল ঘুরে যেতে হয়। একটা বাঁশের সাঁকো আছে, কোর্টপাড়া থেকে স্কুলের যাবার জন্য। ওখানে ৮ ফুট চওড়া এবং প্রায় ৩০ ফুট লম্বা একটা ব্রিজ করার কথা বলায় মোটামুটি সকলেই রাজি হলেন। কিন্তু হিন্দু মোক্তারদের মধ্যে যিনি উচ্চকণ্ঠ এবং দু'একজন প্রবীণ হিন্দু উকিল', খুব-একটা সাড়া দিলেন না। যা হোক, রাত-দিন কাজ করে কালভার্টটি নির্মাণ করে বিভাগীয় কমিশনার সাহেবকে উদ্বোধন করার জন্য দাওয়াত করলাম। তিনি খুব খুশী হয়ে কালভার্টটি উদ্বোধন করে গেলেন। ওইটিকে ব্রিজ নামে আখ্যায়িত করলেন তাঁর বক্তৃতায়, আর আমি আমার ধন্যবাদ বক্তৃতায় ওটির নামকরণ করে দিলাম 'লিয়াকত ব্রিজ'। জিন্নাহ স্কুলের ছেলে-মেয়েরা লিয়াকত ব্রিজের ওপর দিয়ে যাতায়াত করবে। সবাই খুশী। তবে সমবেত মেহমানদের মধ্যে উকিল এবং মোক্তারদের কেউ কেউ দেখলাম মুখ ভার করে আছেন। তাঁদের একজন কমিশনার সাহেবকে বললেন, 'স্যার, এটা রাণী ভবানীর জায়গা। তাঁর নামেই এই ব্রিজটা হওয়া উচিৎ ছিল।' হঠাৎ এই উক্তির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কমিশনার সাহেব কিছু বলার আগেই বলে বসলাম, 'আরে উকিল বাবু, দিন কি শেষ হয়ে গেছে নাকি?' কমিশনার সাহেব খুশী হলেন ত্বরিত জবাবে। তিনি নাহক কতগুলো প্রশংসা করে ফেললেন এসডিও সাহেবের। জানি প্রশাসনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তিনি, ওঁদের মন থেকে এসডিও সম্বন্ধে সংশয় দূর করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছিলেন মাত্র। আওয়ামী লীগের এমপিএ কাঁচুউদ্দিন (এমপিএ হয়ে নামের এফিডেভিট দিয়েছিলেন 'কাঞ্চনউদ্দীন' হিসাবে) কিন্তু এসডিওকে সমর্থন করেছিলেন এ কাজের জন্য।

দেখলাম সরকারী নির্দেশ মোতাবেক টেষ্ট রিলিফের টাকা থানায় থানায় ভাগ করে দিলেই আমি নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে পারি। আর সেই টাকা রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ তাঁদের এলাকায় যা কিছু করার করে সার্কেল অফিসারের মাধ্যমে মাষ্টার রোল পাঠিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। বেচারা নাটোর শহরে ধূলা আর কাদা যেমনকার তেমনই থেকে যাবে। সব থানায় কিছু কিছু রাস্তা সংস্কারের কাজ হাতে নিলেও মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রধান দুটি রাস্তায় খোয়া বিছিয়ে রোলার দিয়ে সংস্কার করার ইচ্ছে প্রকাশ করায় মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত কর্মকর্তা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ সমর্থন করলেন। শহরের উঁচা বাজার আর নিচা বাজার এবং রেলস্টেশন সংযোগকারী রাস্তায় খোয়া বিছান হল। শহরের চেহারা একটু ভদ্রস্ত হল। বিভাগীয় কমিশনার এসব দেখে খুশী হয়ে নবাবগঞ্জের জন্য বরাদ্দকৃত আড়াই লক্ষ টাকা নাটোরে দেবার জন্য সুপারিশ করলেন। নবাবগঞ্জে নাকি কোন কাজ হয়নি। এই টাকার প্রায় সবটাই মফস্বলে বরাদ্দ করে দিলাম। ঐ সময় গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য সাহায্য বাবদ বেশ কিছু টাকা সরকার মঞ্জুর করেছিলেন। সরকারী চিঠি পড়ে মনে একটু খটকা লাগল। বলা হয়েছে হিন্দু এবং তফশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্যই কেবল এই টাকা দেওয়া যাবে। অন্য আর একটি চিঠিতে হিন্দুদের মন্দির সংস্কার ও পুনঃনির্মাণের জন্য একটা মোটা অংকের টাকা দেওয়া হয়েছে। মুসলমান হিসাবে মন্দিরের সংস্কারে আমার সহযোগিতা করা ঠিক হবে কি না মনে সংশয় জাগল। ভাবলাম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে খরচ করব। অবশ্য ছাত্রদের টাকাগুলো বিভিন্ন স্কুলের নামে বরাদ্দ করে দেওয়া হল। এখানে বলে রাখি, নাটোর মহকুমার প্রত্যেকটি থানায় অন্তত একটি করে হাইস্কুল ছিল না। শহরের দুটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের এবং থানাগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটিতে একটি করে হাইস্কুল ছিল। তাও সেগুলোর বেশিরভাগই পাকিস্তান সৃষ্টির পর হয়েছিল। কয়েক দিন পর আরও একটি বরাদ্দ এল। আবারও হিন্দু ও তফশিলী জাতির ছাত্রদের জন্য। মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোন প্রকার অর্থ বরাদ্দ আসেনি। যদিও এ বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্টেটকে আগেই লিখেছিলাম। নাটোর মহকুমায় সার্বিকভাবে মুসলমানরাই গরীব এবং অনগ্রসর। তাদের কপালে কিছুই জুটল না পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে। ভাবলাম, আমি ইতিমধ্যে দুটি ভূষণ লাভ করেছি। প্রথমত 'সাম্প্রদায়িক' এবং

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত 'পাগল'। সুতরাং আমি তো এ দুটো ভূষণের ফায়দা নিতেই পারি। সরকারকে জানিয়ে দিলাম, হিন্দু ছেলে-মেয়েদের মঞ্জুরি বাবদ আগে পাওয়া টাকা ইতিমধ্যেই বিলি করা হয়ে গেছে। আর সাহায্য পাবার যোগ্য কোন হিন্দু ছাত্র নেই। জবাবে আমাকে আগের ছেলে-মেয়েদের পুনরায় দ্বিতীয় বরাদ্দ দিতে বলা হল। আমি সজ্ঞানে এবং ঠান্ডা মাথায় এই সরকারী আদেশ লংঘন করে মহকুমার মুসলমান দুস্থ ছেলেদের অর্থ-সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করে সরকারকে জানিয়ে দিলাম। আমি জানতাম যে, এই অপরাধের শাস্তি আমার পাওনা। দেখলাম আমাকে কেউ কর্মচ্যুত (অন্তত সাময়িকভাবে) করলেন না বা কেউ চোখ রাঙিয়ে হুঁশিয়ার করে চিঠি দিলেন না। তখন মন্দির সংস্কারের টাকার বেশিরভাগটাই খরচ করলাম নাটোর শহরের ছয়টা জরাজীর্ণ মসজিদ সংস্কারের কাজে ও মন্দির সংলগ্ন চালা বা আটচালা সংস্কারের জন্য, কোথাও কোথাও যাত্রীদের পানির ব্যবস্থা করে টিউবওয়েল বসালাম। এবং কিছু টাকা ফেরৎ দিলাম। বলে পাঠালাম যে, মন্দির সংস্কার করার জন্য সরকার বাহাদুর যেন অন্য কোন এসডিও পাঠান। কেউ এ চিঠির জাবাব দেননি।

এদিকে পুরোদমে মহকুমার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন সফর করে বেড়াচ্ছি। মানুষের কথা শুনছি, আর এক এক জুম্মার দিন এক এক মসজিদে জুম্মা পড়ছি। মানুষ তাদের নিজেদের সম্বন্ধে আশান্বিত হচ্ছে দেখে ভাল লাগত। প্রত্যেকটি থানায় অতন্ত একটি হাইস্কুল এবং নাটোরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে যাব এই আমার আশা। ভারতের আচার্য বিনোভাভবের মত ভূদানযজ্ঞ শুরু করলাম। গুরুদাসপুর থানার কাছিকাটায় এক মুসলমান নিরক্ষর বিদ্যোৎসাহী মহাপ্রাণ ব্যক্তি তৎক্ষণাত ছয় বিঘা পাকা ফসলসহ জমি রেজিস্ট্রি করে দিলেন। সব জায়গায় অবশ্য তা হল না। বড়াই গ্রামে জমিদান করল এক মুসলমান গৃহস্থ। থানার দারোগাকে বললাম, জায়গাটির দখল নিয়ে স্কুল কমিটিকে বুঝিয়ে দিতে। দারোগা পরে জানালেন, স্থানীয় হিন্দুরা দারোগা এবং স্কুল কমিটির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে এক মামুলি অজুহাতে যে, সংশয় দূর করলাম। সারা মহকুমায় কয়েক মাসের মধ্যে অন্তত ৭টি হাইস্কুল চালু করে বিভাগীয় মঞ্জুরির ব্যবস্থা করার পরে ভাবলাম নাটোর শহরে একটি মাদ্রাসার খুবই প্রয়োজন। মুরগী জবাই করার লোকের অভাব দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া এই শহরে যারা দু'এক ঘর প্রতিষ্ঠিত মুসলমান পরিবার আছেন তাদের কয়েকজন আবার কাদিয়ানী। সুতরাং তাঁরা খুব-একটা এ সব বিষয়ে মাথা ঘামান না। যিনি মুসলিম লীগের এমএনএ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে হিন্দু উকিল-মোক্তাররাই তাঁর পৃষ্ঠপোষক, তাদের মনোরঞ্জনে তিনি সদা তৎপর। বলে রাখি, এখানের মুসলমানরা বিশেষ করে

www.pathagar.com

মুসলিম লীগাররা ভুলে বসে আছেন যে, ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার পরপরই এই নাটোরেই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের জিহাদ সংঘটিত হয়। এখানেই একটি মুসলিম আসনে বাই-ইলেকশন হয় মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একদিকে সারা ভারতের কংগ্রেসের সবকটি প্রথমসারির নেতা অন্যদিকে মুসলিম লীগের প্রথমসারির প্রায় সব নেতাই এই ঐতিহাসিক বাই-ইলেকশনের প্রচার কাজে সর্বশক্তি দিয়ে নেমে পড়েন। মুসলিম লীগ প্রার্থী শতকরা ৯৭টি ভোট লাভ করে দুনিয়ার কাছে পাকিস্তান প্রস্তাবের বাস্তবতার জ্বলন্ত প্রমাণ রেখেছিলেন। এখন থাক সে কথা- পরে আবার এ-প্রসংগে ফিরে আসব।

এক স্লোগান, রাণী ভবানীর দেশ। অতএব যা আছে ভালয় ভালয় মেনে নাও। দেশ ভাগের পর রাজারা কলকাতা থেকে এখানে কমই আসেন। কিন্তু তাঁদের পেছনে ফেলে যাওয়া বরকন্দাজরা মুসলমানদের উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতটুকু কমতে দেয়নি। আজো এখানে আসসালামু আলাইকুম শোনা যায় না। বরং হাত জোড় করে মুসলমানরা আদাব করছে- দেখতে হয়। উপেক্ষা করলে কিছুই নয়। কিন্তু চোখ মেলে তাকালে শুধু করুণাই হয় না বরং প্রশ্নও জাগে মনে। এক মসজিদের ইমাম সাহেবকে দিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হল। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার দিন আওয়ামী লীগ এমপিএ কাঁচুউদ্দীন বললেন, 'এসডিও সাহেব আমাদের ছেলেদের মিসকিন বানাবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন।' জানতে ইচেছ করে, 'তিনি কি তাঁর ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াবেন?' জবাবে সভার সকলকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আমি মিসকিন বানাতে পারি। কিন্তু চোর-ডাকাত বানাব না মাদ্রাসায়। আর ছেলেদের প্রথম সারিতেই আমার প্রথম সন্তান বসে আছে। কিন্তু তিনিতো তাঁর ছেলেকে এখানে পাঠাবেন না। সুতরাং এমপিএ সাহেব হয়ত সঠিক অনুযোগ করলেন না। কৌতুক করে বললাম, 'ছোট বেলায় যদি এমপিও সাহেব এ রকম একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হতেন তবে তাঁর নামটা কসিরউদ্দিন বা কাশেম উদ্দিন হত, কাঁচুউদ্দীন হত না।' ১৯৮৯ সালে অর্থাৎ ৩৩ বছর পর সেদিন দেখলাম মাদ্রাসাটার দোতালা হয়ে তার সঙ্গে পুরানো নামটা ঝুলছে, 'আল মাদ্রাসাতুল জামহুরিয়া'।

এ সময় হঠাৎ জনাব আখতার হামিদ খান সাহেবের কাছ থেকে কয়েক লাইন লেখা একখানা পোস্টকার্ড পেলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কর্মোদ্যম সবকিছুই যেন হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি লিখেছেন, 'তুমি অহেতুক তোমার সময় আর কর্মক্ষমতা অপব্যয় করে চলেছ। থানায় থানায় বা মহল্লায় মহল্লায় যে স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে চলেছ ওখান থেকে তুমি চলে আসার পর এসব

www.pathagar.com

শেয়াল-কুকুরের আস্তানা হয়ে যাবে। তুমি যদি ইচ্ছে কর আমি তোমাকে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে নিয়ে আসতে পারি। ভেবে দেখ।' জনাব আখতার হামিদ খান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বিপ্লবের কিংবদন্তীর নায়ক- সেই চাকরি ছেড়ে আসা খামার কর্মী আইসিএস। তিনি আমার কর্মজীবনের প্রেরণার উৎস এবং তাঁরই একান্ত জবরদস্তির কারণে আমি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেই। ছাত্রজীবন শেষ করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে তাঁরই কাছে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হই। ছাত্রদের কাছে আমি অধ্যাপক আর তাঁর কাছে ছিলাম একজন অনুগত ছাত্র। ১৯৫৩ সালে সিএসএস পরীক্ষা দিলাম না। তিনি রুষ্ট হলেন। আমি চাই শিক্ষকতার জীবন আর তিনি চান 'কিছু দিনের জন্য আমার মত জীবনের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর'। তিনি জয়ী হয়েছিলেন, আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম ১৯৫৪ সালে সিএসএস পরীক্ষা দিয়ে। যেদিন পরীক্ষাসমূহের ফলাফলে আমাকে সিভিল সার্ভিসে মনোনয়ন দিয়ে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করল- সেদিন কলেজের ক্লাস করতে পারলাম না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। বার বার বুকের ভেতর প্রচন্ড আলোড়ন অনুভব করছিলাম। নিজের বিবেক বিদ্রোহ করছিল। আশৈশব লালিত স্বপ্ন- আদর্শ শিক্ষকের জীবন থেকে আজ আমার এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের জন্য।

ঘন্টাখানেক পর আখতার হামিদ খান সাহেব হাতে একটা ছোট কাগজের ঠোঙা নিয়ে আমার রানীর বাজারের বাঁশের তরজার বাসার দরজায় ঘা মারছেন আর আমার নাম ধরে চিৎকার করে চলেছেন। দরজা খুললাম। উচ্চহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকের খবরের কাগজ দেখেছ? তুমি সিএসপি হয়ে গেছ। চিঠি পেয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যে। নাও দুটো সন্দেশ এনেছি, একটা তুমি খাবে- একটা আমি।' প্রায় এক নিমিষে তিনি এতগুলো কথা বলে ফেললেন আর আমি ডুকরে কেঁদে ফেলে তাঁর বুকে (ঠিক বুকে নয় পেটে- কারণ তিনি সাইজে আমার প্রায় ডবল) আছড়ে পড়ে বললাম, 'আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করেছি, পরীক্ষা দিয়েছি এবং আল্লাহ্‌র মর্জি সফল হয়েছি। এখন আপনি আমাকে আমার অন্তরের আশাটা পূরণ করতে দিন। আমাকে শিক্ষকতায় থাকতে দিন। যদি আপনি আপনার কলেজে আমাকে না রাখতে চান আমি অন্যত্র চলে যাব।' আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি হুকুমের স্বরে বললেন, 'চল বাইরে বেড়িয়ে আসি।' তাঁর সঙ্গে হাঁটা মানে আমাকে সারাক্ষণ দৌড়াতে হবে। কিন্তু উপায় নেই। কুমিল্লা শহর থেকে হাঁটা শুরু করে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে আরো এগিয়ে যাচ্ছি ঢাকাগামী সড়ক ধরে। ৬/৭ মাইল হাঁটার পর রাস্তার ধারে একটা কালভার্টের থামের উপর বসে পড়ে তিনি বললেন, 'একটু বিশ্রাম কর। তুমি ক্লান্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছ।' পথে আমাদের মধ্যে হল নানা বিষয়ে নানা কথা- হাসি-তামাশাও কম হল না। কেবল আমার চাকরির বিষয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না তিনি। প্রথম দিকটায় খুব খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে, বাসায় থাকলে বালিশে মুখ গুঁজে নিজের আবেগ দমন করা হয়ত সহজ হত এবং তারপর নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অকপটে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। কিন্তু খান সাহেবের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে আমার সে চিন্তা মাথায় বেশীক্ষণ টিকতে পারল না।

আল্লাহ্তালার শোকর, খান সাহেব এবার ঘরমুখী রাস্তা ধরলেন। অর্থাৎ কুমিল্লামুখী হলাম আমরা দু'জনে। এবার তিনি প্রায় প্রতিটি কথাই বললেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে এবং নতুন দেশের নতুন প্রশাসন যন্ত্রের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে। সবচেয়ে বড় করে ব্যাখ্যা করলেন এই কথাটাকে, যদি কেউ দেশ ও মানুষের খেদমত করতে চায় তবে এই সার্ভিসে তাঁর অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। আমার বাসার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নাজির, আমি আমার জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। লাভবান হয়েছি। আমি চাই তুমিও তোমার জীবন নিয়ে কিছুদিন এক্সপেরিমেন্ট কর।' শেষ কথা বললেন, 'তখ্ত ইয়া তাউস'? ইংরেজি করে বললেন, 'আইদার দি থ্রোন অর দি গ্যালোজ।'

সেই আখতার হামিদ খান আবার পোস্ট কার্ড নামক এক শেল বর্ষণ করলেন— কুমিল্লা থেকে নাটোর অভিমুখে আমাকে লক্ষ্য করে। ভাবলাম এক্সপেরিমেন্ট যদি করতেই হয় তো বর্তমান কর্মজীবনেই করব। অন্য কোথাও আপাতত নয়। পোস্টকার্ডখানা যত্ন করে রাখলাম। এখন জবাব দেব না। মাথা থেকে ভাবালুতা দূর হোক, কয়েকদিন পরে জবাব দেওয়া যাবে। আমি সারা মহকুমা ঘুরে দেখেছি। মানুষগুলো শুধু নিরক্ষরই নয় বরং তাদের আত্মশক্তি বিলুপ্তির পথে। আমি থানা সদরে ডাকবাংলোয় রাত্রি যাপন করেছি। গ্রামের মানুষরা সারি বেঁধে ভোরবেলা ডাকবাংলোর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি ব্যাপার? নানাজনের নানা সমস্যা। সবচেয়ে চমকপ্রদ সমস্যা হল এক পিতা, হ্যাঁ হতভাগা এক মুসলমান বলছে, 'হুজুর, একটা আর্জি আছে- আপনার দোয়ায় আমার একটা বেটাপুত হয়েছে। হুজুর, একটা নাম রেখে দিলে আমরা সাত গেরামের মানুষ আপনারে দোওয়া করব।' বুঝলাম যে, সুবাতাস বইতে শুরু করেছে- যার নতিজা এটা। জমিদার চলে গেছে- তাদের উমেদার তস্য উমেদার হিন্দু বাবুদের বাড়ীতে না গিয়ে মুসলমান এখন এসডিও সাহেবের ঘরের দরজায় ধরনা দিচ্ছে। প্রথমে একটু রাগত স্বরে তাঁকে বকাবকি করলাম। পরে বললাম, মুসলমানের ঘরে ছেলে হয়েছে, কত ভাল ভাল নাম রয়েছে। স্থানীয় মসজিদের ইমাম

www.pathagar.com

সাহেবের কাছে যাও, তিনি নিশ্চয় একটা সুন্দর নাম বেছে দিবেন। অন্য কারো কাছে যেতে নিষেধ করলাম। মহকুমা থেকে বিদায় হবার আগে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, ওই পিতা ছেলের নাম রেখেছিল আবদুল ওহাব। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার আলোই কেবল শতাব্দীর জমে থাকা ঘন কালো অন্ধকার সমাজ দেহ থেকে দূর করতে পারবে এবং এখানকার মুসলমান সমাজ শিক্ষার আলোয় নিজের চেহারা দেখতে পাবে। বলে রাখি, সারা মহকুমায় কেউই শিক্ষিত ছিল না, এ কথা ঠিক নয়। কিন্তু শিক্ষিতের সংখ্যা হাতে গোনা যায় এই পরিমাণ।

শাসক রাজনৈতিক দলের মহকুমা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কার্তিক দাসের দোকানের দুই বিড়ি শ্রমিক। ১৯৭২ সালে অবশ্য তাঁদের একজন এমপি হয়েছিলেন। মনে হয় ঐ সময় ভদ্রলোক নাম সই করতে শিখে ফেলেছিলেন। আর একজনের কথা তো আগেই বলেছি। কাঁচুউদ্দিন অবশ্য একজন মোক্তার ছিলেন এবং আমার সময়কালে আওয়ামী লীগের এমপিএ ছিলেন। মহকুমা উকিলবারে কোন মুসলমান উকিল ছিল না। কোন ডাক্তার এমনকি এলএমএফ ডাক্তারও ছিল না। যাই হোক, সুখের কথা, পরে হাইস্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। যা করা হয়েছিল তার একটিও বন্ধ হয়নি। এমনকি আমার প্রথম প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটিও আজ বর্ধিত কলেবরে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। খান সাহেবকে সপ্তাহ দুই পরে জানালাম, তাঁর মন্তব্য আমাকে প্রভূতভাবে সচেতন করে দিয়েছে এবং শিক্ষার আলোকবর্তিকা এখানেই জ্বালাবার চেষ্টা করব। কোন মারাত্মক অঘটন না ঘটলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিকে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। আর মুসলমানদের মুসলমানিত্ব ধরে রাখার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে যাব। তাঁর সাহচর্য আমার কাছে দুর্দমনীয়ভাবে লোভনীয় হলেও আমি মাঠ-ঘাটের ও খেত-খামারের মানুষের সরল অন্তরের সন্ধান পেয়েছি, তাদের সান্নিধ্য ছাড়ার লোভ দমন করতে পারছি না ঃ মানুষ তার সারাদিনের ঘাম-মোছা গামছায় আমার কপালের ঘাম মুছে তার পাতার কুঁড়ে ঘরে পিঁড়িতে বসিয়ে পান্তা ভাত বা চিড়ে-গুড় খেতে দেয়, এই নিখাদ আন্তরিকতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা কি সহজ ব্যাপার?

বুঝলাম, আমার এই চিঠির দরুন নিজেকে আমি খান সাহেবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। তিনি অবশ্য কোন অনুযোগ করেননি এ জন্য কোন দিন। আমি বুঝতে পারছিলাম যে হয়ত আর বেশী দিন নাটোরে থাকতে পারব না। কারণ আমার কর্মকাণ্ডে স্থানীয় ভদ্রলোক শ্রেণী, যারা বলতে গেলে মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা সামনে প্রতিবাদ করে না কিন্তু কেমন যেন দূরে দূরে সরে থাকে। সভা-সমিতিতে ডাকলে অবশ্যই আসে। কিন্তু কাজ-কর্মে বড়-একটা সাড়া দেয় না। যা হোক-

www.pathagar.com

জানতে পারলাম যে, গোটা বিশেক ছাত্র নিয়ে একটা স্কুল বাড়ীর ভাঙ্গা ইমারতের দুটো কামরায় একটা কলেজ স্থাপন করেছিলেন আমার পূর্বসূরি। কিন্তু কলেজ স্থাপনের দুমাসের মধ্যে ভদ্রলোককে তল্পিতল্পা গুটিয়ে অন্যত্র যেতে হয়েছে। এরই মধ্যে একদিন উক্ত কলেজের বাংলার অধ্যাপক আমার বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি পানাসক্ত। নানাভাবে জানতে চাইলেন আমি কি পছন্দ করি। তারপর তিনি বললেন, তাঁর দুটো মেয়ে আছে, তারা গান করে এবং এসডিওকে গান শুনাবার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমি দয়া করে তাঁদের বাড়ী গিয়ে গান শুনলে গানও শোনা হবে আর কলকাতার পাঁপড়, নাটোরের আসল কাঁচাগোল্লা ইত্যাদি উপাদেয় চা-নাস্তাও সদ্ব্যবহার করা যাবে। তবে আমার যদি সময় না থাকে তাহলে অনুমতি পেলে তিনি তাঁর মেয়ে দুজনকে আমার বাসায় এনে গান শুনিয়ে যাবেন। হঠাৎ নিজের অজান্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্ত্রী আছেন?' জবাবে বললেন, 'তিনি স্বর্গে গিয়েছেন গত দু'বছর।' তিনি আরও বললেন, 'কোন অসুবিধা নেই, আমি আমার মেয়েদের নিয়ে আসি- তারা খুব মিশুক। আপনিও নিশ্চয় পছন্দ করবেন তাদের।' তাঁর চাপাচাপিটা আমি একটু ভিন্ন নজরে দেখলাম। স্পষ্টভাবেই বললাম, 'যেসব কাজে হাত দিয়েছি তাতে করে ব্যক্তিগত আয়েশ-আরামের জন্য কোন সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নিজের দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়ে এ পর্যন্ত সস্ত্রীক কোথাও বেড়াতে যেতে পারিনি। সুতরাং গানটান শোনা এখন থাক।' কিন্তু তিনি নাছোড়-বান্দার মত আবার বললেন যে, 'আমার পূর্বসূরি এক এসডিও একজন সিএসপি ছিলেন তিনিও আমার মেয়েদের খুব পছন্দ করতেন। তারা উনাকে দাদা ডাকত। আমি বরং আজ সন্ধ্যায় ওদের নিয়ে আসি।' এবার আমাকে একটু রূঢ় হতে হল। বললাম, 'আপনাদের কলেজ দেখতে যাব কাল, তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এখন আপনি যান। আর আপনার মেয়েদের বলুন আমার গান শোনার মত সময়, ধৈর্য এবং রুচি কোনটাই এখন নেই। তবে কোন অনুষ্ঠানে তারা অংশ নিলে অন্য সবার সাথে আমিও তাদের গান শুনে নেব।' ভদ্রলোক বিদায় হয়ে আমাকে বাঁচালেন। আমার গোপনীয় সহকারীর কাছে জানতে পারলাম যে, ভদ্রলোক প্রায়ই মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন। আর নাটোরের বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করে বেড়ান নিজের মেয়েদের দিয়ে। স্ত্রী বেচারী স্বামীর অবহেলায় অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। মনে হল, এই বেটা গোঁয়ার এসডিওকে বড়শিতে আটকানর এ ছিল এক কৌশল। আল্লাহ্তায়ালা রক্ষা করেছেন।

কলেজ দেখতে গেলাম। সাইন বোর্ড ছাড়া কামরা দুটোর অবস্থা, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা- সবকিছুই শোচনীয় বললেও সবটা বলা হয় না। দেখলাম, প্রিন্সিপাল সাহেব গায়ে-গতরে কুস্তিগীর গামার সমান না হলেও তার চাচাত ভাই হবার যোগ্য।

www.pathagar.com

তাঁর আফসোস আগের এসডিও কলেজ শুরু করেই বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর আশা, নতুন এসডিও এটাকে প্রায় একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে ফেলবেন। কারণ টাকার অভাব নেই। এসডিও ইচ্ছে করলেই নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের প্রতিগাড়ী আখের ওপর দু'আনা লেভী বসাতে পারেন এবং এটা করলেই টাকার স্রোত বইতে থাকবে। এও জানালেন যে, তিনি আরও অনেক জায়গায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'এতগুলো কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পর কোন একটিতেও টিকে যেতে পারেননি কেন?' ভদ্রলোক এই প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন না। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'স্যার, আমার কাজই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। তবে সব সময়ই ম্যানেজিং কমিটিতে খারাপ লোক ঢুকে পড়ে এবং আমাকে সহ্য করতে পারে না।'

পরদিন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানকে ডাকলাম পরামর্শ করার জন্য। বলে রাখা ভাল যে, নাটোর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় হিন্দু জনসংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী। তবু তাদের একজন প্রিয়পাত্র মুসলমানকে তারা চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচন করেছে পাকিস্তান সরকারের মদদ লাভের আশায়। মজিদ সাহেব মানুষটা ভাল। এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট। কিন্তু তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি সবই হিন্দুদের কাছে বন্ধক দেওয়া ছিল- তা না হলে বেচারার চেয়ারম্যানশিপ থাকে না। তাঁর সাথে নানা আলাপ-আলোচনার পর স্থানীয় এবং থানা পর্যায়ের গণ্যমান্য লোকদের একটা সভা ডাকলাম। নির্ধারিত দিনে সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় স্থির হল, টাকা-পয়সা দান হিসাবে সংগ্রহ করা ছাড়া আপাতত লেভী বসান যাবে না। আর শহর থেকে স্টেশনে যাবার রাস্তার বাম দিকে মিউনিসিপ্যালিটির পতিত জায়গা আছে পাঁচ বিঘার মত- সেটা মিউনিসিপ্যালিটি কলেজকে দান করবে। আলহামদো লিল্লাহ। জানতে পারি যে, কয়েক বছর আগে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গড়দের ওখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ভূতের ভয়ে তারা ঐ জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি বললাম, 'এসডিও ভূত তাড়ান মন্ত্র জানে সুতরাং কলেজ ওখানে নির্বিঘ্নেই বসবে।' কিন্তু মুশকিল দেখা দিল কলেজের নাম নিয়ে; নাম হতে হবে 'রাণী ভবানী কলেজ'। এ দাবী সভার অনেকের এবং মিউনিসিপ্যালিটিরও। অথচ সারা মহকুমায় কোথাও রাণী ভবানীর জনকল্যাণমূলক কোন প্রতিষ্ঠান নজরে পড়েনি আমার। এমনকি চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। দু'একটা পুকুর এবং শহরে একটা দীঘি ছাড়া আর কোন কিছুই দেখতে পাইনি। সংখ্যাগুরু প্রজাকুল মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, তাঁর নিজের স্বজাতির কল্যাণেও দীঘি ছাড়া কেউ আর কিছুর খোঁজ পাবে না। নাটোর রাজাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক দানের নজির হচ্ছে রাজা-রাণীরা কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে নাটোর স্টেশনে এসে সেখান থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে রাজবাড়ীতে যেতেন তখন রাস্তার দুধারে উঁচা বাজার, নিচা বাজারের বেশ্যারা কলসি কাঁখে দাঁড়িয়ে উলুধ্বনি দিত। এটাই

www.pathagar.com

যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই শহরে। কোন মুসলমান কখন ছাতা মাথায় দিয়ে বা জুতা পরে রাজবাড়ী এলাকার রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারত না। করলে শাস্তি, হয় মৃত্যুদন্ড, নয়ত চরম নিপীড়ন। এই তথ্য পাওয়া গেল রাজার পরিত্যক্ত পিসিমার কাছে- যিনি দেশ ভাগের পরও পিতৃগৃহে বৈধব্যের জীবন-যাপন করছিলেন- চাকর আর মন্দিরের সেবাইতদের করুণার ওপর নির্ভর করে। তবে অবস্থাপন্ন হিন্দু বাবুদের বাড়ীর দাওয়ায় মুসলমানদের জুতো খুলে উঠতে আমি নিজেই দেখেছি এবং শহরের বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে গল্প-গুজব করার সময় তাঁরা প্রায়ই আত্মতৃপ্তি জাহির করতেন এই বলে যে, পাকিস্তান হবার পর এখন ছাতা মাথায় দিয়ে সকল এলাকায় হাঁটা-চলা করা যায়।

অনেক দেন-দরবার করেও নামের মীমাংসা করা গেল না। সামনে ঈদে মিলাদুন্নবী। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানসহ কিছু মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে এই দিবস উদ্‌যাপন করার উদ্যোগ নিলাম, সবাই খুব উৎসাহিত হল। স্থান ঠিক করা হল জিন্নাহ স্কুলের হলঘর। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌কে ঢাকা থেকে দাওয়াত করে আনার ব্যবস্থা করা হল। রাতে তাবাররুক বিতরণেরও বন্দোবস্ত করা হল। আবার বাধল গোলমাল তাবারুকে কি থাকবে তা নিয়ে।

প্রায় সকলেই বললেন মিষ্টি, জিলাপি। আমি বললাম, 'বিরিয়ানী বা সাদা পোলাও ও গরুর গোশ্‌ত। নাটোরে গরু জবাই করে প্রকাশ্যে তা দিয়ে ভুঁড়ি ভোজন করা হবে- এ যে একেবারে তাজ্জব ব্যাপার। সেই প্রবীণ ডাক্তার সাহেব খুশী হলেন খুব, কিন্তু গোপনে পরামর্শ দিলেন যে, এটা আমার সরকারী চাকুরে হিসেবে একটা ঝুঁকির ব্যাপার হবে। কারণ হিন্দুরা ঢাকায় এবং রাজশাহীতে টেলিগ্রাম পাঠাবে আমার বিরুদ্ধে। আমি বললাম, 'টেলিগ্রামের উত্তর লিখে রেখে আমরা অনুষ্ঠান করতে যাব আর বদলি? সেতো আজ হোক, কাল হোক হবেই কোথাও না কোথাও যেখানে যাব সেখানে আরো একটু জোরে-সোরে এসব কাজ করলে সরকার আমাকে ঢাকায় বদলি করবেন। তাতে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আরামে থাকা যাবে। সাপে বর হবে, 'মন্দ কি?' যাই হোক- ডাক্তার সাহেব, আনসার এডজুটেন্ট, জিন্নাহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেকেন্ড অফিসার এবং দুজন সার্কেল অফিসার খুব উৎসাহ দেখালেন। নিজের মাসিক বেতন ছিল ৩৭৫ টাকা। সপরিবারে খাওয়া-দাওয়া করে সব টাকা খরচ হত না। প্রতি মাসেই কিছু টাকা বাঁচত। ভাবলাম এই টাকার সদ্ব্যবহার করা যাবে। দেশের উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ বলে কথিত তেবাড়িয়া হাট থেকে নিজের টাকা দিয়ে একটা খুব ভাল গরু কিনে আনালাম। নির্দিষ্ট দিনে জিন্নাহ স্কুলের কম্পাউন্ডে মসজিদের ইমাম সাহেব গরু জবেহ করলেন। নাটোর শহর থমথম করছে। কি জানি কি হয়।

www.pathagar.com

রান্না হল। এবার খাবার পালা। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি খেতে বসতে চাইলেন না। কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'আমাদের গরু খাওয়া চলবে না। ডাক্তার মানা করেছেন।' চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম, 'হয় এই দস্তরখানে বসে সবার মত খাবেন নচেত... হাতে একটা ছোট ছড়ি ছিল- দেখিয়ে বললাম, এটি পিঠে পড়বে। হিন্দু হলে মিষ্টি এনে আপনাকে দেওয়া হত। কিন্তু মুসলমানকে গোশ্ত খেতে শিখতেই হবে। গরুতে ইসলাম নেই। কিন্তু নাটোরের হতভাগা মুসলমান সন্তানদের আত্মপ্রত্যয় অবশ্যই এতে বাড়বে। গরীব মানুষেরাও বছরে সস্তায় গোশ্ত খাবার বাসনা পূরণ করতে পারবে। মুসলমান বিত্তশালীরা গরু কোরবানী দিতে শুরু করবেন আর বছরে অন্তত একটি দিন গরীবরাও গোশ্তের স্বাদ পাবে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।' তিনি আমার পাশেই বসে ছিলেন। আমার মুখের দিকে অসহায়ের মত তাকালেন আর আমি আমার বর্তন থেকে এক টুকরা গোশ্ত তাঁর মুখে তুলে দিলাম। সমবেত মানুষ এ দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্বরে ধ্বনি দিল 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার।'

এতবছর পরে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সেই সন্ধ্যার দৃশ্য আজো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে- আর নিজের শরীরে শিহরণ অনুভব করি। আমাকে দেওয়া হিন্দুদের ভূষণ 'সাম্প্রদায়িক' আজ প্রকাশ্য রূপ নিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে হিন্দুরা বিভিন্ন জায়গায় তারবার্তা পাঠাল, এসডিও সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। আর মুসলমানদের মধ্যে নোয়াখালী জেলা থেকে এসে কিছু কৃষি কর্মী নাটোরের আশে-পাশে বসত করেছে- তারা এবং সরকারী কর্মচারী যাঁরা অন্য জায়গা থেকে এসেছেন- তাঁরা দাবী করলেন, বাজারে একটি গরুর গোশ্তের দোকান করতে হবে। অতীতে মিউনিসিপ্যালিটি তাদের এ দাবী বার বার প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তারা আমার কাছে দাবী করল যে, এটা করতেই হবে। তাদেরকে চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে পাঠালাম। বেচারা পড়লেন ফাঁপড়ে। তাঁর মূল শক্তি হিন্দু সমর্থন। তাছাড়া বাপ-দাদার আমল থেকে শহরে যে জিনিস বিক্রি হয়নি, আজ কিভাবে তিনি সে জিনিসের অনুমতি দেবেন। এসডিও সরকারী কর্মচারী। আজ আছে কাল নেই। তাঁকে তো এখানেই থাকতে হবে আজীবন। যা হোক, তিনি লোকজন নিয়ে আমার সংগে দেখা করতে এলেন। তাঁকে বললাম, 'এ দাবী যুক্তিসংগত, সুতরাং এটা মঞ্জুর করাই ভাল। অন্যদের অসুবিধা হলে জবাই করবেন আড়ালে এবং সেখান থেকে বাজারে আনার সময় একটু ঢেকে-ঢুকে আনার ব্যবস্থা করবেন।' তিনি সেদিন সন্ধ্যার কথা নিশ্চয় ভুলে যাননি এত তাড়াতাড়ি। তাই সম্ভবত আর আপত্তি করলেন না। বাজারে গরুর গোশ্তের দোকান চালু হল। আর এসডিওর বিরুদ্ধে আর এক দফা তারবার্তা নানাদিকে ছুটল।

www.pathagar.com

এবার আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেছে মনে করে কলেজের জন্য দান করা জায়গায় কথিত ভূত তাড়াতে গেলাম। কোদাল-গাঁইতি নিয়ে। সঙ্গে বেশ কিছু লোকজন। কলেজের জন্য খুঁটি গাড়া হল। জঙ্গল পরিষ্কার করা হল। কিন্তু কোন ভূত দেখা গেল না। আমার কর্মচারীদের দিয়ে যে সাইন বোর্ডটি লিখিয়েছিলাম, সেটি প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ওখানে দুটো বাঁশের খুঁটি পুঁতে পেরেক দিয়ে আটকিয়ে দিলেন। লেখা ছিল-

নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলেজ, নাটোর।

নবাব সিরাজুদ্দৌলাই রাণী ভবানীকে এই জমিদারী দান করেছিলেন। কৃতজ্ঞতাবশত রাণী নবাবকে তাঁর কন্যা উপঢৌকন দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা নবাব দরবারে গৃহীত হয়নি। শুনেছি বর্তমানে কলেজটি সরকারী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কোন ভূতের কথা আর কখনও কেউ বলেনি। আসলে ভূতটা ছিল কলেজ প্রতিষ্ঠা বন্ধ করার অপচেষ্টা মাত্র। কারণ মুসলমান ছেলেরা স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করলে তাদের চোখ ফুটে যাবে। বাবুদের যথাযোগ্য মান্য করবে না।
এসময় একদিন দিঘাপতিয়ার রাজকুমার আমার সংগে দেখা করতে এলেন। তিনি কয়েকদিনের জন্য কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। নানা কথার পর বললেন, 'এসডিও সাহেব, যে ক'দিন এখানে আছি আপনি সহজেই আমার ওখানে আসতে পারেন, এখানে তো মেশবার মত কেউ নেই। আমার ওখানে ভাল ভাল ড্রিংকস আছে।' মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'দেখুন, আমি তো ভদ্রলোকদের মহকুমায় আসিনি। এসেছি সব ছোটলোকদের জায়গায়। সুতরাং তাদের খাদেম হিসেবে চাই আর না চাই আমাকে তাদের সাথেই সর্বক্ষণ মিশতে হয়। ওদের ভালমন্দ খোঁজ-খবর করার দায়িত্ব নিয়েই তো আমি এখানে এসেছি। কলকাতার ভদ্রলোকদের সাথে মেশার মন-মানসিকতা তো আমার থাকার কথা নয়। তাছাড়া ড্রিংকসের বিলাসিতা আমার নেই, মাফ করবেন।'

নাটোরে এবং দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ীর জৌলুস এখন আর নেই। যেটুকু বাকি আছে সেটুকু বছরে একবার রাজাদের কোন প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এসে অথবা এখানকার পরিত্যক্ত জমিদার কর্মচারীরা কিছু কিছু করে সরাতেন- সোনাদানা বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র। বর্তমানে রাজকুমারের নাটোর পদার্পণ সেই কারণেই। কিছুদিন পর নাটোর রাজার জামাইবাবুও একবার এলেন এবং আমি ডিএম দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। একটা কথা বলে রাখা ভাল, এদেশীয় সরকারী ভিআইপি সাহেবরাও মাঝে-মাঝে রাজবাড়ী পরিদর্শনে গিয়ে কিছু কিছু নিদর্শনমূলক জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর তাঁদের বেগম সাহেবারা সঙ্গে থাকলে তো আর কথাই নেই। সে সব জিনিস আর কোন দিন ফিরে আসত না। এই পরিদর্শক লিস্টে কোন দপ্তরের ভিআইপি বাদ পড়তেন না। বোধকরি মহকুমা অফিসার প্রোটকল

www.pathagar.com

রক্ষার্থে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতেন। অবশ্য বদলি হয়ে যাবার বেলায় এক-আধটা জিনিস যদি সংগে নিতেন সেটা আর তেমন দোষের কি! খবর নিয়ে জানলাম দিঘাপতিয়ায় কিছু বই-পত্র আছে। বইগুলো দেখলাম একদিন। আইন সংক্রান্ত বইগুলো রাজশাহী ল' কলেজে দেবার প্রস্তাব করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখলাম। আর বাকীগুলো নাটোর কলেজে রাখার মনস্থ করলাম। এ সময় জমিদারদের কোষাগারে কিছু সোনাদানা ও বন্দুক আছে জানতে পারলাম। রাজবাড়ীর মন্দিরের সেবাইতরা রাজার পিসিমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সোনার থালাবাটি, বারকোষ ইত্যাদি এক একটা বিক্রি করে দিত। এটা চলছিল বছরের পর বছর ধরে। এক গল্প শুনলাম যে, রাজশাহীর কোন এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নাটোর রেল স্টেশনে স্বয়ং উপস্থিত থেকে রাজার ধনরত্নাদি অনেকগুলো কাঠের সিন্ধুকে ভরে কলকাতাগামী ট্রেনে নির্বিঘ্নে চালান করে দিয়েছিলেন। কি শর্তে তা অবশ্য আমার জানা নেই। এছাড়া বিদেশী বন্দুক তো কোন ব্যাপারই না। সার্কেল অফিসার থেকে কমিশনার সাহেব পর্যন্ত এবং পুলিশের হাবিলদার থেকে ডিআইজি পর্যন্ত সকলেই জানেন। এসব কথা নাটোর শহরবাসী ছোট-বড় সকলের মুখে মুখে। ভাবলাম, যা রটে তার কিছু তো বটে।

একদিন এক সোনার বাটিসহ এক সেবাইতকে একজন আনসার সহকারী এডজুটেন্ট আমার কাছে ধরে নিয়ে এল। জানাল যে, এই বাটি নাটোর রাজবাড়ী থেকে নিয়ে সে স্বর্ণকারের কাছে বিক্রির জন্য যাচ্ছিল; পথে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে। বললাম, 'বাটিটি আপাতত সাবট্রেজারিতে নিয়ে জমা দিন। মানুষটাকে ঠিকানা রেখে ছেড়ে দিন।' তাই হল। পরদিন হঠাৎ করে কিছু পুলিশ এবং কয়েকজন কোর্টের কর্মচারী নিয়ে নাটোর রাজবাড়ীর মালখানায় গিয়ে হাজির হলাম। দু'একজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তালার চাবি চাইলাম। জবাবে আমাকে জানান হল যে, এই সীলকরা তালার চাবি কলকাতায় আছে। তালা ভাঙ্গার আদেশ করলাম। সব জিনিসের পুরো ইনভেন্টি করলাম। বেশ কিছু লোক জমে গেছে ইতিমধ্যে। প্রায় ২০/২২টা নানা ধরনের বন্দুক, কিছু তালাবদ্ধ স্টিলের ট্রাংক, কিছু বড় বড় তালাবদ্ধ সিন্দুক, আর টুকিটাকি মূল্যবান জিনিস গরুর গাড়ীতে পুলিশ পাহারায় কোর্টে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম। মন্দিরের একজন সেবাইতের সঙ্গে কোর্টের একজন হিন্দু কর্মচারীকে মন্দিরের ভেতর গিয়ে সোনা-রূপার থালাবাসন যা আছে বের করে নিয়ে আসতে বললাম। সেবাইত নারাজ। সে বলল 'হুজুর, ব্রাহ্মণ ছাড়া মন্দিরে কেউ প্রবেশ করতে পারে না- এ মহাপাপ! সুতরাং এ কর্মচারীকে ভেতরে যেতে দেওয়া যায় না।' হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ যেতে পারে না বুঝলাম; কিন্তু আমি তো হিন্দু নই- আমার ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ কোন কিছু হবার প্রশ্নই উঠে না- সুতরাং আমি ঢুকলে কি পাপ হবে? আর যদি পাপ হয় তাহলে সেটা কি আপনাদের ওপর বর্তাবে? জবাবে

www.pathagar.com

বেচারা হাত জোড় করে বলল, 'হ্যাঁ হুজুর, আপনি যেতে পারেন। অসুবিধা হবে না।' বললাম, 'আরে আমি তো মুসলমান, মন্দিরে ঢুকলে দেবতা বিগড়ে যাবে না?' জবাবে বেচারা কাঁপছে আর বলছে, 'হুজুর তো সরকার, সরকারের কোন পাপ হবে না।' হিন্দু কর্মচারীকে দরজার চৌকাঠের বাইরে থাকতে বললাম আর একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে সেবাইতকে ভেতরে ঢুকে ঐসব জিনিস যা আছে একটা ঝুড়িতে করে সব বের করতে বললাম। নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম যাতে সেবাইত হাত সাফাই না করে। প্রায় ৪/৫ ঘন্টা পর সবকিছু গরুর গাড়িতে তুলে নিজের কোর্টের দিকে রওয়ানা দিলাম। শহরে একটা চাপা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। হিন্দুরা মনমরা, মুসলমানরা একটু খুশী। নিজের অফিসে এসে সাবট্রেজারারকে চার কপি ইনভেন্টি করে মালামালগুলো গচ্ছিত হিসেবে সাবট্রেজারিতে জমা রাখার লিখিত আদেশ করলাম। ইনভেন্টির এক কপি সেবাইতকে দিলাম রাজার কাছে পাঠাবার জন্য, এক কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর নামে এবং এক কপি আমার নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে রেখে অন্য এক কপি এসডিওর কনফিডেন্সিয়াল সেকশনে রাখার ব্যবস্থা করলাম। সাবট্রেজারার তাঁর রেজিষ্টি খাতায় নথিভুক্ত করলেন সবকিছু। ভাবলাম, নাটোর থেকে বদলির দিন আরো এগিয়ে আনলাম নিজেই। ঐ দিন বিকেল বেলায় বাইরে কোন কাজে যাব মনে করে বেরুচ্ছি এমন সময় নাটোর রাজবাড়ীর মন্দিরের সেই সেবাইত এলেন। বললেন, 'হুজুর, রাজার পিসিমা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর বয়স আশির ওপর, শরীরও খারাপ তাই তিনি নিজে আসতে পারলেন না আমাকে পাঠিয়েছেন।' এই আমন্ত্রণের জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না। কাজ বাতিল করে সাইকেল হাঁকিয়ে গেলাম রাজার পিসিমার কাছে। রাজবাড়ীর ভেতর একটা টিনের চালা ঘরে একটা পুরানো খাটে ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন। বিছানার পাশে একটা জরাজীর্ণ কাঠের চেয়ার আর গুটি কয়েক বেতের মোড়া, একটা আলনা, একটা ময়না পাখি, আর একটা বিড়াল দেখলাম ঘরটিতে। যেতেই বৃদ্ধা উঠে বসলেন এবং হাসিমুখে আমাকে বসতে বললেন চেয়ারটিতে। মাথার চুলগুলো সোনালী রং-এর, পরনে বিধবাদের পাড়হীন ধূতি, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। এত সুন্দর ইংরেজী কোন বাঙালীর মুখে শুনিনি আগে। তাঁর বাচন ভঙ্গি ও ভাষার প্রশংসা করায় বললেন, 'আমি আমার টিউটরের কাছে পড়েছি, কোন স্কুল-কলেজে পড়িনি।' দেখলে মায়া লাগে। বললাম, 'আপনি এরকম একা নিঃসঙ্গ এখানে আছেন- অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়?' জবাবে বললেন, 'আমার বাপের ভিটেয় মরতে চাই। সেজন্যই আছি।' চা খাবার জন্য খুব সাধাসাধি করলেন। মাফ চাইলাম। খুব তেজোদীপ্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'বাবা, আমি তোমার কাজকর্ম সম্বন্ধে যা শুনছি তাতে তোমাকে একবার দেখার ইচ্ছে

www.pathagar.com

হয়েছিল। আজ তুমি আমার যে উপকার করেছ সেজন্য তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এবং আশীর্বাদ করতে চাই।- সেজন্যই ঠাকুরকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হচ্ছে রাজধর্ম। তোমার কাজে তারই প্রতিফলন দেখে এই বৃদ্ধার অন্তর নেচে উঠেছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, বাবা।' জানালাম যে, 'আমি রাজা নই তাই আমার কোন রাজধর্মও নেই। লুটপাট বন্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য।' 'আপনার চলে কিভাবে?' জানতে চাইলাম। জানালেন, 'ভগবান চালায়।' আমার মনে হল রাজার গোষ্ঠী আদতে পাষন্ড, নচেত এই অসহায় বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলে তাঁর দেখা-শুনার কোন প্রকার ব্যবস্থা না করে কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছে। এখন এই সেবাইতগুলো ছাড়া বৃদ্ধার আর কেউ নেই দেখা-শুনা করার। যাহোক, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে জেলা ম্যাজিস্টেটকে লিখলাম সব কথা। রেভিনিউ আইনে জেলা কালেক্টর রাজার পরিত্যক্ত মন্দিরের সেবাইত। তিনি ইচ্ছা করলে একজন স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন। প্রস্তাব করলাম রাজার পরিবারের এই বৃদ্ধাকে এজেন্ট নিয়োগ করে সহজেই মাসে ৩/৪ শত টাকা মাসোহারা দেওয়া যেতে পারে। এতে এ অসহায় মহিলার একটু উপায় হবে। এর কোন জবাব আসেনি। ১৯৬২ সালে রাজশাহী জেলার ডেপুটি কমিশনার হয়ে কাজে যোগ দেবার পর খোঁজ নিয়ে জানলাম, বৃদ্ধা তখনো বেঁচে আছেন এবং নিজের ছয় বছর আগে দেওয়া প্রস্তাব নিজেই বাস্তবায়ন করলাম।

সে সময়টায় দেশে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল। সরবরাহও কমছিল। এসডিওর বাংলোর সামনের মাঠটায় ভুখা মানুষের ভীড় জমে গিয়েছিল। জানিনা, অদৃশ্য কারো ইশারায় এ কাজ তারা করে ছিল কি না। কোর্ট থেকে বাংলোয় যাবার পথ প্রায় বন্ধ। এ দৃশ্য দেখে হয়ত বা কেউ একথাই বলে বসত যে, এসডিওকে ঘেরাও করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞেস করলাম কেন তারা এসেছে এখানে। জবাবে তারা খাবার চাইল আর বলল, ব্যবসায়ীরা চাল-ধান লুকিয়ে রেখেছে। বাজারে ছাড়ছে না আর আমরা না খেয়ে মরছি। হুজুর একটা ব্যবস্থা করে দিন। মহকুমা খাদ্য অফিসার ও আনসার এডজুটেন্ট ও পুলিশ সার্কেল ইনসপেক্টরকে ডাকলাম। ঠিক করা হল যেখানে যেখানে ধান-চাল মজুদ আছে সন্দেহ হবে সেখানে সেখানে অনুসন্ধান চালান হবে এবং তা এখনই।

সময়টা দুপুর। নিচা বাজারে দু'-এক জায়গা থেকে কয়েক বস্তা চাল, আটা পাওয়া গেল। সেগুলো বিধিমত সীজ করে নেওয়া হল। বাজারে একটা বিড়ির ফ্যাকটরির গুদাম ছিল। সেখানে বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ১০/১২ বস্তা চাল এবং আটা ৩/৪ বস্তা। ঘরটি বন্ধ। মালিকের খোঁজ করতে বলা হল। জানা গেল, সে ভারতে গিয়েছে। ঘরের চাবি কার কাছে? জবাবে বলা হল, 'চাবি নিয়েই কলকাতা গেছে।'

www.pathagar.com

কিন্তু বেড়ার ফাঁকে দেখা গেল যে, দাঁড়িপাল্লাসহ চাল ওজন করে কিছুক্ষণ আগেও দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। কোন উপায় না দেখে বললাম, 'তালা ভাঙ্গা হোক এবং যথারীতি সীজ করা হোক।' আমার বাংলোর সামনের মাঠের সমস্ত মানুষ আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরছে। যখন তালা ভাঙ্গার হুকুম দেওয়া হল তখন ভীড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, 'চাবি এনেছি, তালা খুলে দিচ্ছি।' -'আপনার নাম কি? কার্তিক চন্দ্র দাস? আপনি কলকাতা থেকে এখনই এলেন নাকি?' -'না স্যার, আমি কলকাতা যাইনি।' -'এ চাল এখানে কেন?' -'এগুলো আমার ফ্যাকটরিতে কর্মরত বিড়ি শ্রমিকদের দেবার জন্য রাখা আছে।' -'আপনার শ্রমিক সংখ্যা কত?' -'তিরিশ-চল্লিশ জন।' -'তারা কোথায়?' -'ওখানে কাজ করছে।' গেলাম সেখানে। দেখা গেল ৬/৭ জন লোক বিড়ি বাঁধার কাজ করছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কতজন এখানে কাজ কর?' বললো, 'হুজুর আমরা ছয় জন নিয়মিত আর একজন অনিয়মিত।' -'তোমাদের কি মালিক কোন রেশন দেয়?' -'না হুজুর, আমাদের কোন রেশন দেওয়া হয় না। কার্তিক বাবু ব্লাকে চাল-আটা-গম-চিনি কন্ট্রোল অফিস থেকে এনে বিক্রি করেন। আপনি আসার পাঁচ মিনিট আগে উনি দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন। উনিতো আপনি আসার পর থেকেই আপনার সঙ্গেই রয়েছেন।' ঘুরে বললাম, 'কি কার্তিক বাবু, আপনার কিছু বলার আছে?' -'না হুজুর, ওরা মিথ্যে কথা বলছে- আমি ওদের রেশন দেবার জন্যই এ চাল এনেছি।' -'চালের পারমিট আছে?' কোন জবাব নেই। খাদ্য অফিসার বললেন, 'কোন পারমিট-লাইসেন্স তাঁর নেই।' -'আপনার শ্রমিক সংখ্যা ৭ জন' - 'আপনি ত্রিশ জন কেন বললেন?' -'না স্যার, ত্রিশ জন হতেও তো পারে।' আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেছে এরই মধ্যে। বললাম, 'চালগুলো বিনামূল্যে তিন সের হিসেবে এই সব অভুক্ত মানুষকে দিয়ে দিন, আর এই লোকটিকে এখান থেকে যেতে দিবেন না।' এই বলে একটু দূরে এক মাড়ওয়ারীর দোকানে গেলাম এবং সেখানেও একই রকম সওয়াল-জবাব চলল। চাল, গম-এর বস্তা সীজ করা হল। সীজার লিস্ট বানান হচ্ছে- এমন সময় একটা লোক ভীড় ঠেলে ছুটে এসে বলল, 'হুজুর কার্তিককে ধরে কিছু লোক চড়-থাপড় দিচ্ছে।' তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম ওখানে। দেখলাম ৫/৭ শত লোক ভীড় করে তাকে ঘিরে ফেলেছে আনসার এডজুটেন্টকে বললাম পাশের চায়ের দোকান থেকে একটা টুল নিয়ে আসতে। টুলে উঠে বক্তৃতা শুরু করে দিলাম। ভীড়ের মুখ তখন আমার দিকে ঘুরে গেল। দেখলাম কার্তিকের মাথার কিছু অংশ চেঁছে দেওয়া হয়েছে। দেখে মনে হল ভীড়েরই একজন লোক ক্ষুর দিয়ে মাথা চেঁছেছে এবং এক সহকারী এডজুটেন্ট কার্তিকের হাত ধরে রয়েছে। জোর গলায় বললাম, 'কার্তিককে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। ওকে থানায় নিয়ে যান। আর অন্যেরা চাল নিয়ে যে যার ঘরে চলে যান। আদেশ অমান্য করলে পরিণতি খারাপ হতে পারে।' ভীড় ধীরে ধীরে কমে গেল। চাল বিতরণ শেষ হল। সব ঠান্ডা।

www.pathagar.com

বাসায় ফিরে গোসল করে খেতে বসেছি। বেলা পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটা হবে। পিয়ন এসে বলল, 'শৈলেন মোক্তার বাবু একটা পিটিশন নিয়ে এসেছেন।' হঠাৎ একটা মারাত্মক ভুল করে বসলাম। বললাম, 'নিয়ে এস।' কার্তিকের জামিনের দরখাস্ত। ভুল সিদ্ধান্ত নিলাম। এই ঘটনায় আমার ব্যক্তিগত কোন প্রতিহিংসা নেই। সুতরাং আইন মোতাবেক যা হবার তাই হবে। ডানহাতে খাচ্ছিলাম বলে বামহাতে জামিন মঞ্জুর করে দিলাম- ৩০০ টাকা জামানত এবং একজন শিওরিটিতে। এই ভুলের জন্য আমাকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে পরে। তাকে জেল থেকে বের করে তার শুভানুধ্যায়ীরা তার মাথার ছবি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাল। কলকাতার কাগজে এসডিও ও কার্তিকের ছবিসহ খবর ছাপাল নাটোরের এসডিওর মধ্যযুগীয় বর্বর অত্যাচারের কাহিনী। ঢাকার কাগজে এসডিও নাটোরের কাজীর বিচার, সংখ্যালঘুদের উপর এসডিওর বর্বরোচিত আচরণ- ইত্যাদি হেডলাইন ছাপা হল কার্তিকের অর্ধেক কামানো মাথার ছবিসহ। নিজেও ঢাকার কাগজের খবর এবং দু'একটা কাগজের সম্পাদকীয় পড়ে একটু বিব্রতই হলাম- ঘটনার উদ্ভট বিকৃতি দেখে। দৈনিক ইত্তেফাক তো সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে গল্পও যেমন বানিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এসডিওর এই তোগলকী আচরণের জন্য চরম শাস্তিদানের সুপারিশও করেছে। ক্রমাগত এক সপ্তাহ যাবত এই বিষয়ের ওপর নানা মন্তব্য নানা গল্প-কাহিনী এবং নানা শাস্তির কথা বলা হল। একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ঢাকার উর্দু পত্রিকা-পাশবান। এ পত্রিকা লিখলো, নিজস্ব প্রতিনিধির দ্বারা অনুসন্ধান করে তারা জেনেছে যে, ঘটনাটির সাথে এসডিও'র ব্যক্তিগত সংযোগ কমই ছিল। শ্রমিকদের রেশন হল কার্তিকের বানোয়াট কাহিনী- তারই সামনে তার শ্রমিকরা অস্বীকার করেছে। আর কার্তিকের মাথা হাজামত যখন হয় এসডিও ঘটনা স্থল থেকে অন্তত ২৫০ গজ দূরে অন্য একটি গুদামে সীজার লিস্ট তৈরীর কাজ তদারকি করছিলেন। দেশের এই অভাবের দিনে এসডিও'র কাজটি আদৌ যুক্তিযুক্ত হয়নি। কার্তিকের মাথার চুল নয় মাথাটি কাটাই উচিৎ ছিল এবং এ কাজে এসডিও ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় তার শাস্তি হওয়া উচিৎ। আমার অভিজ্ঞতায় যোগ হল সাংবাদিকতার দুটি চেহারা। আল্লাহ্ জানেন খবরের কাগজ ছাড়া কত পিটিশন কত তারবার্তা আর কোথায় কোথায় পৌঁছেছে। নিজে সন্ধ্যায় ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট পাঠালাম। তাতে জানিয়ে দিলাম যে, কার্তিকের মাথা আমার নির্দেশেই কামান হয়েছে- মুজতদারদের সাবধান করার জন্য। নিজের ঘাড়ে মাথা কামানোর দায়িত্ব না নিলে বেচারা সহকারী এডজুটেন্ট চাকরি হারাবে। আসলে উৎসাহের আতিশয্যেই সে একাজটি করেছে। আমার অধীনস্ত হিসাবে তাঁকে নিরাপদ রাখা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

www.pathagar.com

শহরে একটা চাপা গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করছে। আমার সহকর্মীরা এবং মহকুমা পর্যায়ের অন্যান্য দপ্তরের অফিসাররা মনে হয় ভাবছিলেন যে, এবার এসডিও কুপোকাত হবেন। মুন্সেফ পরামর্শ দিয়েছিলেন নিছক বাস্তব ঘটনাই যেন সরকারকে জানাই। নিজের ঘাড়ে অহেতুক ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। আমার প্রতি তাঁর সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং বললাম যে, 'গেলে বড়টাই যাবে। গরীব সহকারীরা মরবে কেন? আমার উৎসাহেই তো তারা কাজ করেছে।' তিনি বললেন, 'আপনি জানেন না, আপনার পূর্বসূরির বিদায়ের একদিন আগে নাটোরের লোক একটা গাধার পিঠে সাদা চাদর পরিয়ে তাতে লাল কালি দিয়ে বড় বড় হরফে লিখেছে এসডিওর নাম। সারা শহর ঘুরিয়ে গাধাটাকে এসডিওর বাংলোর দরজার সামনে বেঁধে রেখে গেছে। এখানের মানুষ কুৎসিত প্রকৃতির।' মুন্সেফ সাহেব প্রায় তিন বছর এই মহকুমায় আছেন। বললাম, 'এবার মিছিলে আমি যোগ দিয়ে গাধাটির পিঠে চড়ে বসব। কেমন হবে তখন?'

মুন্সেফ সাহেবের এই গাধার গল্পের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। গত ঈদের জামাতে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান আর আমার পূর্বসূরি এসডিও সাহেবের মধ্যে ঘটে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। সামিয়ানার নিচে প্রথমসারিতে সরকারী অফিসাররা বসবেন না মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত কমিশনাররা বসবেন– এই নিয়ে নাকি বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে দড়ি কেটে দিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সামিয়ানা চাপা দেওয়া হয়। এসডিও সাহেব মনে করেন চেয়ারম্যান সাহেবের ইঙ্গিতেই এই অপমানজনক কাজটি করা হয়েছে। ঘটনার পর একটা ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছিল চেয়ারম্যান ও তাঁর সাঙ্গ–পাঙ্গদের বিরুদ্ধে। এই মামলাই মনে হয় এসডিও সাহেবের বদলির আশু কারণ ছিল। যা হোক মামলাটির ফয়সালা আমার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথম কাজগুলোর একটা ছিল। শুনানির দিন সব আসামীই হাজিরা দিলেন কোর্টে। প্রধান আসামী অর্থাৎ চেয়ারম্যান সাহেবকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'নামাজের জামাতে "আয়াজ আর মাহমুদ" তো এক কাতারে একই ইমামের পেছনে দাঁড়াবার কথা, আপনাদের হয়েছিলটা কি ঠিক করে বলুন তো?' জবাবে তিনি বললেন, 'স্যার, সব মানুষ তো সমান নয়। এসডিও সাহেব আমাদেরকে হেয় করার জন্য সব সময় লেগেই ছিলেন।' বললাম, 'বেশতো তাঁকে তো গাধা বানিয়ে আপনারাও কম যাননি। এখন কি চান–কেস চলবে না থামিয়ে দেব?' –'স্যার এটা তো আপনার মর্জি–আমরা তো এখানে আসামী।' কথাটা ঠিক। অর্ডার সীটে লিখলাম, আসামীরা সবাই হাজির। মামলাটি সরকার বা কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন রকম ক্ষতির কারণে

www.pathagar.com

রুদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং এটা কোন কোন ব্যক্তির সাময়িক অহমিকা জাহিরের কারণেই এমনটা ঘটেছে। আসামীরা অনুতপ্ত। যদি সরকার বাহাদুর এই মামলা চালিয়ে যান, তাতে এমন কোন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে হয় না। মাঝখান থেকে প্রশাসনের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ বাড়বে। সুতরাং মামলাটি এখানে খারিজ করে দেওয়া হল এবং আসামীরা তাঁদের সাময়িক ভুলের জন্য সরকারের কাছে লিখিত মার্জনা চেয়ে একটা আর্জি পেশ করবেন।

সামনে ঈদ-উল-আজহা। মানুষের মুখে মুখে চাপা সুরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে-এ বছর গরু কোরবানী দেওয়া হবে। অন্যদিকে হিন্দু উকিল-মোক্তারদের একটু চিন্তাগ্রস্তই মনে হচ্ছিল। জটাধারী এক সাংবাদিক যিনি ঢাকার ইত্তেফাক ও কলকাতার আনন্দবাজারের রিপোর্টার, ঘনঘন কোর্ট-বিল্ডিং এর আশে-পাশে ঘুর ঘুর করছেন। সম্ভবত আন্দাজ করতে চেষ্টা করছেন কোরবানীর বিষয়টি। হঠাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে একটা গোপনীয় চিঠি পেলাম। এতে বলা হয়েছে যে, ঈদের নামাজের সময় যাতে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে এবং বিশেষ করে কোরবানীর ব্যাপারে যাতে শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। ভাবলাম এখানে এর আগে কোরবানী নিয়ে কোন বিবাদ-বিসংবাদ হয়েছে বলে তো শুনিনি। তাহলে এই অগ্রিম দুঃচিন্তা কেন? যাহোক, আমার নিজের অফিসারদের নিয়ে একটা মিটিং করলাম। নানাভাবে জানবার চেষ্টা করলাম যে, শান্তি ভঙ্গের কোন আশংকা আছে কিনা? কিন্তু কেউই সে রকম কোন কথা বললেন না। ব্যাপারটা নিজের মাথায় রেখে দিয়ে চুপচাপ থাকলাম। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শহরে গরু কোরবানী হয় কিনা এবং হলে কি রকম হয়, খুব ধুমধাম করে হয় নাকি?' জবাবে তিনি বললেন, 'এটাতো রাণী ভবানীর শহর, এখানে গরু কোরবানী হয় না। যারা পারে ছাগল, ভেড়া কোরবানী করে। গ্রামের দিকেও তেমন একটা শোনা যায় না কোরবানীর কথা।' সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি মতলব?' তিনি একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন সত্য, কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ, আমি কোরবানী দেব। ঈদের দিন সন্ধ্যায় আমার বাড়ী আপনাকে আসতে হবে।' ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে দাওয়াতের জন্য।

ঈদের আর মাত্র তিন দিন বাকী। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান, উকিল, মোক্তার, একজন ডাক্তার এবং সেই জটাধারী সাংবাদিক (চেয়ারম্যান ছাড়া সকলেই হিন্দু) আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম-'কি ব্যাপার?' তাঁরা বললেন- 'স্যার, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনার কাছে এসেছি-আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।' -'বলুন।' -'স্যার শহরের দক্ষিণ দিকে নোয়াখালী থেকে আসা কতগুলো মানুষ বসতি স্থাপন করেছে। এরা চাষ করে খায়। প্রকাশ্যে এরা গরু জবাই

www.pathagar.com

করে কোরবানী দেবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা ভয় করছি তারা রায়ট বাধাবার ষড়যন্ত্র করছে। স্যার, আমরা যুগ যুগ ধরে এখানে বাস করে আসছি–এরকম অনাসৃষ্টি কোনদিন হয়নি। তাছাড়া এটা রাজা–মহারাজাদের শহর, মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে এই জাতীয় কাজ হলে আমরা সংখ্যালঘুরা বাস করব কিভাবে? আপনি মহকুমার অধিকর্তা, আপনার কাছে আমরা আকুল আবেদন করছি যাতে গরু কোরবানী বন্ধ করা হয়।' একটা পিটিশনও তাঁরা এনেছিলেন। সেটি আমার হাতে তুলে দিলেন। পড়ে দেখলাম মুখে যা যা বলেছেন মোটামুটি তাই লেখা আছে। আর্জির কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার এবং প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের বরাবরে পাঠান হয়েছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'কয়েকদিন আগে আপনারা ডিএম এবং কমিশনার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন নাকি?' সকলেই চুপ। একটু পর উকিল বাবু বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, আমরা গত সপ্তাহে রাজশাহী গিয়েছিলাম। তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।' এতক্ষণে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল। চেয়ারম্যান সাহেব একেবারে চুপ। আস্তে–ধীরে বললাম যে, 'কোরবানী করা মুসলমান বিত্তবানদের ধর্মীয় অবশ্য কর্তব্য। ছাগল–ভেড়া মাত্র একজন লোক কোরবানী করতে পারে। গরু–মহিষ হলে অন্তত সাত জন ভাগাভাগি করে তাদের এই অবশ্য করণীয় কাজটি সমাধা করতে পারে। তাদের এই ধর্মীয় অবশ্য করণীয় কাজ করতে সরকার বাধা দেবে কেমন করে? তাছাড়া, তারাতো যে যার বাড়ীর সামনে বা কোন খোলা জায়গায় কোরবানী দেবে। আপনাদের তাতে আতঙ্কিত হবার তো কিছু দেখি না।' হঠাৎ জটাধারী সাংবাদিক বলে উঠলেন, 'স্যার, গরু হিন্দুদের পূজণীয়, তাদের দেবতাস্বরূপ। সুতরাং গরু হত্যা করলে আমাদের মনে প্রচন্ড আঘাত লাগবে। সেজন্য এটাকে এড়িয়ে গেলে তো সব ঝামেলা চুকে যায়।' বললাম, 'দেখুন হিন্দুরা তাদের আদিযুগে অর্থাৎ আর্যদের যুগে, মুণি–ঋষিদের যুগে 'গোমেধ–যজ্ঞ' করতেন, সোমরস আর গো–শাবকদের মাংস ভক্ষণ করতেন। আমি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে সে কথাইতো বইপত্রে পড়ে এসেছি। আর নিকট অতীতের কথা ধরতে গেলে বলতে হয় গত সাত শত বছর ধরে মুসলমানরা গরু জবাই করে তার গোশ্ত খেয়ে এসেছে আর হিন্দুরা সেই গোমাতার পূজা করে এসেছে। এই দ্বন্দ্ব বেচারা নাটোরের এসডিও কিভাবে সমাধান করবে? একদিকে সংযম অন্যদিকে সহনশীলতা সমস্যাটির একমাত্র সমাধান। আমার তো আর কিছু জানা নেই সমস্যাটির সমাধান সম্বন্ধে।' তাঁরা বললেন, 'স্যার, এতদিন মুসলিমরা গরু কোরবানী না দিয়ে পারল আর আজ গরু কোরবানীর জন্য জিদ করছে কেন!'

–'দেখুন জিদের ব্যাপর নয়। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় অনুশাসন বাদ দেবেন কিনা চিন্তা করে দেখুন। এতদিন তারা ছিল মৃত্যুদন্ডের ভয়ে ভীত। তারপর গরু খেলে

www.pathagar.com

রোগ হয়- ভীতিও ছিল। এক কথায় তারা একটা অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এখন তারা বুঝতে পারছে যে, ধর্মীয় বিধান পালন করার জন্য সৃষ্টিকর্তা সহজ পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে কাজে বাধাদান কিভাবে সম্ভব? অনেকক্ষণ কথাবার্তা হবার পর তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, রায়ট তারা করবে কেন? তারা তো গরু কোরবানী করে নিয়ম মত অন্যদের দেবে আর নিজেরা খাবে। কেউ যদি সে কাজে বাধা দেয় তখনই রায়টের প্রশ্ন আসে। সুতরাং রায়ট হলে মনে করব তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। এবং সে বাধা নিশ্চয় কোন মুসলমান দেয়নি। তবে আপনাদের বাড়ীর সংলগ্ন জায়গায় বা সাধারণ মানুষ চলাচলের রাস্তার উপর যাতে কোরবানী না দেওয়া হয় সেটা আমরা নিশ্চিত করব।' যহোক, তাঁরা চলে গেলেন। সিআই পুলিশ ও আনসার এ্যাডজুটেন্টকে ডাকলাম। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম শহরে এই প্রথমবারের মত গরু কোরবানী হবে।

ঈদের দিনের আগের সন্ধ্যায় মুন্সেফ সাহেব ও আমার সেকেন্ড অফিসারকে বলে দিলাম, 'শহরের প্রধান জামাতে আমি উপস্থিত থাকবো না। সাত-আট মাইল দূরে এক গ্রামের ঈদগাহে নামাজ আদায় করব।' পরদিন ভোরে চলে গেলাম একটা পিয়নকে সঙ্গে করে ওই গ্রামের ঈদগাহে। এই ঈদগাহটি হল একটা খালের ওপাড়ে। যখন আমি খালের এপাড়ে হাজির হলাম। ওপাড়ের জামাত থেকে মানুষগুলো চিৎকার করছে, 'এসডিও সাহেব কি জয়।' খাল পেরিয়ে বকাবকি করলাম এদেরকে। ইমাম সাহেবকে বললাম, তিনি তো এদেরকে একটু নসিহত করলে পারতেন। ঈদের জামাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ছাড়া কারো কোন প্রশংসা একজন মুসলমান কিভাবে করে? তাছাড়া বিগত চল্লিশের দশকের সেই 'জিন্দাবাদ' আর 'জয়'-এর দ্বন্দ্বের পর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ন'বছর পরেও ঈদের জামাতে 'জয়' শোনার জন্য মনটা সত্যিই তৈরী ছিল না। ঈদের জামাত, তাই নিজেকে সংযত করতেই হল। সবাইকে নিয়ে সরবে আউড়াতে লাগলাম 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ'-মুহূর্তে পরিবেশটি আবেগময় হয়ে উঠল।

যথারীতি ঈদের নামাজ পর্ব শেষে শহরে ফিরলাম। সব ঠিকঠাকই আছে। শহরে হ্যাঁ, রাণী ভবানীর শহরে সম্ভবত প্রথমবারের মত তিনটি গরু কোরবানী হল মৃত্যুদন্ডের ভয় ছাড়াই। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কাছে হিন্দু প্রতিনিধিরা একথাও বলেছিলেন যে, গরুর মাংস খেয়ে হাড়গুলি যেখানে-সেখানে ফেলে দিলে কাকরা মুখে করে হিন্দুদের বাড়ীতে ফেলতে পারে। এতে হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যেতে পারে-তারা মনে আঘাত পেতে পারে। তখন তাদের বলেছিলাম যে, 'বেচারা এসডিও'র কোন ক্ষমতা কাক-চিলের ওপর নেই- তারা ১৪৪ ধারার

www.pathagar.com

তোয়াক্কা করে না।' এ কথাও অবশ্য বলে দিলাম যে, 'এত বছর তো মুসলমানরা গরু জবাই করেনি-কিন্তু ভাগাড় থেকে মরা গরুর হাড্ডি কুকুররা হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে সবার বাড়ীর আনাচে-কানাচে এনে খায় এবং ফেলে যায়-এতে তো কারো মনে আঘাত পাবার কথা এ পর্যন্ত শুনিনি।' সন্ধ্যায় চেয়ারম্যান সাহেবের বাসায় দাওয়াত খেতে গেলাম। চেয়ারম্যান সাহেব বিজয়ের সুরে বললেন তেবাড়িয়ার হাট থেকে নিজে গিয়ে গরু কিনে এনেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'জবাই দিলেন কোথায়?' বেচারা একটু সুর নিচু করে জবাব দিলেন, 'কি করবো স্যার-বাড়ীর উঠানে জবাই দিয়েছি।' বললাম, 'সর্বনাশ, এখানে আপনার একটা গরু শোয়ানর মত জায়গা কোথায়?' বললেন, 'কি করবো স্যার? সবদিক দেখেই তো চলতে হয়।' বললাম, 'আপনি, খুব ভাল কাজ করেছেন। অন্যান্যের জন্য দৃষ্টান্ত হবে এটা। নিজের বাড়ীর লোকদের কষ্ট হলেও অন্যের মনে যাতে আঘাত না লাগে সে কাজই আপনি করেছেন।' নানা আলাপ-আলোচনার মধ্যে হঠাৎ চেয়ারম্যান সাহেব আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আমার স্ত্রী বলেছেন বাড়ীর ভেতর গরু জবাই দেয়া হল কোন অমঙ্গল হবে না তো?' কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রশ্নটা আপনার স্ত্রীর না আপনার?' -'না স্যার, আমি তো এসব পাত্তাই দেই না।' বললাম, 'আপনার স্ত্রীকে বলবেন, এসডিও সাহেব বলেছেন এ বাড়ীতে যে সব ভূত-প্রেত এতদিন ছিল, আজকের এই গরু কোরবানীর পর সব এই মহকুমা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, আর কোন দিন তারা আসবে না।'

গরু কোরবানীর কারণে কোথাও আইন-শৃংখলার কোন রকম ব্যাঘাত ঘটেনি। আর একটি থানায়ও একটি গরু কোরবানী হয়েছিল বলে খবর পেয়েছিলাম। চিঠি পেলাম আগামী অমুক তারিখে রাজশাহী থেকে ডিএম সাহেব নাটোর ডাক বাংলোয় এসে কার্তিক দাসের টিকি কাটার অভিযোগের তদন্ত করবেন। এসডিওকে তদন্তে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত দিন সকাল দশটায় দেখি কার্তিকসহ প্রায় জনা পনের উকিল-মোক্তার আর পান্ডা কিসিমের লোক বসা আছে ডাকবাংলোর বারান্দায়। সবাই হিন্দু। ডিএম সাহেব ভেতরে আছেন। আমি সরাসরি গিয়ে কামরায় ঢুকলাম। ডিএম সাহেব কুশলাদি জিজ্ঞেস করে কার্তিকের দরখাস্তটা হাতে নিয়ে বললেন, 'তুমি এটা দেখেছ?' জবাবে বললাম, 'সেতো আমাকে কোন কপি দেয়নি।' তিনি বললেন, 'দেখবে?' বললাম, 'না স্যার। কোন প্রশ্ন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।' চাপরাসীকে ডেকে তিনি বললেন, 'ওদের ডাক।' সকলে এসে বসল। ডিএম সাহেব তাঁদের বক্তব্য শুনতে চাইলেন। একজন উকিল শুরু করলেন এবং পরিচিত সেই মোক্তার ও এক সাংবাদিক যোগান দিলেন। 'এসডিও অত্যাচারী, এসডিও পাগল, এসডিও গোঁড়া সাম্প্রদায়িক এবং এসডিও স্বেচ্ছাচারী। মহকুমার সকল হিন্দু আজ

www.pathagar.com

আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা নিরাপদ নয়।' ডিএম সাহেবকে বললাম যে, 'তিনি আমাকে এখানে বসে থাকতে বলছেন কেন?' তিনি বললেন, 'আগে এঁদের কথা শুনে নেই পরে তোমার কথা শুনব। তুমি বস।' তখন আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। রাগত স্বরে বললাম, 'এখনো আমি মহকুমা অফিসার। আপনি আমার কুৎসা আমার সামনে এদেরকে বয়ান করতে দিলে আর কি আমি এখানে শাসনকাজ চালাতে পারব? আপনি রাজশাহীতে আপনার চেম্বারে দাওয়াত করে এদের প্রলাপ যত ইচ্ছা শুনুন। আমি সেখানে যাব না।

তবে আমার কথা শুনতে হলে একা একা শুনতে হবে। এ প্রস্তাবে যদি আপনি রাজি না হন তাহলে মহকুমা হাকিম হিসেবে আপনাকে আমার মহকুমা ছেড়ে চলে যাবার অনুরোধ করছি। আমার উপস্থিতিতে এই সব অবাঞ্ছিত উক্তি আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই। আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন কিন্তু সেটা আমাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার পরই করতে পারবেন, আগে নয়।' এই বলে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি পেছন থেকে আমার নাম ধরে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলেন। আমি না দাঁড়িয়ে সোজা আমার বাংলোয় চলে এলাম। ডিএম সাহেব জিপে কিছুক্ষণ পরেই এসে হাজির হলেন। বললেন, 'নাজির, আমার ভুল হয়ে গেছে। তুমি ঠিকই বলেছ। সিটিং এসডিওকে এভাবে অপদস্থ করা আমার উচিত হয়নি।' আমি চুপ থাকলাম। দুজনে চা খেলাম। তিনি কেবল জিজ্ঞেস করলেন, সে ঘটনা সম্বন্ধে আমি তাঁকে কিছু বলব কিনা। বললাম, 'আমার বক্তব্য আমার রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত কিছুই বলার নেই।' তিনি বললেন, 'আইবি রিপোর্টে ঘটনার বিবরণ একটু ভিন্ন পাওয়া যাচ্ছে। তুমি ঘটনাস্থলে ছিলে না।' তাঁকে দৃঢ়তার সাথে জানালাম যে, 'আমি আমার পূর্ণ দায়িত্বে সচেতনভাবেই আমার রিপোর্ট দিয়েছি। তার সঙ্গে যোগ করার আর কিছুই নেই। পুরো ঘটনার জন্য এককভাবে আমিই দায়ী, অন্য কেউই নয়।' জানি না তিনি সরকারের কাছে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এ ঘটনা সম্বন্ধে আর সরকার বা উর্ধ্বতন কারো কাছ থেকে কিছুই শুনিনি। তবে বুঝতে পারছিলাম নাটোর থেকে বিদায় নেবার দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

এর মধ্যে জলাবদ্ধ বিলগুলো প্রতি জুমার পর স্থানীয় মুসল্লিদের নিয়ে কাটিয়ে কাছাকাছি নদী বা খালের সাথে যোগ করিয়ে দিয়ে ধান চাষের উপযোগী করার কাজ করতে লাগলাম। আর বিলের মাছ যারা পানি নিষ্কাশনের কাজ নিজ হাতে করল তাদের বিলিয়ে দিতাম। কারো কাছে সরকারের ইজারা ছিল কিনা জানি না। কেউ অভিযোগও করল না।

নাটোর শহরের নিচা বাজার এলাকা থেকে রাজবাড়ীর প্রধান সড়ক বরাবর রাস্তার দুপাশে বসবাস করে গণিকারা। এরা জমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন করত। অথচ

www.pathagar.com

এই রাস্তা দিয়েই ছেলে-মেয়েরা সকাল-বিকাল স্কুলে যাতায়াত করে থাকে। জমিদাররা চলে গেলেও স্থানীয় উকিল-মোক্তার-ব্যবসায়ী এবং উঠতি রাজনৈতিক নেতা, পাতি-নেতারা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। একদিন আমার চোখে পড়ল রাস্তা দিয়ে যাবার সময় স্কুলের কয়েকটি ছাত্রকে এক গণিকা ডাকছে তার ঘরে প্রবেশ করার জন্য। ভাবলাম, নাটোর ছাড়ার আগে এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করা দরকার। একদিন রাত সাড়ে দশটার দিকে আমি খেতে বসেছি। দেখলাম, আপাদমস্তক কালো বোরখায় ঢাকা কেউ একজন দরজায় পর্দার আড়ালে নড়াচড়া করছে এবং এমন মিহিসুরে কিছু বলছে যে ভয়ই পেয়ে যেতে হয়। লতিফ আর্দালীকে চিৎকার করে ডাকলাম। বললাম, 'দেখতো ওটা কি?' ও বলল, 'হুজুর উনি হাবিবুল্লা সাহেবের স্ত্রী।' বললাম, 'এতরাতে এখানে কি?' তখন মহিলা বোরখার ভেতর থেকে একটু স্পষ্ট আওয়াজে কান্নার সুরে বললেন, 'আমি আওয়ামী লীগের নেতা হাবিবুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী। উনি খুব বদ লোক, সারাদিন মদ খেয়ে বেশ্যা বাড়ী পড়ে থাকে। আমি চারটে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে উপোস করে মরছি। বাচ্চারা অসুখে পড়ে রয়েছে মাসের পর মাস। কিন্তু কিছু বললেই উনি আমাকে মারধর করেন।' -'কি করেন উনি?' -'পাটের দালালী করেন। হুজুর মা-বাপ, আমার বাচ্চাদের একটা হিল্লে করে দিন।' বললাম, 'হাবিবুল্লাকে আমি কিছু বললে আপনাকে তো শেষ করে দেবে সেটা ভেবেছেন?' কোন জবাব নেই। কান্নার আওয়াজে বিরক্ত হয়ে লতিফকে বললাম, 'উনাকে এখান থেকে যেতে বল।' লতিফ তাঁকে বলল, 'এসডিও সাহেব খুব রাগী লোক। আপনার কথা শুনেছেন। এখন এখান থেকে সরে পড়ুন।' হাবিবুল্লাহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রধানদের একজন এবং ঢাকায় তাঁর দলীয় কর্তাব্যক্তিদের প্রিয়পাত্র। স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের পেছনে লাগার জন্য তাঁর বেশ নাম আছে। কয়েকজনকে বদলি-টদলিও করেছেন। তাই সব অফিসই তাঁকে একটু ভয় করে চলে। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কোঠায়।

স্থানীয় প্রধান সহকর্মীদের সঙ্গে পরদিন এই গণিকা সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। পরে কয়েকজন উকিল-মোক্তারের সঙ্গেও মত বিনিময় করলাম। তাঁরা জানালেন যে, বিশেষ কিছুই করার নেই। এমন কোন আইন নেই যে, তাদের পেশা বন্ধ করা যাবে। তাছাড়া আমার একজন পূর্বসূরি নাকি তাদের উৎখাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, আইন তাঁকে বাধা দিয়েছিল। সেই থেকে গণিকারা লা-পরওয়াভাবেই প্রকাশ্যে ব্যবসা চালাচ্ছিল। সমস্যায় পড়লাম। এ পর্যন্ত তো কোন কাজে বিফল হইনি। এদের কাছে হার মানতে হবে শেষ পর্যন্ত? রাজশাহী গেলাম ডিএম-এসপিদের সাথে পরামর্শ করতে। সন্ধ্যায় পৌঁছলাম। বোয়ালিয়া ক্লাবে সবাইকে একসঙ্গে পেয়ে গেলাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সাদরে পাশে বসালেন। বললেন, 'ব্রিজ

www.pathagar.com

খেলবে?' আমি বিপদে পড়লাম। আমি তো তাস চিনি না। কমিশনার সাহেব বললেন, 'তোমাকে সিভিল সার্ভিসে ঢুকতে দিল কিভাবে, তুমি তাস চেন না।' বললাম, 'স্যার, যাঁরা বাছাই করছিলেন তাঁদের মধ্যেও নিশ্চয় আমার মত দু-একজন ছিলেন।' সবাই হাসাহাসি করে আমার আহাম্মকীকে করুণা করলেন। যেজন্য গিয়েছিলাম সে কথা ওখানেই শুরু করে দিলাম। ডিএম সাহেব বললেন, 'এ বিষয়ে তিনি আমাকে পূর্ণ সমর্থন দেবেন।' এসপি এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে বললেন যে, 'মহকুমার পুলিশ আপনার অধীনে দিয়ে দিলাম। তারা আপনার আদেশ পূর্ণভাবে পালন করবে। গাফিলতি করলে খবরের কাগজের পাশের মার্জিনে যেটুকু ফাঁকা জায়গা থাকে সেখানে এক লাইন লিখে দেবেন, আমি তৎক্ষণাত ব্যবস্থা নেব।' জেলা জজ সমস্যার বিষয়ে বললেন যে আইন আমাকে সাহায্য কমই করবে। তবে তাঁর কাছে অন্যপক্ষ সহানুভূতি পাবে না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে আমি আমার একজিকিউটিভ ক্ষমতা প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে পারি। তাহলে অন্য পক্ষ জজের কাছে আশ্রয় পাবে না, ডিএম সাহেবের কাছে আবেদন করতে পারবে। যাই হোক তিনি সস্নেহে বললেন, এটি একটি সামাজিক কঠিন সমস্যা, আমি তাঁর আন্তরিক এবং সার্বিক সমর্থন পাব। কমিশনার সাহেব মোটামুটি সমর্থনসূচক কথাবার্তা বললেন। সন্ধ্যার লবিংটা আমার মোটামুটি ভালই হল বলতে হবে। রাতে সার্কিট হাউজের বিছানায় শুয়ে ভাবলাম সমস্যাটা তো আর সমস্যা থাকছে না। নাটোরে ফিরেই কাজ শুরু করা যাবে। মনে হচ্ছিল তাড়াতাড়ি সকাল হলেই ভাল হয়। যাহোক সকাল হল। না চাইতেই ডিএম সাহেব দয়া করে তাঁর তিন নম্বর জিপটা দিলেন ফেরার জন্য। বড় ভাল লাগল তাঁর এই মহানুভবতার জন্য। না, না, জিপের জন্য নয়। এর আগে নাটোরে তাঁর কাজ ভন্ডুল করার পর গত সন্ধ্যায় তাঁর আশ্বাস যে ফাঁকা বুলি নয়, স্বেচ্ছায় জিপ দিয়ে আমার নাটোরে ফেরার ব্যবস্থা করাটা সে কথাই প্রমাণ করল।

নাটোরে ফিরে একটা একজিকিউটিভ অর্ডার জারি করলাম। আগামী সাত দিনের মধ্যে প্রত্যেক গণিকাকে নাটোর মিউনিসিপ্যাল এলাকার দক্ষিণ প্রান্তের আধমাইল দূরে সরে যেতে হবে। অন্যথায় তাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে দেওয়া হবে। আদেশটি প্রত্যেকটি গণিকার ওপর জারি করা ছাড়াও শহরে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হল। আদেশ জারি করার আধ ঘন্টার মধ্যে অন্তত ছয় জন উকিল এক এক করে এবং জন দশেক মোক্তার আদেশটি বাতিল বা অন্তত মুলতবি করার আবেদন নিয়ে আসেন। এছাড়া রাজনৈতিক নেতারাও এক এক করে আসলেন। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান সাহেব প্রচ্ছন্নভাবে ধমকিয়ে গেলেন যে আগের একজন এসডিও সাহেবও চেষ্টা করে পারেননি। জজ কোর্টে আপীলে হেরে গিয়েছিলেন। আরো অনেক কিছু। স্বয়ং হাবিবুল্লাহ সাহেব মানবিক কারণে আমার আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে বললেন। কারণ এতগুলো প্রাণী

www.pathagar.com

যাবে কোথায়, খাবে কি? তাছাড়া এরা শহরে না থাকলে ঘরে ঘরে গণিকাবৃত্তি শুরু হয়ে যেতে পারে এবং আরো কত রকম দার্শনিক ব্যাখ্যা করে গেলেন তিনি। চুপচাপ শুনে গেলাম আমি। হ্যাঁ, না, কিছুই বলিনি। প্রত্যেককেই তার কথা বলে যাবার সুযোগই কেবল দেইনি বরং তাদের যুক্তির সমর্থনে মুচকি হেসে ও মাথা নেড়ে সমজদারের ভূমিকাও পালন করেছি। এভাবে তাদের যুক্তির ওজন বাড়িয়ে দিয়েছি।

সন্ধ্যায় সিআই পুলিশ ও আনসার এডজুটেন্টকে দশ-বার জন সহযোগীসহ আসতে বললাম আমার বাংলোয়। তাদের নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে রওয়ানা দিলাম বাজারের দিকে। তারাও কেউ জিজ্ঞেস করেনি কোথায় যেতে হবে এবং কেন যেতে হবে। আমিও তাদের কিছু বলিনি। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বললাম, কয়েক জনে মিলে এলাকাটা ঘেরাও করে প্রত্যেক দরজায় একের পর এক ধাক্কা দিতে। নাটোর মোক্তার বার আর উকিল বারের দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সব মক্কেলই এই জালে আটকা পড়ল। আমি নিজে এক কামরায় টোকা দিলাম। ভেতর থেকে অশ্লীল জবাব আসল। ইতিমধ্যে আমার আর্দালী দরজায় লাথি মারল। দরজা খুলে গেল, এ যে উচ্চকণ্ঠ মোক্তার বাবু! দেখেই মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন। পাশের দুটো কামরার পরে আরেকটির দরজা খোলার সাথে সাথে নজর পড়ল হাবিবুল্লাহ সাহেব এক খাটের তলায়।

সকলকে রাস্তায় নামিয়ে এক লাইনে দাঁড় করান হল। দুটো জ্বলন্ত পেট্রোম্যাক্স একটা সারির প্রথমে এবং অন্যটা শেষে দুইজন আনসার নিয়ে হুকুমের জন্য অপেক্ষা করল। বললাম, সাইকেলে গিয়ে সিনেমা বন্ধ করতে বল এখুনি। সিনেমার দর্শকরাও ভীড় করে রাস্তায় নামল আর 'গণিকামোদীদের' মিছিল শুরু হল। দেখলাম কয়েকজন চাদরে বা অন্য কিছুতে মুখ ঢাকার চেষ্টা করছে। মিছিল নারদ নদীর ব্রিজ পর্যন্ত আসার পর বললাম, সবার নাম আর বাপের নাম ও ঠিকানা লিখে ছেড়ে দেওয়া হোক। ফিরে এসে অফিসার্স ক্লাবে গেলাম। এখানে ইতিমধ্যেই খবর পৌঁছে গেছে। মুন্সেফ সাহেব আমাকে আলিঙ্গন করলেন। সবাই সাবাসী দিলেন। প্রবীণ মহকুমা ডাক্তার সাহেব বললেন, এসডিও সাহেব এবারে নিশ্চয় আপনার ফেয়ারওয়েলের আয়োজন আমরা নিশ্চিন্তে করতে পারি। অনেকে তাস খেলছিলেন। আর কয়েকজন দাবা খেলছিলেন। এ দুই রসেই আমি বঞ্চিত। আমার পান আর তার সঙ্গে সিগারেট চলল। অভিযানের গল্প বলছিলাম আর সকলে তা উপভোগ করছিলেন মুহূর্তে মুহূর্তে অট্টহাসি হেসে। এমন সময় দূর থেকে এই দিকে এগিয়ে আসা স্লোগান শুনে সবাই হকচকিয়ে গেলাম, 'গণিকারা নাকি? তাদের মক্কেলরা তো আসছে না?' না, না, মিছিলে সব সাদা টুপি, স্লোগান দিচ্ছে

www.pathagar.com

এসডিও জিন্দাবাদ। যাক বাঁচা গেল। মিছিল এসে সোজা ক্লাবঘরের ভিতর ঢুকল। মসজিদের ইমাম ও মুসল্লিরা এশার পর এসছেন এসডিওকে অভিনন্দন জানাতে। বললাম, 'শুকরিয়া আপনাদের, কিন্তু এসডিও তো পাপের জায়গা ক্লাব ঘরে বসে রয়েছে, আর আপনারা কিনা সেখানে এসেছেন এসডিও জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে। কি আজব কারবার।' ওরা দমবার পাত্র নন। জবাবে নানা কথা বললেন। যাহোক, কিছুক্ষণ পর সবাই চলে গেল। আমিও বাসায় ফিরলাম। ভাবলাম হাবিবুল্লাহর স্ত্রী নিশ্চয় আজ একটু সান্ত্বনা পাবে। এদিকে আদেশের মেয়াদ শেষ হবার আর একদিন বাকী। শুনলাম রাজশাহী এবং ঢাকায় বহু দেন-দরবার হয়েছে কিন্তু এসডিও এ ব্যাপারে কোন আদেশ-নির্দেশ বা সরকারী পরামর্শ পাননি। বিষয়টা এতই জঘন্য যে, কে এর জন্য ইচ্ছে থাকলেও তদবির বা সুপারিশ করবে? আর স্থানীয় তদবিরের গোড় কাটা হয়ে গেছে ঐ দিনকার সন্ধ্যার অভিযানে। এর মধ্যে আর এক বিপত্তি ঘটে গেল। আগেই বলেছি প্রায় সারা প্রদেশেই ধান-চালের দাম বেড়ে গেছে। বাজারে সরবরাহ কমে গেছে। হাহাকার শুরু হয়েছে। প্রাদেশিক সরকার জেলায় জেলায় কর্ডনিং প্রথা চালু করেছেন। এক জেলার ধান-চাল অন্য জেলায় যেতে পারবে না। গোয়েন্দা বিভাগের খবর, গুরুদাসপুর থানার চাঁচকৈরে প্রায় ৩০-৪০টি গয়না নৌকা চাল-ধান বোঝাই হয়ে অপেক্ষা করছে সুযোগের- জেলার সীমানা পার হবার জন্য। নৌকার মাঝি-মাল্লারা মারাত্মক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছে। আরও খবর পেলাম যে, থানার দারোগার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া চলছে। লেন-দেনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেলেই তারা নির্বিঘ্নে রওয়ানা দেবে।

কিছু আনসার ও পুলিশ নিয়ে গেলাম গুরুদাসপুর। পৌঁছাতে প্রায় বেলা পড়ে গেছে। প্রথমে দারোগার খোঁজ করলাম। তিনি অনুপস্থিত। তার নিচের জন বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না বললেন। দারোগা বাবু কখন আসবেন জানা নেই। নৌকাগুলো ৪/৫ দিন এই অবস্থায় আছে। প্রত্যেক নৌকায় দশ-বার জন লোক থাকে। জেলা বা মহকুমা সদরে খবর দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলাম। জাবাব পেলাম, দারোগা বাবু জানেন। মেজাজটা আমার খারাপ হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে একজন সাদা পোষাকধারী এসে সামনে হাজির হল। বলল, আদাব স্যার। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? বলল, আমি ওসি স্যার। বললাম, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? বলল, আমি মফস্বলে রাউন্ডে গিয়েছিলাম। কঠিন কণ্ঠে বললাম, আপনার পরনে ইউনিফর্ম নেই কেন? আপনি মফস্বলে গেলেন, ফিরে এলেন আপনার ইউনিফর্ম কোথায়? চাকরির নিয়ম-কানুন সব বদলে গেছে নাকি? দারগা বাবু এত লোকের সামনে খুবই বিব্রত বোধ করছিল মনে হয়। একটু থেমে জিজ্ঞাস করলাম, এই নৌকাগুলো কয়দিন এখানে আছে? বলল, এক সপ্তাহ হবে।- ওপরে খবর দিয়েছেন? -না, দেইনি, কারণ আমার এখানে

www.pathagar.com

যথেষ্ট লোক নেই। –পুলিশ কনেস্টবলের অভাব থাকলে চৌকিদার–দফাদার কাউকে পাঠাননি কেন? কোন জবাব নেই। –আপনি আজই এগুলো সীজ করার ব্যবস্থা করুন। –আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। –কেন সম্ভব নয়? –আমার কাজ এটা নয়। এটা ফুড ডিপার্টমেন্টের কাজ। বলে দারগা বাবু পাশেই থানা বিল্ডিং–এর দিকে পা পাড়াবার উপক্রম করল। আনসার এডজুটেন্ট ও থানার সিপাইদের বললাম, ওকে আমি গ্রেপ্তার করলাম। ওর হাতে হাত–কড়া পরাও এবং কোমরে দড়ি বাঁধ। তাই হল। ইতিমধ্যে বহুলোক জমে গেছে। একটা চায়ের দোকান থেকে ছোট টেবিল আনিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে ঘটনা ব্যাখ্য করলাম। আর বলে দিলাম, দুজন সহকারী এডজুটেন্ট, ৪ জন সিপাই, ছয় জন চৌকিদার–দফাদার, দারগা ও প্রত্যেক নৌকার একজন করে মাঝিকে একসাথে দড়ি দিয়ে কোমরে বেঁধে সারা রাত হাঁটিয়ে সকাল বেলা আমার কোর্টে হাজির করবে। জমায়েত লোকজনদের নিকট আবেদন করলাম যে, তারা যেন যথেষ্ট সংখ্যায় এদের ঘেরাও করে নিয়ে যায়। পরের দিন বেলা এগারটা নাগাদ কয়েকশত লোকের এক মিছিল কোর্টির সামনে সব আসামীকে নিয়ে হাজির হল। তাদের ধন্যবাদ দিলাম। আসামীদের (দারোগাসহ) হাজতে পাঠিয়ে সেকেন্ড অফিসারকে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে বলে জেলা সদরে সবিস্তারে এক রিপোর্ট পাঠালাম। বুঝতে পারছিলাম যে, আমার বাসার আসবাবপত্র গোছাবার সময় হয়ে এসেছে। এদিকে ডিএম এবং এসপি চিঠি মারফত আমার কাজের সমর্থন দিলেন। খুশী হলাম।

শহরে কোথাও সভা–সমিতির জন্য কোন হল ঘর নেই– এক সিনেমা হল ও মন্দিরের আটচালা ছাড়া। থানায় অবশ্য একটা চৌকিদার শেড ছিল। আনসারদের জন্য স্থায়ী মঞ্চসহ পাঁচশত লোক বসার একটা হলঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে টেষ্ট রিলিফ–এর টাকায়। সেই কাজ দেখতে প্রায় নিয়মিত যেতাম। সেখানে একদিন স্থানীয় কয়েক জনের মুখে শুনলাম প্রদেশের সবচেয়ে শক্তিধর অর্থমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর আসছেন এক সপ্তাহের মধ্যে এসডিওর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে। কারণ ডিএম, কমিশনার এবং গোয়েন্দা রিপোর্টগুলোতে তিনি খুব একটা খুশী হতে পারছেন না। হতেও পারে। আমি স্থির জানি আমাকে বদলি হতে হবে। সেটা যে এতদিন হয়নি কেন তাই আমাকে অবাক করে দিচ্ছে। বদলি করার জন্য অনেকগুলো অজুহাত তো আমি সরকারকে একটার পর একটা দিয়ে যাচ্ছি।

যাহোক, মনোরঞ্জন ধর নয়, খাদ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী নাটোরে এলেন সফরে তাঁকে দিয়ে আনসার হল উদ্বোধন করালাম। তিনি খুব খুশী হলেন। বক্তৃতায় এসডিওকে নাহক প্রশংসা করে গেলেন। এও জানালেন, এটা নাটোরবাসীর সৌভাগ্য যে, এই জাতীয় সরকারী কর্মচারী তারা তাদের মহকুমায় পেয়েছেন। ভাবলাম এ

www.pathagar.com

আবার কোন্ চালে পড়লাম। মনে হয় মতলব খারাপ। যাহোক, সব ভালয় ভালয় কাটল। মন্ত্রী চলে গেলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খুশী হলেন, মন্ত্রী নাকি আমার সম্বন্ধে তাঁকেও খুব ভাল কথা বলে গেছেন। জানি, এসব কথায় আমার কোনই লাভ নেই। মাইনে কিন্তু ৩৭৫ থেকে বাড়তে হলে আমাকে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাস করতেই হবে।

সপ্তাহ দুই পর, ঢাকা থেকে সরাসরি অর্থমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধরের সফর সূচী পেলাম। বুঝলাম, খাদ্যমন্ত্রীর রিপোর্টও তার মনপুত হয়নি। ডিএম সাহেব বললেন, আমি যেন রাজশাহীতে গিয়ে মন্ত্রীকে নাটোরে নিয়ে আসি। তাঁকে জানালাম যে, তিনি যদি মন্ত্রীর সংগে নাটোর আসেন তাহলে আমার রাজশাহী যাবার কোন প্রয়োজন নেই। এখানেই আমি মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাব। স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হল। ঠিক হল, যে জিপ থেকে নামলে এসডিও মন্ত্রীকে পুলিশ বাহিনীর গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করাবেন এবং মন্ত্রী যথারীতি সালাম নেবার পর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যর্থনাকারীদের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এরপর তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। সভা শেষে কেবল হিন্দুদের সংগে এক মন্দিরের ভিতর তিনি মিলিত হবেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেকই এটা করা হল। তারপর মহকুমা কর্মচারীদের সংগে মিলিত হবেন এবং সবশেষে সন্ধ্যায় রেলযোগে নাটোর ত্যাগ করবেন। এভাবেই মন্ত্রীর সফরসূচী প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে জানিয়ে দেওয়া হল। নির্ধারিত দিনে মন্ত্রী, ডিএম এবং রাজশাহীর কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি নাটোরে তশরিফ আনলেন। সূচী অনুসারে এগিয়ে গিয়ে মন্ত্রীর সাথে হাত মেলাতে যাচ্ছি– এমন সময় খদ্দরধারী এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে তাঁর গলায় ফুলের মালা পরালেন, করজোড়ে প্রণাম করলেন এবং সেই মুহূর্তে সারিবাঁধা লোকজন– অফিসার ছাড়া প্রায় সকলেই তাঁর সাথে হাত মেলাবার জন্য তাকে প্রায় ঘিরে ফেলল। এ অবস্থায় আমি দৃঢ়ভাবে সবাইকে সরে যার যার জায়গায় যেতে অনুরোধ করে মন্ত্রীকে বললাম, স্যার, প্রোটকল অনুসারে আগে সশস্ত্র বাহিনীর সালাম নেবার রেওয়াজ। আপনি অনুমতি দিলে আমি না–হয় ওদের স্টান্ড ডাউন করে দিতে পারি। মন্ত্রী একটু বিব্রত হয়ে বললেন, না–না চলুন ওদের কাছে যাই। ওদের সালামের পর আমার সহকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি মন্ত্রীকে ছেড়ে দিলাম। যার সংগে ইচ্ছে তিনি এখন হাত–পা যা খুশী মিলান– আমি দর্শক মাত্র। খোঁজ নিয়ে জানলাম নাটোর এসডিওর হাতে নিপীড়িত হিন্দুদের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই ভদ্রলোক। বাড়ী তাঁর বগুড়ায় এবং তিনি উত্তরবংগে ভারতীয় (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের) ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা এবং ইনি মনোরঞ্জন ধরের অতি প্রিয়পাত্র। আমার অফিসারদের খুব বকাবকি করলাম এজন্য যে, কেন তারা ওর কথা

www.pathagar.com

আমাকে মন্ত্রী আসার আগে জানায়নি। আগে জানতে পারলে তাঁকে বগুড়ায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম। যাহোক অভ্যর্থনা পর্ব শেষ হলে সবাই চৌকিদার শেডে গেলাম। মন্ত্রী কি সব কথা বলেছিলেন আজ আর আমার মনে নেই। তবে হঠাৎ চৌকিদার শেডের টিনের চালে ইটের ঢিল পড়ার আওয়াজ পেলাম। তৎক্ষণাত পুলিশকে বলে দিলাম বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের বলে দিন যে আমি কোনরকম বিশৃংখলা বরদাস্ত করব না। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুচারটা স্লোগান অবশ্য এর মধ্যেই শোনা গেছে। আর কিছু হয়নি, সব চুপচাপ। এই পর্বের পর ডিএম সাহেব চুপে চুপে জিজ্ঞেস করলেন চায়ের বন্দোবস্ত আছে কিনা। বললাম, এরকম কোন নির্দেশ আমার ওপর ছিল না। তবে মন্ত্রী যদি একজন মুসলমান এসডিওর বাড়ীতে গিয়ে চা খেতে চান আমি খুশী হয়েই ব্যবস্থা করতে পারব। তবে তাঁর সংগের ঐ চামচাগোষ্ঠীর চায়ের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে মস্কিল। অতগুলো কাপ-পিরিচ পাব কোথায়? অতগুলো লোকের বসারই বা ব্যবস্থা কেমন করে করব আমার বাসায়? যাকগে মন্ত্রী ওখানের বক্তৃতা শেষে আমাকে বললেন, আমি ওদের সংগে একটু মন্দিরে যাব, আপনার যাবার দরকার নেই। বললাম, স্যার, কয়েকজন মুসলমান আপনাকে মসজিদের বারান্দায় একান্তভাবে কিছু বলতে চায়, আপনি দয়া করে ওদেরকে সুযোগ দেবেন কি? না না আমি মসজিদে যাব কি করে, আমিতো হিন্দু, আমার মসজিদে যাওয়া কি ঠিক হবে? জবাবে বললাম, স্যার, আমি তো মুসলমান আমার তো কারো সংগে কোন মন্দিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। মন্ত্রী বুঝলেন, হিন্দুদের সংগে মন্দিরের ভেতর গোপন সভা করার ব্যাপারটা সবাই ভাল নজরে নেয়নি। আমারও উদ্দেশ্য ছিল এ কথাটাই তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া। মন্ত্রী মন্দিরে। ডিএম সাহেব, এসপি সাহেব আর আমি তিন জনে আমার অফিসে বসে চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। ডিএম সাহেব ক্ষোভের সংগে বললেন- জান নাজির, মন্ত্রী আমার বাসায় চা খেতে গিয়েছিলেন এখানে আসার আগে। তাঁর সাথী-সংগীরা পায়ে কাদাসহ আমার সোফার উপর পা তুলে বসে সোফাগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। আর আমার সখের টি সেটের মিল্ক পটটা ভেঙ্গে দিয়েছে। একটা কাপও ভেঙ্গে ফেলেছে। আমার পুরো সেটটাই বরবাদ করে দিয়েছে। সমবেদনা জানিয়ে বললাম, স্যার, ভাগ্যিস আপনার কথামত আমি বাসায় ওদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করিনি। আমার বিলাত থেকে আনা সেট ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। সেগুলোর বারটা বাজত আর কি!

মন্ত্রীর মন্দিরের মিটিং শেষ হল। কিন্তু এর আগেই এসপি'র চররা এসে বলল যে, মন্ত্রী বারবার হিন্দুদের বলেছেন যে, তোমরা এসডিওর অত্যাচারের বাস্তব দৃষ্টান্ত দাও। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কিন্তু সবাই বলছে যে, তিনি গোঁড়া মুসলমান। আর আমাদের ভয় করে তাঁকে দেখে। এটা এসডিওর কোন অপরাধ হতে পারে না। তোমাদের কথাতেই প্রমাণিত হয় যে, এসডিও জনকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহী। জনসাধারণকে

www.pathagar.com

সংগে নিয়েই কাজ করছেন। গরুর মাংস, তো তিনি কোন হিন্দুকে জোর করে খাওয়াননি। বেশ্যাদের শহরের এক প্রান্তে সরিয়ে দিয়ে এসডিও ভাল কাজই করেছেন। তোমরা তাঁর কাজে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট কর, সেটাই ভাল, ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পর মন্ত্রী অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে এলেন। মামুলি বক্তৃতা, হিন্দু-মুসলমান কোন কথা উচ্চারণ করলেন না। বললেন, নাটোরে প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখে তিনি খুশী হয়েছেন। সন্ধ্যায় তাঁকে বিদায় জানাতে স্টেশনে গেলাম। মন্ত্রীর রেল-কামরায় ঢুকে বিদায় জানাতে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, এসডিও সাহেব, আপনার অফুরন্ত কর্মস্পৃহা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। হিন্দুদের আপনার বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ নেই। তারা কেবল আপনার হাতের ঐ ছড়িটাকে ভয় করে, শেষের কথাগুলো হেসে হেসে বললেন। জবাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, স্যার, আমার হাতের এটা বিশেষ বিশেষ সময় ব্যবহৃত হয়- সবসময় এবং সবার উপর নয়। মন্ত্রীর সফর শেষ। বুঝলাম এবার আমার অন্যত্র টিকিট কেনার সময় হয়েছে। এখন কেবল স্থানটির অবস্থান জানতে বাকী।

শীত পড়েছে বেশ। এই শীতে মহকুমায় সফর করছি খুব। বলা হয়নি, আমি টেস্ট রিলিফের কন্টিনজেন্সি থেকে ১০ হাজার টাকায় একটা পুরানো জিপ কিনে ফেলেছি। সরকারের কাছে অবশ্য জবাবদিহি করতে হয়েছে অনেক। সরকারী আপত্তি- টেস্ট রিলিফের টাকায় জিপ কেনা এটা একটা গুরুতর অপরাধ। আমার জাবাব, টেস্ট রিলিফের জন্য যে কন্টিনজেন্সি অর্থ বরাদ্দ করা আছে তা দিয়ে এই জিপ টেস্ট রিলিফের কাজকর্ম তদারকির জন্য কেনা হয়েছে। কাজ শেষ হয়ে গেলে এটা নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যেমন কালভার্ট করতে বাঁশ, তক্তা ইত্যাদি কেনা হয় এবং কাজশেষে নিলামে বিক্রি কিরে দেওয়া হয়। সবগুলোই আইনশুদ্ধ, অসুবিধা কোথায়? শেষ পর্যন্ত সরকার হার মানল এবং আমি নাটোর থেকে চলে আসার পর সেই জিপটি ঢাকায় সচিবালয়ে নিয়ে আসা হয়। আসলে এই জিপ কেনার একটা ইতহাস আছে। বিলেত থেকে ট্রেনিং শেষে আমি সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিন মাস ময়মনসিংহে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হই। এই তিন মাসের মধ্যে দুটো ফৌজদারী মামলার বিচার করে রায় দেই। এর একটা মামলায় প্রধান উকিল ছিলেন জনাব আবদুল মোনেম খান। মোমেনশাহী বারের নামজাদা উকিল তিনি (পরে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর)। আরগুমেন্টের দিন আসামী পক্ষে তিনি হাজিরা দিলেন। দেখলাম এক মধ্য-বয়সী উকিল তাঁর কাল কোটটি কাঁধে ফেলে কোর্টকে উদ্দেশ্য করে তার আরগুমেন্ট শুরু করে দিলেন, 'ইউর অনার স্যার'। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে পেশকারকে বললাম, সকলকে বলে দেবার জন্য যে, আমার কোর্টে যথাযথ পোষাকে হাজির হতে এবং কোর্টের যথাযথ সম্মান বজায় রাখতে। নচেৎ আমি কারো কোন

www.pathagar.com

কথা শুনতে রাজি নই। শুনানি মুলতবি ঘোষণা করে দিলাম। ভদ্রলোকসহ সবাই হকচকিয়ে গেলেন হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায়। মাফ চেয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। পরের শুনানীর দিন আর জনাব মোনেম খান আসামী পক্ষের উকিল হয়ে হাজিরা দেননি।

আসল সথায় ফিরে আসা যাক। নাটোরে বদলির হুকুমনামা পেয়ে প্রথমে মহকুমাটি কোথায় জানার জন্য পেশকারকে জিজ্ঞেস করলাম। বলতে পারলো না। শেষে বাচ্চাদের ভূগোল থেকে নাটোর উদ্ধার করলাম। নাটোর মহকুমা অফিসে তারবার্তা পাঠালাম। আমার সেখানে পৌছানোর তারিখ ও সময় জানিয়ে। অনুরোধ করলাম রেল স্টেশন থেকে বাসস্থানে যাবার যানবাহনের ব্যবস্থা করে রাখতে। ভোর তিনটায় দুটি বাচ্চাসহ সস্ত্রীক পৌছাব এই নতুন জায়গায়, সেই জন্যই বিশেষ করে এ অনুরোধ। জবাবে জানান হল, সব ঠিকঠাক থাকবে। বিদায়ী এসডিও আমাকে সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশনে চার্জ দিয়ে দেবেন। তিনি আগেই অন্যপ্রান্ত থেকে রওয়ানা দেবেন। যথা স্থানে চার্জ নিয়ে এসডিও বনেই নাটোর রেল স্টেশনে হাজির হলাম। কোর্টের নাজির, হেড ক্লার্ক আর ডেপুট ম্যাজিস্ট্রেট, সেকেন্ড অফিসার ও পুলিশের সিআই রেলস্টেশনে আমাকে খোশ আমদেদ জানালেন। আমাদেরকে তাঁরা একটা অতি পুরান জরাজীর্ণ বাসে সবিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে আর কোন যানবাহন নেই? জবাব এল, রিকশা আর টমটম আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছি? জবাবে বলা হল, এসডিওর বাংলোয়। জিজ্ঞেস করলাম, ওটার চুনকাম করা হয়েছে? সন্ধ্যারাতে আগের এসডিও চলেযবার পর করা হয়েছে। বললাম, নিশ্চয় এখনো শুকোয়নি। আমাকে ডাক বাংলায় নিলেন না কেন? জবাব পেলাম, ওটা বেশ দূরে, এজন্য। যাহোক, ইতিমধ্যে বাংলোর সামনে বাসখানা এস দাঁড়াল। যাত্রী হিসেবে আমাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বুঝে নিল কি কঠিন জায়গায় না পদার্পণ করেছি। আর শহরবাসী যারা রাস্তার দুপাশে নিজের বাড়ী-ঘরে ঘুমোচ্ছিল তারাও বুঝল নতুন এক নগরপাল নাজিল হল। হঠাৎ দেখি যে হারিকেনটা একতণ টিম টিম করে জ্বলছিল, সেটা গেল নিভে। ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে বেশ বিপদেই পড়লাম। খিদেও লেগেছে প্রচুর। বাচ্চাদের দুধ ফ্লাস্কে কিন্তু বাচ্চার বাপের চা বিস্কুট তো শেষ হয়েছে রাস্তায়। ধমকের সুরে বাতির জন্য বলায় এক জলন্ত পেট্রোম্যাকস এনে হাজির করল এক সিপাই। বললাম, কোথা থেকে সে এটা আনল? জবাবে জানাল- ট্রেজারির বাইরের একদিক থেকে খুলে নিয়ে এসছে। চিৎকার করে বকাবকি করে সেটি যথাস্থানে রেখে একটা মোমবাতি জোগাড় করতে বললাম। ইতিমধ্যে নিজের সিগারেট লাইটার জ্বালিয়ে রাখলাম। এভাবে আমার নাটোরের কর্মজীবন শুরু। জিপ কিনে ঐ বাসে সফরের বদলা নিলাম। সবচেয়ে মজাহল ইংরেজ বেনিয়াদের তৈরী আইনের বজ্র আঁটুনির ভিতর এত ফসকা গেরো থেকে গেছে যে

www.pathagar.com

একটু সতর্ক হলেই যে কেউ নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পারে। সরকার এত শক্তিধর হয়েও এক নগণ্য নতুন কর্মচারীর কাছে কিল খেয়ে হজম করতে বাধ্য হল একটা সামান্য জিপ নিয়ে।

মূল কথায় আবার ফিরে যাই। বিভাগীয় কমিশনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবদের নিয়ে গুরুদাসপুরে চাচকৈরে শিক্ষা সংঘের বার্ষিক সভায় আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন বলে সফর সূচী পাটিয়েছেন। নির্ধারিত দিনে তাঁরা ডাক বাংলোয় এসে হাজির হলেন। ঠিক হল রাস্তায় খুব ধূলো উড়বে, সুতরাং কশিনার সাহেব একটি জিপে যাবেন। পাঁচ মিনিট পর ডিএম ও চেয়ারম্যান সাহেবদ্বয় ডিএম সাহেবের জিপে যাবেন। আমি আমার জিপে যাব কিছুক্ষন পর। তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি ঐ এলাকার সার্কেল অফিসারসহ আমার বাংলোয় চলে গেলাম। সার্কেল অফিসার বললেন স্যার, ওরা মাইন্ড করতে পারেন হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। একটু চা খেয়ে তারপর রওয়ানা দেওয়া যাবে। ঠিক আধঘন্টা পর রওয়ানা দিলাম। রাস্তায় একটা ছোট মরা নদী পেরুতে আমার জিপ সহজে রাজী হল না। বেশ কষ্ট করে প্রায় পনের মিনিট চেষ্টা করে ওপাড়ে উঠর। বেচারা বুড়ো হয়েছে তো। ঘটনা স্থলে ইতমধ্যে সভা শুরু হয়ে গেছে। আমার জিপের আওয়াজ শুনে সমবেত প্রায় সকলেই এসডিওকে অভ্যর্থনা জানাতে সভাস্থল ত্যাগ করে এগিয়ে এল। আমি মঞ্চে উঠে দেখলাম মেহমানদের জন্য ছাপান ও বাঁধান মানপত্র পড়া হয়ে গেছে এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব জবাব দিচ্ছেন। সংগঠকরা তাঁকে বসিয়ে দিয়ে এসডিওর মানপত্র পড়তে শুরু করবে এমন সময় এক অন্ধ বৃদ্ধ একটি বালকের হাত ধরে অন্য হাতে একটা মুখকাটা ডাব নিয়ে মঞ্চে উঠে পড়লেন। কেউ তাঁকে জোর করে নামাতে পারল না। দেখলাম ডিএম ও কমিশনার-এর মুখ খুব গম্ভীর আমার আসার দেরীর জন্য। বললাম, স্যার, বুড়ো জিপ নদী পেরুতে দেরী করিয়েছে। অন্ধ বৃদ্ধ ছেলেটার থেকে তার হাত সরিয়ে নিয়ে সবার গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করছে আমাগো সাব কোন জন? আমার ইঙ্গিতে সংগঠকদের একজন বৃদ্ধকে কমিশনারের সামনে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল না, না- আমাগো সাব কৈ? এবার ডিএম সাহেবের সামনে নেওয়া হল, আবার একই জবাব। এবার ইশারা করলাম চেয়ারম্যানের কাছে নেবার জন্য। কমিশনার বললেন যে, ইনি তোমাকে খুঁজছেন, এই বৃদ্ধ লোকটাকে অনর্থক তোমরা ঘোরাচ্ছ। বৃদ্ধ আমার মাথা এবং কাঁধে হাত রেখেই বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি, পেয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, কি পেয়েছেন? বললেন। আমাদের সাবকে পেয়েছি। বললেন, হুজুর, আমার নিজের হাতে লাগান নারিকেল গাছের প্রথম ফল আপনার জন্য এনেছি। এখানে আজ না আসলে আমাকে নাটোরে গিয়ে দিয়ে আসতে হত। মনে মনে পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র দরগাহে মস্তক লুটিয়ে ডাকটি হাতে নিলাম। যথারীতি সভার কাজ আবার শুরু হল।

www.pathagar.com

কমিশনার সাহেব তাঁর ভাষনে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ত্রিশ বছর চাকরী করে যা অর্জন করতে পারিনি আজ নাজির তুমি চাকরির শুরুতেই তা পেয়ে গেলে। তুমি ভাগ্যবান,– তোমাকে আন্তরিকভাবে দোয়া করি। এখানে না আসলে বুঝতে পারতাম না মানুষের হৃদয়ের কোন গভীরে তুমি নিজের স্থান করে নিয়েছ সবার অলক্ষ্যে। আসলে ডাব হাতে নেবার পর মূহূর্ত থেকেই আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মনের ভাবটা এমন ছিল, ছেড়েদে মা কেঁদে বাঁচি। মানুষের মনে প্রবেশ করেছি তাদের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে চিড়েগুড় আর পান্তভাবত খেয়ে তাদেরই একজন হয়ে। গাড়ী হাঁকিয়ে চেয়ারে টেবিলে শানশওকাত আর কৌলুস দেখিয়ে নয়। এই পুঁজি আমার সারা জীবনের। চাষী নিজের গায়ের ঘাম মুছে যে গামছায় আমাকে গঠাৎ তার পাশে দেখে সেই গামছায় আমার কপালের ঘাম মুছে দিয়েছে, আর আমার হাত থেকে সাইকেলটা নিয়ে কোন গাছের সাথে ঠেস দিয়ে রেখেছে। তাদেরই একজন আজ ডাব নিয়ে এসেছে। এ ডাব লোভনীয়, এ ডাব মহামূল্যবান। বৃদ্ধ কারো হাতে দেয়নি। এটা আল্লাহ্তালার নেয়ামত– এটা উচ্ছা করলেই পাবার বস্তু নয়, এটা আকাঙ্খা করা যেতে পারে মাত্র। আর মালিক ইচ্ছে করলেই কেবল এটা হাজির হতে পারে মুখের সামনে। যাকগে ওসব কথা। সেদিনের সন্ধ্যায় কমিশনার ও ডিএম সাহেবদের আচরণে বুঝলাম তাঁরা আমার পূর্বকৃত কথিত অপরাধগুলো হালকাভাবে নিতে শুরু করেছেন। এটাই একমাত্র সান্ত্বনার কথা। সকলেই ওখানের কাজ সেরে নাটোরে ফিরলাম। কমিশনার, ডিএম এবং চেয়ারম্যান সাহেবরা সরাসরি রাজশাহী চলে গেলেন একটু বিশ্রাম নিতে। সার্কেল অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম এই বৃদ্ধ কোথা থেকে এলো? এটা নিশ্চয় কারো পূর্ব পরিকল্পিত। তিনি হলফ করে বললেন, স্যার এরকম ঘটনা তো আপনার সংগে এর আগেও ঘটেছে। ঐ অন্ধ লোকটা কমিশনারের এবং ডিএম এর উপস্থিতির মহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেননি, পারার কথাও নয়। নইলে তিনি কশিশনারকে কিছুতেই বাধা দিতেন না। আসলে স্যার বেয়াদবী না নিলে বলি, আপনি মঞ্চে চুপ করে না থাকলে আপনার গলার আওয়াজ ধরে ও লোকটা সরাসরি আপনার হাতেই তুলে দিতেন। যাকগে ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমার একটাই সান্ত্বনা যে নাটোর মহকুমার এমন কোন ইউনিয়ন নেই যেটিতে যাইনি। এই মহকুমার দায়িত্ব নেবার পর এটাই ছিল আমার ইচ্ছ। নাটোরে অবস্থানের প্রতিটি দিন কিছু না কিছু কাজের সংগে নিজেকে জড়িয়েছি। তাই কোনদিন মনে হয়নি যে, এরপর কি করা যায় বা কখন করা যায়। মোটামুটিভাবে গ্রামের অনগ্রসর মানুষগুলোকে একটা নাড়া দিতে চেয়েছিলাম। সেটা কিছুটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ছোট–খাট অনেক ঘটনা আজ কলমের আগায় এসে ভীড় করতে চায়। কিন্তু কাগজের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? তাই মোটামুটি প্রধান ঘটনাগুলোই এখানে জমা করলাম আর কি। একটা ছোট্ট ঘটনা

www.pathagar.com

আমার নাটোর আসার পরপরই ঘটেছিল সেটা না বললে মনটা শান্ত হবে না। আসলে ঐ ঘটনাই ছিল প্রথম, যা শহরের অবহেলিত নিরক্ষর মানুষগুলোর নজরেও যেমন পড়েছিল সমাজপতিদের দৃষ্টিও নিশ্চয় এড়াতে পারেনি। এক সন্ধ্যায় আমি বাসায় দু'একজন অফিসারের সাথে আলোচনা করছিলাম শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহর স্মরণে সরকারী উৎসবের কর্মসূচী নিয়ে। অফিসাররা চলে যাবার অল্প পরেই এক মহিলা বোরখার ভেতর থেকে কয়েকটা বড় বড় কাগজ বের করে দিয়ে কি যেন বিড় বিড় করে বলছেল। বারিক আর্দালীকে কাগজগুলো নিয়ে আসতে বললাম। কয়েকটি হাতে লেখা পোস্টার। তাতে এই মহিলার বিবাহযোগ্যা কন্যার চরিত্র নিয়ে কুৎসিত ও অশ্লীল কথা লেখা আছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম; তিনি বিধবা। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য অন্য গ্রামের কোন ছেলের সংগে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। আগামীকাল ছেলে পক্ষ দেখতে আসার কথা। এর মধ্যে এই বিধবার গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে যে ঐ মেয়েকে তাঁর সংগে বিয়ে দিতে হবে নচেৎ গ্রাম ছাড়তে হবে। ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তিটি দিখাপতিয়া ইউনিয়নের মেম্বার এবং বেশ ধনী। পুলিশ, চৌকিদার সব তাঁর বশে। বিধবা এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি, কারণ তাঁর মেয়ে ঐ লোকটির প্রথম স্ত্রী হবে না আর লোকটি কনের বাপ নয় দাদার বয়সী হবে। বিধবা গ্রাম-শালিস দিয়েছিল। কেউ মেম্বারের ভয়ে শালিসে বসতে রাজি হয়নি। পুলিশের সিআইকে জনা ছয়েক সিপাই নিয়ে আমার বাসায় আসার জন্য বলে পাঠালাম। এবং প্রায় আধঘন্টার মধ্যেই রওয়ানা দিলাম সাইকেলে। মেম্বারকে পেলাম না, বাড়ী থেকে পালিয়েছে। স্থানীয় লোকরা বলল তাঁর তিন নম্বর বউ-এর বাড়ী আর এক থানায়, সেখানে পালিয়ে গেছে। একটু ফাঁকা ধমক-ধামক করে বাড়ী চলে আসলাম। সবার সামনে বলে এলাম যে মেম্বারকে আগামীকাল কোর্টে হাজির হতে হবে নচেৎ হুলিয়া জারী হবে। সিআইকে বললাম, ওকে আগামীকাল বেঁধে আনতে। যে ছেলেটির সংগে কথাবার্তা হচ্ছিল তার সংগেই বিধবার মেয়ের বিয়ে হল। তবে আগের সময়সূচী অনুসারে নয়, মেম্বারকে জেলে ঢুকাবার পর। মেম্বর অবশ্য সাতদিন পর নিজেই কোর্টে আত্মসমর্পণ করেছিল।

এবার সত্যি সত্যি বদলীর আদেশ এসে গেল। যেতে হবে সিরাজগঞ্জ। সরকারের খাতায় মহকুমাগুলোর শ্রেণী বিভাগ ছিল। নাটো তৃতীয় শ্রেণীতে আর সিরাজগঞ্জ প্রথম শ্রেণীতে। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে আইসএসরা ছিলেন ভাগ্যবান ব্যক্তি যাঁরা প্রথমশ্রেণীর মহকুমা হাকিম হতে পারতেন। তাই ভাবলাম সরকার স্বয়ং অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে আমা হেন এসডিওর বিরুদ্ধে ইনকোয়ারী করে আমাকে সিরাজগঞ্জে পোস্টিং দিলেন মানসিক প্রস্তুতি আগেই ছিল। কমিশনার সাহেব এক ব্যক্তিগত চিটিতে জানালেন যে, যেহেতু আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ, আমি ইচ্ছে করলে নতুন এসডিওর কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে ডাক বাংলোয় কিছুদিন থেকে যেতে পারি। এই উদ্ভট প্রস্তাবে মনে মনে খুব চটে গেলাম কমিশনারের ওপর। পরে ভাবলাম তিনি আসলে আমার ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা মনে করেই এই সহানুভূতি সূচক পরামর্শ দিয়েছেন। প্রশাসনিক দিকটা খুব সম্ভব বিবেচনায় আনেননি। যাহোক তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখলাম, আমার নতুন কর্মস্থলে দুদিনের মধ্যেই চলে যাব। সেকেন্ড অফিসারের কাছে অস্থায়ী দায়িত্ব অর্পণ করে উত্তরসূরীর আগমণের অপেক্ষা না করেই। শুনেছি সিরজগঞ্জে আমার পূর্বসূরি বৃদ্ধ এসডিও সাহেবের সামনেই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কর্মীরা সদ্য গঠিত ভাসানী ন্যাপকর্মীদের পিটিয়েছে, খুন জখম করেছে। এসডিও অসহায় অবস্থায় পালিয়ে নিজের বাংলোয় এসে বেঁচেছেন। যা হোক, কিছু দেন-দরবার কিছু তারবার্তা এদিক সেদিক ছুটোছুটি যে করছে তা বেম বুঝতে পারলাম। এখন তো আমার জিপ আছে। তাই সবকটি থানা সদরে গিয়ে সভা করে মানুষদের একটা কথাই বলেছি যে নাটোরবাসী আমাকে গভীর আন্তরিকতার সাথে ভালবেসেছে। আমিও তাদের গভীরভাবে ভালবাসি। চাকরি জীবনের ফার্স্ট লাভ আসলে আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। তাদের কাছে দাবী জানিয়ে এসেছিলাম, ফেয়ারওয়েলের আয়োজন বাতিল করে একটাই ওয়াদা করতে যে তারা যেন নিজেদের অন্যের কাছে ছোট মনে না করে। তাদের ছেলেমেয়েদের না খেয়ে হলেও লেখাপড়া করাতে। মানুষ হিসেবে তারা অন্য কারো চেয়ে ছোট নয়। হিন্দুরা সমাজে শ্রেয়, মুসলমানরা মুসলমান সমাজে শ্রেয়। কেউ কারো দুশমন নয়। আর কেউ কারো অধীন নয়। এই মনোভাবই কেবল পরস্পরের মাঝে সমঝোতা আনবে। গুরুদাসপুরের হিন্দুরা এক ভিন্ন সভা ডেকে আমাকে জানালো যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পথের বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও আমার মতের সংগে তারা যে কেবল একমত তাই নয় বরং তারা আমার অনগ্রসর মানুষের সেবার মন্ত্রে নিবেদিত। নাটোর স্টেশনে বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবতারনা হল, মানুষের ঢল আর তাদের হৃদয় নিংড়ান অশ্রুধারা। আমি কিছুটা যে বিহবল হইনি তা নয়। ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের জানালা দিয়ে নাটোরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গাড়ী ঈশ্বরদী থামতেই আবার এক মিছিল নানারকম ধ্বনিসহ গাড়ীর কামরার সামনে হাজির। হাত নেড়ে তাঁদের সালাম জানিয়ে গাড়ীর কামরার দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমার বাংলো থেকে নাটোর রেল স্টেশনে আসার পথে হঠাৎ চোখ পড়ল এক চায়ের দোকানের সামনের ঝাপটা অর্ধেক বন্ধ ও অর্ধেক খোলা আর তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে এক জটাধারী। পুরনারী নয়- জটাধারী সাংবাদিক- ঢাকার ইত্তেফাক ও কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকার গজেন কর্মকার। তাঁর চোখে কৌতূহল আর আত্মতৃপ্তি।

তেত্রিশ বছর পরও মাত্র নয় মাস স্থায়ী স্মৃতি আমার স্মৃতিপটে আজো অম্লান হয়ে আছে। প্রথম প্রেম তো! মাঝে মধ্যে আমার ঢাকা অফিসে ও বাড়ীতে এক আধ জন মানুষ দেখা করতে আসে নাটোর থেকে।

www.pathagar.com

গ্রাম নয়– শহর

সিরাজগঞ্জে পৌঁছলাম সপরিবারে। মনে হল গ্রাম থেকে শহরে প্রবেশ করছি। রেল ষ্টেশনে বেশ কিছু অফিসার জমায়েত হয়েছেন নতুন এসডিওকে অর্ভ্যথনা জানাতে। আমি অবশ্য জানতাম যে আমার নাম বদনাম যাই থাকুক সেটা এই নতুন জায়গায় অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। একটা ছোট পুলিশদল সালামী দিল, দলের অভিভাবক পিএসপি অফিসার এসডিপিও। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান উকিল আবদুল্লাহেল মাহমুদও এসেছেন ষ্টেশনে। তিনি এসে হাত মেলাতেই বললাম– এসডিওকে একটু ভাল করে দেখুনতো, চিন্তে পারেন কিনা। তিনি, গভীরভাবে আমার দিকে তকালেন। নতুন মহকুমা অফিসার, তাঁকে খুশী করার জন্য তিনি এসেছিন অর্ভ্যথনা জানাতে। হঠাৎ প্রশ্নের জন্য নিশ্চয় তৈরী ছিলেন না। তবু আমতা আমতা করে বললেন, হ্যাঁ স্যার, কোথায় দেখেছেন বলুনতো? এবার ভদ্রলোক সত্যিই বেকায়দায় পড়লেন। বললাম, আপনি যখন কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার তখন একদল ছাত্র ১৯৪৯–৪৯ সালের বিভীষিকাময় মুসলিম হত্যাযজ্ঞের সময়টায় হাইকমিশন অফিসে আপনার সংগে ভীষণ তর্কাতর্কি করেছিল, দুএকজন একটু বেয়াদবীও করে ফেলেছিল, তাঁদের মধ্যে কউ কিনা দেখেন তো? ভদ্রলোক উচ্ছ হেসে পরিস্থিতি সামলিয়ে নিলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তার সংগে কোলাকুলি করলাম। কারণ সবচেয়ে বেশী বেয়াদবী আমিই করেছিলাম তখন।

যাহোক সে কথায় পরে আসছি। এসডিওর বাসা যমুনার পাড়ে। একটা দ্বীপের মত জায়গায়। রাস্তার পাশে একটা খাল বা ছোট শাখা নদী পার হয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ আমার বাসায় যেতে আসতে সব সময় নৌকায় ঐ খাল পেরুতে হয়। বাসাটা অবশ্য একতলা, তিন কামরার বাড়ী। সামনে একটা ছোট বাগান। এটা ওখানকার কোন এক জুট কোম্পানির ম্যানেজারের বাসা ছিল। সরকার রিকুইজিশন করে এসডিওর থাকার জন্য নিয়েছেন। এখানেও টানা পাখার ব্যবস্থা। অবশ্য একটা আধুনিক সরঞ্জাম আছে বাসায়, –হ্যাঁ সত্যিই একটা টেলিফোন আছে। খালের অরপ পারে শহরে যাবার রাস্তা দক্ষিণ দিকটায়। রাস্তার দিক্ষণের ডাক বাংলা এবং অফিসার'স ক্লাব। পুবের দিকে যমুনা নদীর চর ও নদী, চশ্চিম ও উত্তর দিকটায় চোর পাড়া। সত্যি চোররা থাকে

www.pathagar.com

কিনা জানিনা। তবে ঐ নামেই খ্যাত পাড়াটা। এখন এসব জায়গা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে।

বাসায় একজন পিয়ন, কিষ্ট চন্দ্র দাস। অন্যজন বডিউজ্জামান। প্রথমটা বৃদ্ধ। দ্বিতীয়টা কুস্তিগিরের মত চেহারায়। আমার জন্য একজন বাবুর্চি ঠিক করা আছে। নামটা মনে পড়ছে না। সে বিচিত্র চরিত্রের। একটু একটু ইংরেজী বলে। খুব প্রভুভক্ত। আমার সিরাজগঞ্জের জীবনে এই বাবুর্চিই আমার মনে সবচেয়ে বেশী ছাপ রেখে গেছে। পরে বলব সে কথা।

আবদুল্লাহেল মাহমুদ-এর কথায় ফিরে আসি। এই ভদ্রলোককে আমার মনে ছিল তাঁর নামের কারনে। সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান পরিবারগুলোর মধ্যে তাঁর পরিবার একটি। স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। প্রাদেশিক রাজনীতিতে কিছু যোগাযোগ না থাকলে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই তাকে উপরাষ্ট্রদূতের মর্যাদার চাকুরী দেওয়া হত না, নিশ্চয়ই কলকাতায় মুসলিম গণহত্যার দিনগলোতে ওখানকার মুসলমান মজলুম নরনারী আশা করত পাকিস্তান হাই কমিশনার সাহেব তাদের বাঁচাবার জন্য অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে দেন-দরবার করবে। কিন্তু তারা পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনের সেরকম কার্যকলাপ কিছুই দেখেনি।

আমি থাকতাম আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ হোস্টেলে। হোস্টেলের নাম ছিল সেন্ট ডেভিড হোস্টেল। কলেজে মাত্র চার-পাঁচজন মুসলমান ছেলে ছিলাম। সবাই হোস্টেলে থাকতাম। ১৯৪৬ সালে রায়ট শুরু হতেই ঢাকা এবং কুমিল্লার দুই সহপাঠী চলে গেল হোস্টেল ছেড়ে। থাকলাম সিলেটের এস, এম আলী (বর্তমানে বিখ্যাত সাংবাদিক) আর আমি। এরপর এস, এম আরীকেও ওখান থেকে কোন রকমে সরিয়ে দেওয়া হল নিরাপদে। থাকলাম একা। প্রফেসারও সহপাঠীরা সকলেই সহানুভূতিশীল ছিলেন। দিনরাত বিভীষিকা চারিদিকে।

একটু পিছনে তাকিয়ে বলতে হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের কথা। হোস্টেলে বাসিন্দাদের মধ্যে কয়েকজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে, কিছু নাগা, খাশিয়া, কিছু মাদ্রাজি ও শ্রীলঙ্কার ছেলে আর বাকি পূর্ববংগের এবং কলকাতা ও তার আশ-পাশের। হোস্টেলে হিন্দু ছেলেরা আমাকে ভালই জানত। ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করতাম একাই। হিন্দু বন্ধুরা সহযোগিতা করত। আর স্বয়ং প্রিন্সিপাল সাহেব ও হোস্টেলের ওয়ার্ডেন সাহেব কেকসহ শুভেচ্ছাবাণী পাঠাতেন আমার রুমে পিয়ন মারফত। সবাই মিলে সেগুলো ভাগ করে খেতাম। কলেজের ভেতর হিন্দু বা মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে পারত না।

www.pathagar.com

১৯৪৬ সালের ভোরে হোস্টেলের যেসব ছেলে পূর্ববঙ্গ থেকে গিয়েছিল ওরা বলতে লাগল যে ঐ দিন ভোর বেলায় মেছো বাজার ও কলুটোলা এলাকায় মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়ীতে আগুন দিয়েছে, কলাবাগান এলাকায় হিন্দুমেয়েদের স্তন কেটে নিয়েছে। সারা শহরে রায়ট লেগে গিয়েছে। এটা এতো বাজে কথা যে, ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ অষ্টারলোনী মনুমেন্টের নিচে জনসভার ডাক দিয়েছে। তারা আগেই যদি রায়ট শুরু করতো তবে জনসভাতো ভেস্তে যাবে। কিন্তু সে কথা বলেই বা কে, আর শোনেই বা কে। যাহোক, হোস্টেলের আবহাওয়াও যেন বিষিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই ১৯৪৬ থেকে ৫০ সাল কেটেছে।

১৯৫০ সালের সার্কুলার রোডে একটা মহরমের মিছিল দেখতে গিয়েছি। আরঅল্পক্ষনের মধ্যেই রাস্তার দুপাশের হিন্দু বাড়ী থেকে গুলি, হাত-বেমা মিছিলের ওপর বর্ষিত হল আর রাস্তার মিছিলকারী পলায়মান লোকজনকে ছুরিকাঘাত করা হল নির্বিচারে। প্রাণ নিয়ে হোস্টেলে ফিরলাম। বিকেলে হোস্টেলের ঝাড়ুদার 'বন্ধু' বেচারা এসে বলল, বাবু আপনি চলে যাও। বললাম, কোথায়? সে বলল, অন্য কোথাও। বললাম কেন? বলল, অন্য বাবুরা আমাকে বলেছে আপনার ঘর না মুছতে এবং হোস্টেলের মেসের বেয়ারাদের বলেছে আপনার খাবার, থালাবাসন, গ্লাস না ধুতে।

সন্ধ্যায় আমার কলেজের টিউটার অধ্যাপক জে, এস টারনার, এখন তিনি বেগবাগান অঞ্চলের লা'মর্টিনেয়ার কলেজের অধ্যক্ষ, গাড়ী নিয়ে এস আমাকে এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলেন তার বেগবাগানের বাসায়। সেখানে প্রায় ১৫ দিন থাকলাম একরকম গোপনভাবেই। এরই মধ্যে একদিন তিনি একটা ওরিয়েন্ট উড়োজাহাজ কম্পানীর টিকেট এনে দিলেন সেটা ১৪ দিন পর ঢাকায় আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মাঝে শুনলাম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বেকার হোস্টেলের কিছু ছেলেদের নিয়ে একটা মালবাহী স্টিমার সুন্দর বনের ভেতর দিয়ে খুলনা হয়ে ঢাকা যাবে। খবরটা যাচাই করতে গেলাম পার্ক স্টিটে পাক হাই কমিশনে। দেখি আমার আগে অনেক পরিবার সেখানে হাজির হয়েছে- একই উদ্দেশে। ডিপুটি হাই কমিশনার সাহেব ব্যস্ত। তাই সবাই অপেক্ষা করছে। আমিও তাদের সঙ্গে ঘন্টা দুই অপেক্ষা করলাম, রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এবার আমাদের মস্তিষ্কে উষ্ণ প্রবাহ বইতে শুরু করল। পাহারাদার পুলিশের মারফত একটা স্লিপে লিখ পাঠালাম যে আমাদের জীবন বিপণ্ন, আমরা কয়েকঘন্টা অপেক্ষায় আছি সাক্ষাতের। তিনি একটু কষ্ট করে আমাদের কথা শুনুন। প্রায় বিশ মিনিট পর এক কর্মচারী এসে জানাল যে, হাই কমিশনার সাহেব খুব ব্যস্ত।

www.pathagar.com

সুতরাং আজ দেখা হবে না। বললাম আগে এ কথা বলা হল না কেন? এই দু'তিন ঘন্টা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না একগুলো মানুষের। ভদ্রলোক একটু অবজ্ঞাভাব দেখিয়ে আমাদের চলে যেতে বললেন। এরপর আর কারোরই ধৈর্য্য থাকল না। তাঁকে ঠেলে সকলে ভেতরে ঢুকে হৈ চৈ শুরু করায় এক কালোমত মাথায় কিছু টাকপড়া কিন্তু মার্জিত চেহারার লোক বেরিয়ে আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের টিকেট রয়েছে? আপনাদের হেলথ সার্টিফিকেট করা হয়েছে? রাগে ফেটে পড়ে বললাম, স্যার, কিসের টিকেটের কথা বলছেন? এই চিড়িয়াখানায় আসার টিকেট? না তা করিনি কেউ। প্রাণভয়ে এতগুলো মানুষ তিনঘন্টা যাবত এই খাড়া রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আপনার অপেক্ষা করছে সাক্ষাতের আর আপনি কোন হেলথ সার্টিফিকেট চান। আপনি যে একজন অপদার্থ লোক তা আপনার সরকার কি এখনো জানে না? আপনি রাইটার্স বিল্ডিং এ পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় আপনার সরকারী গাড়ীর ঝান্ডা নামিয়ে চোরের মত গিয়েছেন। এরপরও আপনি এখানে কামরার মধ্যে বসে টিকেট আর হেলথ সার্টিফিকেটের কথা জপছেন। ভদ্রলোক হঠাৎ আরও শান্ত হয়ে বললেন, আগামীকাল ভোরে একটা মালবাহী স্টিমার ঢাকা যাবে। আপনাদের তাতে যেতে দেওয়া যেতে পারে। সজন্য হেলথ সার্টিফিকেট লাগবে এবং টিকেট লাগবে।

অনেক তর্ক-বিতকের পর ঠিক হল হেলথ সার্টিফিকেট পাওয়া সম্ভব নয়। আর স্টিমারে উঠেই টিকেটের পয়সা দেওয়া হবে। এই তর্ক-বিতর্কের মাঝে তাঁকে আরও কিছু রূঢ় কতা আমরা শুনিয়েছি, লজ্জা দিয়েছি। আমাদেরই একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হাই কমিশনার সাহেব, আপনার কার্পেটের ব্যবসা কেমন চলছে? মাড়োয়াড়ীদের সাথে কাঁচা পাটের ব্যবসা? ভদ্রলোক সত্যি খুব অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কিন্তু আগামীকাল এই কলকাতার বিভীষিকাময় নরম যন্ত্রনা থেকে চলে যাবার আশ্বাস পাবার পর ওখান থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলাম।

স্টিমারে করে কয়েকদিনের ভ্রমণের পরে খুলনার নদীর মাঝখানেই স্টিমার রাতে নঙ্গর করল যাতে কেউ খুলনায় নামতে না পারে। সবাইকে ঢাকায় যেতেই হবে। আসার পথে কলেরায় কয়েকজন মারা গেল। বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভোরের দিকে একটা ছোট ডিঙ্গিকে ইশারা করায় ডিঙ্গির মাঝি ইস্টিমারের গায়ে লাগাল তার ডিঙ্গি। কোন রকমে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে তাতে চড়ে বসলাম এবং বললাম তাড়াতাড়ি ঘাটে চল। ঘাটে উঠে সোজা আমার ভাই-এর বাসায় গিয়ে শুনলাম যে সারারাত ভাই সাহেব রেল স্টেশনে কলকাতা তেকে ট্রেনে আসা মোহাজেরদের সাহায্যের কাজ করেছেন। গেলাম সেখানে। পথে রিকশায় শুনলাম ডাক বাংলোয় মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব

www.pathagar.com

আছেন। গেলাম সেখানে। দেখলাম কয়েকজন যুবক এবং আরো অনেকে বেশ উত্তেজিত আলাপ আলোচনা করছে। বিষয়, রাতে টেনে জীবন্ত মানুষ পাওয়া যায়নি। মানুষের লাশ, কাটা মাথা, হাত, পা, জুতা আর রক্ত এই নিয়ে টেনটি এসেছে। এখবর তদানীন্তন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রধানকে জানাতে এসেছে এরা। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বললাম, স্যার, ইস্টিমারে এসেছি। যাত্রীদের খুলনায় নামতে দিলে যার যেখানে নামার ইচ্ছে সে সেখানে নেমে যেতে পারত। কলেরায় মরেছে মানুষ। ঢাকা যেতে অন্তত আরো দু'দিন লাগবে। মানুষের খাবার-দাবারও ফুরিয়ে গেছে। মাওলানা উদ্দূর্তে বললেন, বেটা হাম সব জানতা হ্যায়। আমি ভীষণ চটে গিয়ে বললাম, আপনি কিছুই জানেন না। আমরা ছাত্ররা কোলকাতায় আগুনে পুড়ে, ছুরির আগায় শতে শতে প্রাণ দিচ্ছি। আর আপনি নিরাপদে খুলনায় ডাকবাংলোয় বসে বসে সব জানতা হ্যায় করছেন। আপনাদের নেতৃত্বে থুথু- ছিটালেও এই লজ্জা যাবে না। ইউপি থেকে সবার আগে পালিয়েছেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান। আর বাংলাদেশ থেকে আপনি চোরেরমত পালিয়ে এসেছেন। তিনি চটলেন না। শান্তভাবেই বললেন, কি করা যায় সেটাই আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আমি আরামে নেই, আমার দীল সব সময় কাঁদে তোমাদের জন্য। আমাকে বসে শান্ত হবার জন্য বললেন বৃদ্ধ খা সাহেব। কিন্তু আমি ওখান থেকে সবে পড়লাম।

আবদুল্লাহেল মাহমুদের কথা বলতে গিয়ে আকরাম খা এসে পড়ল। এবার বরং এসডিওর বাংলোতে আবার ফিরে যাওয়া যাক। এসডিওর বাসাটা নাটোরের বাসারচেয়ে ভালই বলতে হবে। কিন্তু এসডিওর কোর্ট, চেম্বার, ইংলিশ অফিস এবং সাধারণ অফিস-এর অবস্থা শোচনীয়। একটা মেটারনিটি সেন্টার করার উদ্দেশ্যে দোতালা বিল্ডিং হচ্ছে। এসডিওর কোর্ট এবং এজলাস এবং আরও দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস হল এই বাড়ীতে এসডিওর চেম্বার হল ঐ বিল্ডিং-এর দোতালায় একটা গোসলখানায়, ইংলিশ অফিস হল একটা পাটের গুদামের টিনের দোচালায়। অন্যান্য অফিস-দপ্তর ভিন্ন ভিন্ন জায়দায়। প্রথমদিন চেম্বারে গিয়ে হতাশ হলাম। চেম্বারে বসে আছি। সাক্ষাৎ প্রার্থীর সংখ্যা মন্দ নয়। তবে প্রথম যে সাক্ষাৎ প্রার্থী তিনি এক হিন্দু জমিদার। তারাস থানার জমিদার বলে পরিচয় দিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর এই সাক্ষাত-এর হেতু কি? বললেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কত যে কথা শুনেছি তার হিসেব নেই। তাই আপনার সংগে সাক্ষাতের বাসনা দমন করতে পানিনি। বললাম, আমি একটা ছোট-খাট পাঁচফুট চয় ইঞ্চি মাপের হালকা-পাতলা মানুষ। কোনই বৈশিষ্ঠ্য নেই। আমি দুঃখিত যে, যা যা শুনেছেন তার হয়ত কোনটাই খুঁজে পাবেন না আমার মাঝে।

www.pathagar.com

যাহোক, অল্পক্ষণ আলাপ সেরে ভদ্রলোক চলে গেলেন। এরপর আরো ক'জনের আপত্তি (আবেদনকে সাধারণত এভাবেই ব্যক্ত করা হয়) শোনার পর নিজের অফিস ঘুরে দেখতে লাগলাম, অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। শুনলাম, শহরের বাইরে মহকুমা কোর্ট বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে। সিরাজগঞ্জে আসার পর থেকে একজন পূর্বসূরির নাম কানে আসতে লাগল। ইনি গোলাম ইসহাক খান সাহেব। কিছু কিছু জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। এখানকার মেয়েদের স্কুলটি তাঁর স্ত্রীর নামানুসারে 'সালেহা ইসহাক গার্লস স্কুল' রাখা হয়েছে। এখানে একটি ডিগ্রী কলেজ ও একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আছে। এর সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের আন্দোলন জড়িত। স্বয়ং কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ এখানে এক সম্মেলনে এসেছিলেন। মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রপথিক সুসাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্মস্থান এই সিরাজগঞ্জ। আমাদের আর এক সুসাহিত্যিক মুহম্মদ বরকতুল্লাহও এখানে জন্মেছিলেন। এই মহকুমার শাহজাদপুরের ঐতিহাসিক খ্যাতি রয়েছে। এখানকার এনায়েতপুর, চৌহালি, শাহ্জাদপুর তাঁতের কাপড়ের জন্য খ্যাত। তাছাড়া পাটের ব্যবসাও এখানে জমজমাট।

এসডিও'র একটা জিপ আছে। স্বাস্থ্য এবং মেজাজ-মর্জি ভাল নয়, প্রায়ই অসুখে পড়ে থাকে। কিন্তু একটি জুট বেলিং কোম্পানী প্রয়োজনে তাদের জিপ সরকারী কাজে ধার দিয়ে থাকে মাঝে-মধ্যে। এছাড়া ফায়ার ব্রিগেডের একটি ল্যান্ডরোভার এসডিও সাহেব নাকি প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

এ জন্য গোড়াতেই বলেছিলাম যে, এটাকে একটা শহর মনে হয়। এসডিও সাহেবের পাকা বাড়ী, টেলিফোন এবং গাড়ী সবই আছে, হোক না অফিসের বসার জায়গাটা মেটারনিটি সেন্টারের গোসলখানা। এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যাও অনেক। কাজকর্মও বেশী। আমার এখানে বদলি হয়ে আসার দু'-চারদিন আগে সদ্য বিভক্ত আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপের কর্মীদের মধ্যে মারামারি হয়েছে প্রচন্ড ধরনের। একটি বাই-ইলেকশন হতে যাচ্ছে। ন্যাপ প্রার্থীর মাথা জখম হয়েছিল। আওয়ামী লীগ কর্মীরাও আহত হয়েছে। ইলেকশনের এক মাস বাকী। একদিন সকালে এক যুবক মাথায় পট্টি বেঁধে আমার বাংলোর অফিসে আসলেন দেখা করতে। ইনিই ন্যাপের প্রার্থী। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ। ওরা ন্যাপের লোকদের জনসভা করতে দিচ্ছে না। মারপিট করে, পচা ডিম, ইট ছোঁড়ে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

তিনি বললেন, 'দেখুন না স্যার, আপনি আসার মাত্র তিন দিন আগে এসডিও সাহেবের সামনে ওদের গুন্ডারা লাঠি মেরে আমার মাথা ফাটিয়েছে।' বললাম, 'মনে হয় আপনি রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ। আপনি মাথার এই পট্টিসহ, দরকার হলে এতে রং

www.pathagar.com

লাগিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে আসুন। আপনার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আর কোন প্রচারই এত জোরাল হবে না। মানুষের সহানুভূতি আপনিই পাবেন।' কথাটা মনে হয় তাঁর মাথায় ঢুকল। তিনি অল্পক্ষণ পরই চলে গেলেন। আমিও বাঁচলাম।

কয়েক দিনের মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব মন্ত্রী মাহমুদ আলী এলেন সফরে। তাঁর সফরকালে কোন গন্ডগোল হল না। তবে বক্তৃতায় বেশ ঝাল আছে মনে হল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার কোন কোন সহযোগীর বিরুদ্ধে।

এর অল্প কয়েকদিন পর এলেন খাদ্য মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। ইনিই নাটোর থেকে আমাকে এখানে বদলি করে নিয়ে এসেছেন। তিনি জনসভায় শিষ্টাচারের মাত্রা অতিক্রম করে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার আগে ও পরে অশ্লীল সব প্যারডি শোনান হল শ্রোতাদের। ভাবলাম এদের কলিশনে বোধ হয় এদের কোয়ালিশন খান খান হয়ে ভেঙ্গে যাবে।

কিছুদিন পর এলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। গোয়েন্দা রিপোর্ট পেলাম যে ভাসানীর মিটিং-এ গন্ডগোল হবে। এমন কি সভাস্থলে যাওয়ার পথে মওলানা ভাসানীর ওপর হামলার আশঙ্কা আছে। রাস্তার দু'পাশের দোকান থেকে পচা ডিম ও ইট-পাটকেল ছোঁড়া হবে। এসব হবে আমার এখানে আসার আগের মারামারির জের হিসেবে।

শহরে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়ে দিলাম, 'কোন রকম বিশৃংখলা বরদাস্ত করা হবে না।' আরো প্রচার করালাম, 'বিশৃংখলাকারী ব্যক্তি সে যেই হোক না, তার সামাজিক মর্যাদা যত উঁচুই হোক না, তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' পুলিশকে কঠোরভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষার নির্দেশ দিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের বলে দিলাম, 'আইনের উপর কাউকে সম্মান করার মানুষ আমি নই। সবাইকে বলে দিন, প্রত্যেক দল সভা, মিছিল করতে পারবে তবে আইন ভঙ্গ করলে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে।' এসডিপিওকে বলে দিলাম তিনি যেন তাঁর পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক করে দেন যে, কঠিনভাবে নিরপেক্ষতা এবং দৃঢ়ভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষা করতে হবে। আচরণ-বিধি মাইকে শহরে প্রচার করা হল। বলা হল, মহকুমা হাকিমের বিশেষ নির্দেশে এই হুঁশিয়ারি প্রচার করা হচ্ছে। নির্ধারিত দিনে মওলানা ভাসানী সিরাজগঞ্জে এলেন। নির্ধারিত স্থানে তিনি জনসভা করলেন এবং পরদিন সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করলেন। কোথাও কোন রকম বিশৃংখলা হয়নি।

মিটিং শেষে রাত প্রায় ১২ টার সময় এক লোক আমার বাসায় এল চুপিসারে। বাইরে বেরিয়ে দেখি এই লোক অধ্যাপক আসাহাব উদ্দিন। কুমিল্লা কলেজে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। ইংরেজী পড়াতেন। দেখে অবশ্য বুঝলাম তিনি বাম

www.pathagar.com

রাজনীতিতে যোগ দিয়ে মওলানার শিষ্যত্ব নিয়েছেন। অবাক করার জন্য গায়ে চাদর জড়িয়ে এসেছেন। বললাম, 'এত রাতে– ব্যাপার কি?' বললেন, 'মওলানা সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন সালাম জানাতে।' বললাম, 'দোয়া করতে বলবেন। মওলানাকেও আমার সালাম জানাবেন।' তিনি আরো জানালেন, 'মওলানা সাহেব আপনার আইন-শৃংখলা রক্ষার পদ্ধতিতে খুব খুশী হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।' তাঁকে বললাম, 'মওলানা সাহেবকে বলবেন, বাই ইলেকশনে সকল দলের সভাতেই শৃংখলা এভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে। তিনি যেন তাঁর অনুসারীদের বলে দেন যে, তাদের সভা যেভাবে সুষ্ঠু উপায়ে সম্পন্ন হয়েছে অন্য দলের সভাও যেন সেভাবে হয়। অন্যথায় তাঁকে হয় তো পরবর্তীতে সালামের পরিবর্তে বদদোয়া পাঠাতে হবে।'

প্রাক্তন সহকর্মীকে পেলাম এক ঘন্টার জন্য– তাও আবার মধ্যরাতে। যাহোক, একপেট খাইয়ে তাঁকে বিদায় করলাম। যাবার কালে বললেন, 'মওলানা সাহেব বলে দিয়েছিলেন সবার অলক্ষ্যে যেন দেখা করি। কারণ হাজার হলেও এসডিও সরকারী অফিসার। একজন কম্যুনিস্ট তাঁর বাসায় গেলে বাচ্চা এসডিও বিপদে পড়তে পারে। তাই এই মধ্যরাতে আসা।'

এবার আসছেন স্বয়ং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। সিরাজগঞ্জ শহর বেশ গরম হয়ে উঠেছে। তাঁর আসবার সপ্তাহখানেক আগে থেকেই প্রাদেশিক মন্ত্রীরা আসা-যাওয়া করছেন। একদিন এলেন প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আসার আগে মাদারীপুরের এসডিও জানালেন যে, শেখ মুজিব তাঁর মহকুমা থেকে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছেন। তিনি এসডিওর সরকারী লঞ্চে দলীয় পতাকা ওড়িয়ে সফর করার এক বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে। আমি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের জানিয়ে দিলাম যে, তিনি এখানে ঐ জাতীয় কোন কিছু করলে অসুবিধা হবে। যা করবেন তা যেন ভেবে-চিন্তে করেন। আমাকে যেন দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়। শেখ সাহেবের জনসভা হল মামুলি গোছের। একদিন বিকেলে এসে পরদিন ভোরে মহকুমা ছেড়ে চলে গেলেন। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এবার খাদ্যমন্ত্রী মনসুর আলী এলেন। এদিকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সিরাজগঞ্জ আসার আর মাত্র ৪/৫ দিন বাকী। খাদ্যমন্ত্রীর নিজের এলাকা, স্বাভাবিকভাবেই তিনি খুব ব্যস্ত। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ সাহেবও খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গেএসেছেন।

www.pathagar.com

তর্কবাগীশ সাহেব আমার সাথে অমায়িক ব্যবহার করলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমার কানে ফিস ফিস করে বললেন, 'এসডিও সাহেব, সলঙ্গা থানার ওসিকে একটু ডেকে আমার প্রতিবেশীদের ধমকিয়ে দেবার জন্য বলবেন। প্রতিবেশীরা আমাকে বেশ বিরক্ত করে থাকে। ওসিকে সিরাজগঞ্জ ডেকে এনে ভাল করে বলে দিবেন কিন্তু।' বললাম, 'থানায় এজহার দেন না কেন?' তিনি বললেন, 'দেখুন, এজহার দিলে নানা ঝামেলা। ওরা আরো অনিষ্ট করবে। তারচেয়ে পুলিশ দিয়ে শাসিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে।' জবাবে জানালাম, 'কোন অভিযোগ ছাড়াই নাহক একজনকে পুলিশ দিয়ে ধমক দিতে যাব কেন?'

এদিকে আওয়ামী লীগ লিখিত আবেদন করেছে, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সভায় ন্যাপ গোলমাল করতে পারে। এমনকি স্টেশন থেকে আসার পথে তাঁর প্রতি পচা ডিম ছোঁড়া হবে এবং তাঁকে কাল পতাকা দেখান হবে। সুতরাং স্থানীয় প্রশাসন যেন এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। মনে হয় আগেভাগে প্রশাসনকে একটু বেকায়দায় ও চাপের মধ্যে রাখার জন্যই তারা এ কাজটি করল।

গোয়েন্দা খবরে জানা গেল যে, আওয়ামীরা সভায় লাঠি-সোটা নিয়ে যাবে- যদি প্রতিপক্ষ কোন বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে। ন্যাপও সম্ভবত পথে-ঘাটে কোথাও কোথাও কাল পতাকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে।

সবদিক বিচার-বিবেচনা করে এসডিপিওর সঙ্গে পরামর্শ করে শহরে সিআরপিসির ১৪৪ ধারার অধীনে আদেশ জারি করলাম যে, কোন ব্যক্তি শহরে এক সপ্তাহের জন্য কোন সভা বা মিছিলে অস্ত্র-শস্ত্র, লাঠি বা অন্যকে আঘাত করার মত বা ছুঁড়ে দেবার মত কোন বস্তু বহন করতে পারবে না। মহকুমা প্রচার অফিসারকে প্রচারের জন্য দেওয়া হল। পুলিশকে কড়াকড়িভাবে আদেশ জারি করার জন্য বলা হল। এই আদেশ মাইকে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শহরে উত্তেজনা চরমে উঠল।

আমি আদেশনামায় সই করে এসডিপিওকে সাথে নিয়ে মফস্বলের আর একটি সভাস্থল সরেজমিনে দেখতে গেলাম। সন্ধ্যায় শহরে ফিরে এসেই শুনলাম খাদ্যমন্ত্রী পাবলিসিটি অফিসারের মাইক কেড়ে নিয়ে তাঁকে রাস্তার উপর নানা গালিগালাজ করেছেন। শহরে তাঁর দলের কর্মীরা উচ্ছৃংখল আচরণ শুরু করে দিয়েছে।

ডাকবাংলোর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'মন্ত্রী সাহেব কোথায়?' জবাব পেলাম, 'একটু দূরে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন।' বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পর তাঁর জিপ এল। তিনি আমাকে দেখে প্রায় উন্মাদের মত জিপ থেকে নেমে এলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'এসডিও সাহেব, আপনি ১৪৪ ধারা

www.pathagar.com

জারি করে সব পন্ড করে দিয়েছেন, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের মিটিং বন্ধ করে দিলেন ইত্যাদি।' বললাম, 'আপনি একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর কাজে বাধা দিয়ে গুরুতর অপরাধ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে মাইক ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তাঁকে জনসমক্ষে হেনস্থা করেছেন- এর জবাব আগে দিন।' বললেন, 'হ্যাঁ করেছি এবং এ জন্য গ্রেফতার হলে আমিই প্রথম গ্রেফতার হব'- বলে দু'বাহু উর্ধে তুলে ধরলেন। এসডিপিওকে বললাম, 'আমি মহকুমা হাকিম হিসেবে এই অপরাধের কগনিজেন্স নিলাম এবং মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হোক।' এসডিপিও বেচারা হতচকিত বললাম, 'কোন দেরী নয়, এখনই কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নিয়ে যান।'

দু'বার চিৎকার করে বলার পর এসডিপিও পুলিশকে এগিয়ে আসতে বললেন। মন্ত্রী বেকায়দা দেখে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'এসডিও সাহেব, আপনি ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন তাই আমার রাগ হয়েছিল এবং আমি রাগের মাথায় এ কাজ করেছি।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, এ কাজের জন্য আপনার বিচার হবে আইন মোতাবেক। মন্ত্রীসহ কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।' মন্ত্রী আরো নরম হয়ে গেলেন। বললেন, 'সত্যি আমাকে হাজতে যেতে হবে?' বললাম, 'নিঃসন্দেহে এবং এক্ষুণি।'

মন্ত্রীর কাহিল অবস্থা দেখে বললাম, 'আপনি আমার পাবলিসিটি অফিসারকে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে বলুন যে, সে আপনার ছোট ভাইয়ের মত; হঠাৎ রাগের মাথায় একটা কাজ করে ফেলেছেন বলে সে যেন কিছু মনে না করে। এটা ডাকবাংলোর কামরার ভেতরে ওকে নিয়ে গিয়ে করলেও চলবে। তা হলেই আমি আমার আদেশ তুলে নেব। নচেত নয়। মন্ত্রী সাহেব রাজি হলেন এবং যেমন বলা তেমনি করেও, ফেললেন।

সবাইকে বিদায় করে মন্ত্রী, এসডিপিও আর আমি একত্রে বসলাম। মন্ত্রী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি আদেশটি দেখেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যা, দেখেছি।' জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়েছেন?' মন্ত্রী সাহেব বললেন, 'পড়েছি।' আমি বললাম, 'আপনি পড়েননি। পড়লে এই ছেলেমানুষি করতেন না। আপনি তো একজন এ্যাডভোকেট। আবার পড়ে দেখুন'-বলে বাংলা ও ইংরেজী দু'টো কপি তাঁর হাতে দিলাম। পড়লেন। চেহারায় ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। বললেন, '১৪৪ ধারা দেখেই আমি ভেবেছি জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আমার ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো মনে করবে জনসমাবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন কি করব?'

www.pathagar.com

বললাম, 'এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই, কারণ মানুষকে বলা হচ্ছে যে সভা-সমিতিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে না যেতে। এখন এই সরল কথাটার যদি কেউ অর্থ করে যে কর্তৃপক্ষ সভা অনুষ্ঠানই বন্ধ করে দিয়েছেন-আমি কি করতে পারি?'

নির্ধারিত দিনে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এলেন। প্রথমে গ্রামের জনসভায় গেলেন। সভাস্থলের প্রায় সিকি মাইল দূরে আমি জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর মিছিলটি অন্যদিক থেকে আসছে দেখে। হঠাৎ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জিপ আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি জিপ থেকে নেমে কয়েক কদম হেঁটে আমার দিকে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি করমর্দন করলাম। তিনি আমার হাত এক হাতে ধরে অন্য হাত আমার কাঁধের উপর রেখে ইংরেজীতে বললেন, 'আর ইউ দ্য এসডিও?' আমি জবাবে বললাম, 'ইয়েস স্যার'। তিনি বললেন, 'আই এ্যাম তেরি প্লিজড টু সি ইওর সেন্স অব নিউট্যালিটি। আই হোপ ইউ উইল বি এব্‌ল টু কিপ ইট আপ। আই এ্যাপরিশিয়েট অল দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান সোফার।' আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তাঁর সঙ্গে কয়েক কদম হেঁটে তাঁকে জিপে পৌঁছিয়ে হাত নেড়ে খোদা হাফেজ বললাম। দেখলাম তাঁর সাথীরা সব নির্বাক।

বিকেলে শহরে ফিরে এলাম। শহরে বিশাল জনসভা হল। কোথাও কোন বিশৃংখলার নামমাত্র নেই। শান্তির মধ্য দিয়ে সব সম্পন্ন হল। আমিও শান্তির সাথে ঘুমোলাম।

পরীক্ষা কিন্তু শেষ হল না। খাদ্যমন্ত্রী ও মওলানা তর্কবাগীশ পরদিন ঢাকা গেলেন। যাবার আগে মন্ত্রী মওলানার সেই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলেন। আমি আমার অক্ষমতা জানালাম। অপরাধীকে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। কিন্তু বিনা কারণে একজন ভদ্রলোককে পুলিশ দিয়ে ধমকাতে পারব না। মওলানা সাহেবের প্রতিবেশী তো আর চোর- ডাকাত নয়।

পরে তাঁরা ঠিক করলেন, এসডিপিওকে দিয়ে সলঙ্গার দারোগাকে ডেকে এনে মন্ত্রী নিজেই যা বলার বলবেন।

এবার প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সিরাজগঞ্জ সফরের পালা। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে পাবনা থেকে ডিএম-এসপি এঁরা সবাই এলেন। সকলে মিলে আমরা সিরাজগঞ্জ ঘাটে গেলাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। ফেরি-স্টিমারে উঠে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম আমরা। তাঁর সঙ্গে মওলানা তর্কবাগীশ ও আবুল মনসুর সাহেব এসেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হাত মেলালেন ডিএম, এসপি এবং এসডিওর সঙ্গে। মনে হল প্রচন্ড অনীহার সাথে, মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে। ডিএম সাহেব তাঁর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

ছিলেন। তাঁকে আস্তে করে বললাম, 'স্যার, আমরা বরং ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়াই। বাতাস খাওয়া যাবে এবং রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁর আরো কাছে যাবার সুযোগ পাবে। আমরা অর্থাৎ অফিসাররা ডেকের রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়ালাম। ডিএম সাহেব বললেন, মন্ত্রী তো আমাদের উপস্থিতি পছন্দ করছেন না মনে হয়। বুঝলাম, এটা আমার কারণেই হবে। ঠিক এই সময় আমার ডাক পড়ল, মুখ্যমন্ত্রী সাহেব এসডিওকে ডেকেছেন। মনে মনে বললাম, এসডিওকে ডাকতেই হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সামনে হাজির হলাম। তিনি আবুল মনসুর সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি জিজ্ঞেস করুন।' মনসুর সাহেব বললেন, 'মওলানা সাহেব জিজ্ঞেস করুন।' আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মওলানা সাহেব বললেন, 'এসডিও সাহেব, মুখ্যমন্ত্রী সাহেব জানতে চাচ্ছেন, বাই-ইলেকশনে আমাদের অবস্থা কি?' সবিনয়ে বললাম, 'স্যার সেটা তো আমার জানার কথা নয়। আমি আইন-শৃংখলার তদারকির জন্য আছি। আর দু'চার দিনের মধ্যেই ইলেকশন হবে। এ সময় আমার মতামত রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দেওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া বিষয়টিকে আমি ঐ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখিনি।' আড়চোখে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের মুখমন্ডলে ভাবান্তর। এবার আবুল মনসুর সাহেব আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসিয়ে বললেন, 'না না, আপনার ব্যক্তিগত ধারণাটাই আমরা জানতে চাচ্ছি; মানে আওয়ামী লীগের অবস্থা কি-জিতবে তো?' আমার একই কথা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললাম, 'আমি এই অবস্থায় কোন মতামত দিতে পারি না, উচিত হবে না আমার।' সিরাজগঞ্জ এলাম সবাই ট্রেনযোগে। স্টেশন থেকে জিপে ডাকবাংলোয়। এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে যথাযথ সালাম পেশ করে বললাম, 'স্যার, আপনি তো আপনার দলের মিটিং করতে যাচ্ছেন- আমার কি আপনার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে?' তিনি বললেন, 'না, আপনাদের যাওয়ার দরকার নেই।' বললাম, 'যে রাস্তা দিয়ে সভাস্থলে আপনাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে দলীয় কর্মীরা সে রাস্তায় জিপ চলবে না, বিশেষ করে নদী পেরুবার কোন ব্যবস্থা নেই।' জবাবে তিনি বললেন, 'ওরা যে রাস্তায় নেয় আমি সেই রাস্তাতেই যাব। আপনাদের ভাববার কোন দরকার নেই।'

তবুও একজন সার্কেল অফিসারকে যেতে বললাম যদি কোন প্রয়োজন পড়ে, সেজন্য। সারারাত মন্ত্রী ফিরলেন না। স্বাভাবিক কারণে দুশ্চিন্তা হল। সকাল আটটার দিকে তিনি সিরাজগঞ্জ ফিরলেন। সার্কেল অফিসারের কাছ থেকে শুনলাম, জনসভা শেষ হতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল। লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে করতে নয়টা বেজে যায়। এরপর সকলে রওয়ানা হলেন সিরাজগঞ্জের দিকে। কিন্তু নদীতে খুব একটা পানি না থাকায় সরাসরি জিপ চালিয়ে আসার সময় জিপের ইঞ্জিনে পানি ঢুকে মাঝপথে থেমে যায়। মহা বিভ্রাট। নৌকা চলার মত পানি নেই নদীতে। বহু কষ্টে কোন

www.pathagar.com

রকমে হেঁটে অপর পাড়ে এসে গ্রামের লোকজনকে ডাকাডাকি করায় কিছু লোক নদীর ধারে এল ঠিকই কিন্তু মন্ত্রীর জিপ ঠেলে পাড়ে উঠাতে রাজি হল না। উপরন্তু তারা মন্তব্য করল এসডিওর জিপ হলে মাথায় করে নিয়ে আসতাম। ইলেকশনের সময় কত মন্ত্রী আসা-যাওয়া করে আর ইলেকশন হয়ে গেলে তাঁদের পাত্তা থাকে না। শীতের রাতে আমাদের কি গরজ পড়েছে। মন্ত্রী এক রাত থাকুন এখানে। আমরা কেমন থাকি দেখুন তিনি..... ইত্যাদি। জিজ্ঞেস করলাম, মন্ত্রীর খাওয়া-দাওয়ার খবর কি? সার্কেল অফিসার জানালেন যে, তিনি নিজে গ্রাম থেকে কিছু মুড়ি-চিড়ে আর মুড়কির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর সঙ্গে তো অনেক লোক- কে কে সেগুলো খেয়েছেন তা তিনি জানেন না। যা হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রী ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন হয়ে গেল। ট্রেজারি বিল্ডিং-এর এক কামরায় ব্যালট বাক্স জমা করা হয়। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হল রাতের জন্য। মাঝে-মাঝে আমি নিজেও সেখানে চক্কর লাগালাম যাতে কোন অঘটন না ঘটে।

সকাল আটটা থেকে ভোট গণনা শুরু হল। হঠাৎ কাছের এক ব্যাংক ম্যানেজার এসে খবর দিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী সাহেব ফোনে এসডিওকে চাচ্ছেন। বললাম, ভোট গণনা হচ্ছে। এ সময় এ জায়গা ছেড়ে আমার কোথাও যাওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে অযথা পরাজিত দলকে হৈ-চৈ-এর সুযোগ করে দেওয়া হবে। আবার এক ঘন্টা পর একই রকম তলব আসল। এবারও এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু আরো এক ঘন্টা পর যে তলব আসল সেটা একটু গরম। ততক্ষণে অবশ্য গণনা প্রায় শেষ। গণনাকারী এবং তাদের তদন্তকারীরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদের কাজ করছিল। উভয় দলের এজেন্টদের সতর্ক দৃষ্টি রাখার কথা বলে ব্যাংকে গেলাম ফোন ধরতে। মন্ত্রী সাহেব জানতে চাইলেন, 'ফলাফল কি?' বললাম, 'আর ঘন্টা দু'য়ের মধ্যেই জানান সম্ভব হবে।' তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'এ পর্যন্ত যা গণনা হয়েছে তাতে আপনি কি মনে করেন।' বললাম, 'স্যার, আমি রিটার্নিং অফিসার হয়ে গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলতে পারব না'। তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, 'আপনি আমাকে কোন আইডিয়া দিতে পারেন না?' বললাম, 'না, কাউকেই কোন আইডিয়া দিতে পারি না।' বলে টেলিফোন আমিই ছেড়ে দিলাম।

আমার ফোনের কথাবার্তা ব্যাংকের দু'-এক জন কর্মচারী নিশ্চয়ই আড়াল থেকে শুনে থাকবে। পরে জানতে পারলাম, লোকজন বলাবলি করছে মুখ্যমন্ত্রীকে এসডিও কোন কিছু জানাতে অস্বীকার করেছেন। এতে অবশ্য আমার লাভ হল। সাধারণ মানুষের আস্থা আমার সততার ওপর বাড়ল।

www.pathagar.com

আগেই উল্লেখ করেছি যে, সিরাজগঞ্জে একটি ডিগ্রী কলেজ আছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ চান এখানে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হোক। সরকারী অর্থে এ কাজ করান প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বহু সময় আর কাঠখড়ির প্রয়োজন। সিরাজগঞ্জের একটি বড় এলাকার মানুষ মোটামুটি স্বচ্ছল। বিশেষ করে শাহজাদপুর, এনায়েতপুর, চৌহালির ঘরে ঘরে তাঁতের কাজ হয়। সুতার ব্যবসা তাঁতে বোনা কাপড়ের ব্যবসার চেয়ে আরো রমরমা। মানুষ ইচ্ছে করলে জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করতে পারে। এদিকে কলেজের অধ্যক্ষের পদটি খালি। নানা দেন-দরবার চলছিল পদটি পূরণের ব্যাপার নিয়ে। ডক্টর হিলালী সিরাজগঞ্জের লোক। পন্ডিত হিসেবে খ্যাতি আছে সারা প্রদেশে। তাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টেজারার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি সেখানে যাবেন যাবেন করছেন। তাঁকে ধরলাম। নিজের জায়গায় একটি ডিগ্রী কলেজে তাঁর অনেক প্রয়োজন। কলেজটিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে গেলে মৃত্যুর পরও তিনি বেঁচে থাকবেন মানুষের মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আগে এবং পরে টেজারার ছিলেন এবং থাকবেন। কিন্তু তাঁর মত খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত ব্যক্তি কলেজের কর্ণধার হয়ে যেটা দিয়ে যাবেন, তাঁর এলাকার মানুষ যুগ যুগ ধরে সেটা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। এসব কথা বলে এবং অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডক্টর হিলালীকে প্রিন্সিপাল হবার জন্য রাজি করালাম। কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে নিয়ে এনায়েতপুরের পীর সাহেবের কাছে যাবার ব্যবস্থা করলাম। এনায়েতপুরের পীর সাহেবের ভক্তের সংখ্যা মোটামুটি কম নয়। ভাবলাম, পীর সাহেবের গদিনশীন যিনি আছেন তিনি যদি বার্ষিক ওরশ শরীফে তাঁর মুরিদানদের কলেজে একটু সাহায্য করার কথাটা বলে দেন, তবে বিজ্ঞান শাখা খোলার কাজটা সহজ হয়ে যায়।

ডক্টর হিলালীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলাম একদিন সকালে। যাবার আগে তাঁকে বললাম যে, সারাদিন রোজা রাখতে হতে পারে। তৈরী হয়ে যেতে হবে কিন্তু। তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'দেখা যাক। যদি তাই হয় তাতে অসুবিধা হবে না।'

এনায়েতপুরে পৌঁছেই মরহুম পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করলাম আমরা। তারপর বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। আমাদের জন্য ওযুর পানি, শরবত ও নাস্তার হুকুম দিলেন গদিনশীন পীর সাহেব। মরহুম পীর সাহেবের ছেলে তিনি। আমরা অতি বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বললাম। তিনি জবাবে বললেন, 'এটা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর মুরিদানদের সাহায্যের কথা বলতে পারবেন না।' বললাম, 'আসন্ন ওরশের সালামী থেকে কলেজের জন্য কিছু দান করুন, আমরা বিজ্ঞান শাখার ভবনটি পীর সাহেবের নামেই উৎসর্গ করে দেব।' তিনি তাতেও রাজি নন। আমাদের কয়েক ঘন্টার চেষ্টা ব্যর্থ হল, তাঁকে বোঝান গেল না।

www.pathagar.com

দুপুর গড়িয়ে গেছে। পীর সাহেব আমাদের খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমারও জিদ চেপে গেল। বললাম, 'সে হয় না। আপনাকে আমরা একটা মহৎ কাজে শরীক করার জন্য এত সময় যাবত অনুরোধ-উপরোধ করেই যাচ্ছি আর আপনি আমাদের কোন কথাই মানছেন না। কিভাবে আমরা আপনার মেহমান হতে পারি?' শেষমেশ তাঁকে বললাম, 'ঠিক আছে, আমরা ওরশের দিন আসব এবং আপনি মেহেরবানি করে আপনার ওয়াজ মাহফিলে আমাদের পাঁচ-সাত মিনিট কলেজের সাহায্যের জন্য আবেদন করে কিছু বলার সুযোগ দেবেন।' তিনি তাতেও রাজি নন। মনে মনে খুবই বিরক্ত হলাম। বললাম, 'মুরিদানের সালামীর ওপর কোন ট্যাক্স নেই-এটা সত্য, কিন্তু আপনাদের পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির নামে যে সুতার লাইসেন্স রয়েছে সেই সুতার ব্যবহারের জন্য কোন কারখানাতো দেখছি না এখানে। সে সুতা যায় কোথায়? নিশ্চয় অবৈধভাবে অন্যের কাছে যায় অর্থের বিনিময়ে।'

ভেবেছিলাম এই দাওয়ায় কাজ হবে। কিন্তু না, একজন এসডিওকে পরওয়া করার প্রয়োজন নেই পীর সাহেবের। ঢাকা এবং পাবনায় তাঁর মুরিদদের মধ্যে এমন অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা এই ফুচকা এসডিওকে মুহূর্তে সরিয়ে দিতে পারেন।

এ সব করতে করতে বেলা চারটা বেজে গেল। এসেছিলাম বারটার দিকে। পেটে কিছুই পড়েনি। দু'জনেরই প্রচন্ড ক্ষিধে। অনেকটা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে জিপে উঠলাম ফিরে যাব নিয়ত করে। কয়েকশ' গজ চলার পর আমাদের পেছনে লোক ছুটে এল আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, স্বয়ং গদিনশীন পীর সাহেবের নির্দেশে। মনে মনে খুশী হলাম এই ভেবে যে এবার আমাদের কাজ হবে। ফিরে এলাম, কিন্তু না, কোন খোশখবর নেই। তিনি আমাদের কিছু মুখে দিয়ে যাবার জন্য শেষ অনুরোধ করলেন মাত্র। আমাদের আবেদন বিবেচনা করতে তখনো তিনি গররাজি; আমিও মরিয়া হয়ে ওঠেছি। দৃঢ় কণ্ঠে তাঁকে বললাম, 'কোন কনজুশের বাড়ী আমি দাওয়াত খাই না।' ঠিক এই সময় ভীড়ের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি করজোড়ে জিপের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'হুজুর, আমি গরীব মানুষ। আমার কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধূলা দিলে খুব খুশী হব। হুজুরদের একটু চা-নাস্তা খেত দেব। আমি দুপুর থেকে এখানেই আছি। হুজুরদের সারাদিন খাওয়া হয়নি। অথচ পীর সাহেব খাসি জবাই করিয়েছিলেন আপনাদের জন্য।'

বললাম, 'কত টাকা দেবেন কলেজের জন্য?' বলল, 'হুজুর, আমি খানা খাওয়াতে পারব না। সামান্য চা-নাস্তা খাওয়াতে পারব, ইনশাল্লাহ। আর কলেজে টাকা? আমি দুই হাজার টাকা দিব।' বললাম 'এখন দেবেন?' তাঁর জবাব, 'হ্যাঁ হুজুর, আগে টাকা দিব তারপর চা-নাস্তা।' আনন্দের সাথে উচ্চারণ করলাম, 'আল হামদুলিল্লাহ'।

www.pathagar.com

আমরা পাশের গ্রামে তাঁর বাড়ী গেলাম। তিনি খুব খুশী। পীর সাহেব যে এসডিওকে চা পর্যন্ত খাওয়াতে পারেননি তিনি এখন তাঁদের চা-নাস্তা খাওয়াবেন।

সামাজিকভাবে এটা তাঁর একটা বিরাট বিজয় মনে করে ভদ্রলোক কি যে করবেন, ঠিক করতে পারছিলেন না। তবে তিনি কথামত দু'হাজার টাকা গুনে আমাদের সামনে রাখলেন। ডক্টর হিলালী তাঁকে যথারীতি একটা রশিদ লিখে দিয়ে টাকাটা নিলেন। এরপর চা-নাস্তা এল। তিনি এত খুশী হয়েছেন যে, খুশীর আতিশয্যে তিনি আমাদের দু'জনার চায়ের কাপে দু'ফোটা আতর ঢেলে দিলেন। তাঁর ধারণা এতে চা খোশবুদার হবে। ডক্টর হিলালী সংগোপনে জানালেন, আতর দেওয়ায় চা তিতা হয়ে গেছে। তাঁকে চুপে চুপে বললাম, 'বিষ হলেও খেতে হবে, উপায় নেই গোলাম হোসেন, উপায় নেই।'

বিষ মনে করেই আতর দেওয়া চা খেয়ে মেজবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং গ্রামে তাঁর যেন একটা বিশেষ সম্মানের আসন হয় সে ব্যবস্থা করে সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীরে সিরাজগঞ্জ ফিরে এলাম। দ্বীনের দিকপালরা দুনিয়ার ব্যাপারে কত যে কঠিন তাই রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

দু'হাজার টাকায় নিশ্চয়ই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা যায়নি, তবে সিরাজগঞ্জ শহরে সবিস্তারে ঘটনাটা প্রচার করতে কসুর করিনি। আজ এই পরিণত বয়সেও পীর সাহেবদের অর্থের মোহ যে কত প্রচন্ড তা ভেবে হয়রান হয়ে যাই।

কেন্দ্রীয় ইলেকশন কমিশন ইলেকশন অফিসের জন্য সিরাজগঞ্জে একটি বাড়ী রিকুইজিশন করার ব্যাপারে পাবনা জেলা ম্যাজিস্টেটকে অনুরোধ করেছেন। জেলা ম্যাজিস্টেট সাহেব এসডিওকে একটা বাড়ী খোঁজ করতে বললেন। পাবনার জেলা ইলেকশন অফিসার এলেন সিরাজগঞ্জে। শহরের সম্ভাব্য বাড়ীগুলোর মধ্যে প্রধান রাস্তার উপর একটি দোতলা বড়সড় বাড়ী পছন্দ করা হল। বাড়ীর মালিক এক মারোয়াড়ী, নাম সারদা। প্রভাবশালী পাট ব্যবসায়ী। বাড়ীটিতে বলতে গেলে কেউই থাকে না। শুধু সারদার মা থাকেন চাকর-বাকর নিয়ে। আর তাঁর ছেলেরা কলকাতা থেকে এক-আধ দিনের জন্য এলে বাড়ীতে থাকে। বাড়ীতে একটি পূজা ঘরও আছে। পাটের অফিস অন্যখানে। ইলেকশন অফিসার মহকুমা কানুনগোর কাছ থেকে বাড়ীর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন। আমিও আনুষ্ঠানিকভাবে কালেক্টর সাহেবকে বাড়ীটি হুকুম দখল করার প্রস্তাব পাঠালাম। কালেক্টর সাহেব যথারীতি রিকুইজিশন পরওয়ানা পাঠিয়ে দখল নেবার আদেশ করলেন।

ইতিমধ্যে জোর তদবির শুরু হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে সারদা মহাশয় এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'এ বাড়ীটি ছেড়ে দিতে হবে'। জবাবে আমরা

www.pathagar.com

জানালাম যে, 'আপনার মায়ের থাকার কোন অসুবিধা হবে না। তাঁকে একটা অংশে রেখেই সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সামনের অংশ সরকার নিতে পারেন। পূজা এবং মায়ের কারোরই কোন অসুবিধা হবে না।'

তিনি রাজি নন এ প্রস্তাবে। তাঁকে বললাম, 'তবে আপনার পাটের গুদামগুলোর একটা ছেড়ে দিন। আমি কালেক্টর সাহেবকে বাড়ীর পরিবর্তে গুদাম রিকুইজিশন করতে বলব। এটাও তাঁর কাছে গ্রহণীয় হল না। ঢাকা থেকে খাদ্যমন্ত্রী ও মওলানা তর্কবাগীশ সাহেব ফোনে জানালেন, আমরা যেন সারদার বাড়ীতে হাত না দেই। সিরাজগঞ্জে এসডিও'র অফিস পাটের গুদামে, ইলেকশন অফিসের জন্য বাড়ী পাব কোথায়-সে কথা কেউ বুঝতে চায় না। তাঁদের জানালাম, আমি রিকুইজিশনের মালিক নই। এসডিও হিসেবে সে কাজের ক্ষমতাও আমার নেই। সুতরাং কথাটা পাবনার কালেক্টরকেই জানান উচিত।

সন্ধ্যায় তর্কবাগীশ সাহেব ঢাকা থেকে সশরীরে সিরাজগঞ্জ চলে এলেন। তিনি আমাকে বাড়ীটি ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। আমি আবারো মওলানাকে জানালাম যে, বাড়ী রিকুইজিশন ও ছাড়ার মালিক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেব, এসডিও নয়। আমার কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে।

রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। সারাদিন মফস্বল ট্যুর করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরেছিলাম। রাত দেড়টার দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে ফোনের আওয়াজ পেলাম। অফিস রুমে ফোন বেজে চলেছে। কিন্তু ক্লান্তির কারণে উঠতে পারছিলাম না।

অফিস কামরার বারান্দায় আমার বাবুর্চি ঘুমাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম অবশেষে সে ফোন ধরেছে। সে কি কি বলছিল, সব স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না। তবে তার উত্তেজিত কণ্ঠের শেষের ক'টি কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'প্রধানমন্ত্রী তো কি হয়েছে। আমি আমার সাহেবকে এত রাতে উঠাতে পারব না। আপনি নিজে রাসকেল। আমাকে ইংরেজীতে গালি দিয়ে বেটা কি-না বলে সে প্রধানমন্ত্রী -হুঁ হুঁ।'

বুঝতে পারলাম একটা গন্ডগোল লেগে গেছে। উঠে তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে গিয়ে দেখি বাবুর্চি লাইন ছেড়ে দিয়েছে এবং রাগে গজ গজ করছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ফোন করেছিল?'

বলল, 'বেটা বলে সে নাকি প্রধানমন্ত্রী। আপনাকে ঘুম থেকে তুলতে বলে। আমি বললাম, আমার সাহেবকে এ সময় ঘুম থেকে তুলতে গেলে আমার চাকরিটাই যাবে। আপনি তো এই কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছেন, আপনাকে তুলি কেমনে? কিন্তু সে বেটা কিছুই শুনতে চায় না, বলে আমি প্রধানমন্ত্রী। আমাকে ইংরেজীতে গালিও দিয়েছে।'

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি গাল দিয়েছে?' সে বলল, 'স্যার, আমাকে রাসকেল বলেছে, ঐ বেটাই রাসকেল। যে লোক রাত দেড়টায় ফোন করে কারো ঘুম ভাঙ্গাতে বলে সে লোক ভাল নয় স্যার।'

আমার বাবুর্চি বরাবরই একটু ক্ষ্যাপা টাইপের লোক কিন্তু বিশ্বস্ত। তাকে মাসে বিশ টাকা মাইনে দেই। সে ক্ষেপে গেলে দু-চারটে অশুদ্ধ ইংরেজী শব্দ বলে বসে। আমার এবং আমার পরিবারের সবার জন্য তার খুব মায়া এবং চিন্তা।

বুঝতে পারছিলাম, মামলা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। টেলিফোন একচেঞ্জে ফোন করলাম। জবাব এল, 'স্যার, আপনার নাইটগার্ড খুবই বেআদবি করেছে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে। আপনাকে তো ডেকে দেয়ইনি অধিকন্তু মন্ত্রীকে গালাগাল করেছে।' ভাবলাম, এখন ফোন করে মুখ্যমন্ত্রীর রাগ বাড়িয়ে লাভ নেই। ঘুমোতে গেলাম।

সকাল সাড়ে ছ'টায় আবার ফোন। ধরলাম। -'আমি আতাউর রহমান খান, চিফ মিনিস্টার বলছি।' বললাম, 'আসসালামু আলাইকুম, স্যার।' -'দেখুন, কাল রাতে আপনার ওখানে কে ফোন ধরেছিল?' বললাম, 'আমার বাবুর্চি, স্যার।' -'ওকে ডিসমিস করে দিন, এক্ষুণি।' বললাম, 'অপরাধটা করেছে কি স্যার?' -'অপরাধ! ও একটা আস্ত পাগল, জানোয়ার। আমাকে বলে রাসকেল। ওকে এখনি বিদেয় করে আমাকে রিপোর্ট করবেন। আর সারদার বাড়ীটা এক্ষুণি ডিরিকুইজিশন করবেন। এটা আমার অর্ডার, বুঝেছেন?' আমি জবাবে বললাম, 'স্যার, রাতের লোকটা সরকারী কর্মচারী নয়। সে আমার বিশ টাকা মাইনের ব্যক্তিগত চাকর। সে রাত দেড়টায় আমার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে আমার মহা উপকার করেছে। তার চাকরিচ্যুত হবার কোনই কারণ ঘটেনি। বরং আজ থেকে আমি তার মাইনে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেব। কারণ আপনার ধমক খেয়েও সে তার কর্তব্যে অটল ছিল। আর আপনি শুনেছি পেশায় একজন এডভোকেট। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, এসডিওর রিকুইজিশন বা ডিরিকুইজিশন- কোনটাই করার ক্ষমতা নেই। আমার সন্দেহ হয় আপনি আদৌ চিফ মিনিস্টার আতাউর রহমান খান এই মুহূর্তে আমার সাথে কথা বলছেন কি-না?' খান সাহেব আমার কথায় ভীষণ চটে গেলেন। একজন এসডিওর কাছ থেকে এমন কড়া কথা নিশ্চয়ই আশা করেননি। বললেন, 'আপনি বাড়ীর দখল নেবেন না।' তাঁর কথার মাঝখানে আবার আমি কথা বললাম, 'ফোনের এই আদেশকে আমি আদেশ বলে মনে করতে পারছি না। আর বাড়ীর বিষয়ে শুধুমাত্র ডিএম সাহেবের আদেশ মানতে আমি বাধ্য, অন্য কারো নয়।' তাঁর কথা থেকে বুঝলাম তিনি ফোনে ডিএম সাহেবকে পাচ্ছেন না। খুবই ক্রুদ্ধ অবস্থায় 'আচ্ছা' বলে চিফ মিনিস্টার ফোন রেখে দিলেন। মনে হল, ফোন সেটটিও বুঝতে পেরেছে কত ডিগ্রী উত্তাপে বাতচিত হচ্ছিল এতক্ষণ।

www.pathagar.com

এবার একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়। ভাবলাম আমাকে তো যেতেই হবে এখান থেকে, যাবার আগে একটু মজা করে যাওয়া যাক।

আমার ম্যাজিস্ট্রেটদের ডেকে বললাম, ডিএম সাহেব সদরে নেই। অর্থাৎ তিনি চান বাড়ীটির দখল নেবার পরই কেবল তাঁকে পাওয়া যাবে। সুতরাং আপনারা কাল ভোরে বাড়ী দখলের সব ব্যবস্থা করে নিন। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী জবর দখল করে নিতে হবে। তাঁদের একজন জানালেন, সারদা কিছু স্ত্রীলোক আমদানী করে বাড়ীর ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে যাতে পুলিশ প্রবেশ করতে না পারে।

শহরের এক প্রান্তে কতগুলো বিদেশী যাযাবর মেয়ে মানুষ তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করছে কয়েক দিন যাবত। এরা দিনের বেলা নানা রকম জিনিস ফেরি করে বেড়ায়। সিআরপিসি আইনে এসডিও স্পেশাল কনস্টেবল নিয়োগ করতে পারেন যে কোন ব্যক্তিকে জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য। সেই ক্ষমতা অনুসারে বারজন যাযাবর মহিলাকে স্পেশাল কনস্টেবল হিসেবে নিয়োগ করলাম এবং তাদের হাতে গুলিবিহীন বন্দুক তুলে দিয়ে পুলিশকে বললাম, সারদার বাড়ীর সামনে সন্ধ্যার আগে কয়েকবার এদের মার্চ করাতে।

যথাযথভাবে কাজ হল। কিন্তু পরদিন সকালে আর যাযাবর মহিলাদের প্রয়োজন হল না। খবর পেলাম রাতের অন্ধকারে সারদার আমদানী করা মেয়ে মানুষগুলো তার বৃদ্ধা মাসহ সরে পড়েছে। ভোর ছ'টায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট কিছু পুলিশসহ গিয়ে বাড়ীটি দখল নিয়েছে এবং পূজোর জায়গাটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দিয়েছে।

ঐ দিন শহরে একটু উত্তেজনা হল। সারদার মত ক্ষমতাধর ধনী ব্যক্তির বাড়ী এসডিও রিকুইজিশন করে নিয়েছে। অন্যদিকে সারদা হিন্দু, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার ভূত নাটোর থেকে আবার এখানে নাজিল হল। যা হোক, দ্বিতীয় দিন ডিএম সাহেব এলেন ইনকোয়ারী করতে। তিনি আমাকে সরাসরি আমার অফিসে চলে যেতে বলে এসপিসহ বাড়ীটি ইনকোয়ারী করতে গেলেন। দুপুরে ডাকবাংলোয় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি বললেন, 'আমি ওখানে বলে এসেছি যে, এসডিওকে সাসপেন্ড করার জন্য আমি সরকারকে বলব। কারণ তাঁকে সমগ্র বাড়ীটা কমপাউন্ডসহ দখল নিতে আদেশ করা হয়েছিল, অথচ এসডিও এই খানিকটা জায়গা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে বাদ রাখলেন কেন?' বললাম, 'ভালই করেছেন স্যার। শুনে খুশী হলাম যে, চিফ মিনিস্টারকে আর আমাকে সামলাতে হবে না। আমার ডিএম সাহেবই সে কাজটা সেরে নেবেন।' তিনি জানতে চাইলেন, আমি সত্যি সত্যি আমার বাবুর্চিকে ডিসমিস

www.pathagar.com

করে দিয়েছি নাকি? বললাম, 'না, তার মাইনে পাঁচ টাকা বাড়িয়েছি।' তিনি বললেন, 'তুমি বরং ওকে টানা পাখার জন্য পাখা-পুলার হিসেবে চাকরিতে নিয়োগ করে দাও।' বললাম, 'স্যার, এতে ও মাইনে কিছু বেশী পাবে নিশ্চয়ই কিন্তু চিফ মিনিস্টারের রাসকেলের জবাবে রাসকেল বলে চাকরিটা আর রাখতে পারবে না।'

সিরাজগঞ্জে আমার চাকরির ছ'মাস এই সব এক্সসাইটমেন্টেই কেটে গেল। মানুষের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে আমি রাতে ছদ্মবেশে শহরময় ঘুরে বেড়াই আর চোর-বদমাশদের ধরে ধরে শায়েস্তা করি।

আর একটা মজার ঘটনার কথা না বললেই নয়। হঠাৎ ডাক ও তার বিভাগ ধর্মঘট করে বসল। সরকার আমাদের জানালেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসারদের দিয়ে ধর্মঘটের সময় বিভাগটি চালু রাখতেই হবে। ধর্মঘটের দিন যথারীতি আনসাররা প্রধান পোস্ট অফিসে পজিশন নিল। পোস্টমাস্টার সাহেব তাঁর সিটে বসে আছেন কিন্তু কাজ করছেন না এবং আনসারদেরও তাঁর কামরায় ঢুকতে দিচ্ছেন না। খবর পেয়ে এসডিপিওসহ গেলাম সেখানে। জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কাজ করবেন কিনা? যদি না করেন তবে যেন কামরা ছেড়ে চলে যান। ভদ্রলোক রূঢ়ভাবে জবাব দিলেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, প্রাদেশিক সরকারের কোন নির্দেশ মানতে তিনি বাধ্য নন। ব্যাস, মাথায় আমার এক দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। দু'জন তাগড়া গোছের আনসারকে বললাম, দুদিক থেকে ধরে তাঁকে শূন্যে ওঠাতে এবং এডজুটেন্টকে নির্দেশ দিলাম ওরা ছেড়ে দিলে তিনি যদি মাটিতে পা রাখেন তবে পায়ে যেন ছড়ি মারা হয়; উনি কেন্দ্রীয় সরকারের লোক আর মাটিটা প্রাদেশিক সরকারের; সুতরাং ওকে শূন্যে ওপরেই থাকতে হবে, প্রদেশের মাটিতে পা রাখতে দেওয়া হবে না। আমার নির্দেশ পেয়ে এডজুটেন্ট ছড়ি হাতে এগিয়ে গেলেন। আমার মকসদ পূর্ণ হল, পোস্টমাস্টার সাহেব চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'স্যার, মাফ করে দিন, আমার ভুল হয়ে গেছে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রাদেশিক সরকারের এসডিওর নির্দেশ মানবেন তো এবার থেকে?' বিনীত জবাব এল, 'হ্যাঁ স্যার, একশ'বার মানব। যাচ্ছি হুজুর। না হুজুর, আমি ধর্মঘট করব না-কাজ করব।'

১৯৮২ সালে বগুড়া যাবার পথে একবার সিরাজগঞ্জে একটি রাত কাটাতে হয়েছিল। স্থানীয় এক মিলের রেস্টহাউজে উঠেছিলাম। রাত ১১টার দিকে বহুলোক খোঁজ পেয়ে হাজির ওখানে। দেখা করতে এসেছেন ওঁরা। ভাল লাগল। তাঁদের মুখেই শুনলাম আমি এখানে এসডিও থাকাকালীন সময়ে রাতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতাম।

www.pathagar.com

বদমাশদের শায়েস্তা করতাম। বললাম, 'আমি কখনই এ কাজ করিনি।' কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাঁরা সমস্বরে বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই এ কাজ করেছি।'

সিরাজগঞ্জে থাকাকালে একবার তাড়াশ থানায় গিয়ে একটা খোদাই করা কাল পাথরের নারীমূর্তি নিয়ে এসেছিলাম। সেটাকে আমার বাংলোর সামনে রেখে ঢাকা বা রাজশাহী জাদুঘরে স্থানান্তর করার জন্য লিখেছিলাম। কলকাতার স্টেটম্যান পত্রিকায় ঐ মূর্তির বিবরণ ও ছবি ছাপা হল। মূর্তিটি নাকি 'কমলে কামিনী' নামে কোন দেবতার এবং ঐ দেবতা নাকি শ্রীলংকায় পূজিত হয়ে থাকে। মূর্তিটি এখন হয়ত রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ামে আছে।

www.pathagar.com

গুড় ভর্তি সিন্ধুক

কুষ্টিয়া এলাম বদলি হয়ে জয়েন্ট কালেক্টর রেভিনিউ হিসেবে। রেভিনিউ মানেই তহশিলদারদের জুলুম, এর জমি ওর নামে দাখিলা কাটা, ইজারাদারদের সাথে বন্দবস্ত করা ইত্যাদি। রেভিনিউ-এর কাজকর্ম সরকার কিভাবে সংগটিত করতে চান তার কোন নীতিমালা নেই। ডিএম সাহেব তাঁর একজন অতিরিক্ত সহকারী পেয়ে তাঁর সাধারণ কাজের দায়-দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন। আমিও এটা খুব অপছন্দ করলাম না। হাজার হলেও এসডিও সাহেবদের ওপর এক- আধটু মাতব্বরি করা যাবে তো।

এখানে প্রায় প্রত্যেকটি তহশিল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। জিপ আছে। প্রায়ই ডিএম সাহেব আর আমি একই সঙ্গে ট্যুরে যেতাম, কখন কখন জেলা সেটলমেন্ট অফিসারকে নিয়ে সফরে বেরুতাম। অসুবিধাটা হল, আমার নিজের এক বড় ভাই এখানেই স্পেশাল রিলিফ অফিসার হিসেবে কাজ করতেন।

নদীর ওপারে শিলাইদহে ঠাকুর জমিদারদের একটা পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল। একদিন দেখতে গেলাম, চামচিকের আবাস ভূমি। দেওয়াল আর ছাদ ছাড়া বাড়ীতে আর কিছুই ছিল না। একটা বেতের ইজিচেয়ার ও একটা বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল। সে দু'টো রেইনউইক কোম্পানীর ম্যানেজার-এর বাড়ী, বর্তমানে ডিএম সাহেবের বাংলোয় ঠাঁই নিয়েছে। ঠাকুরদের কাছারি বাড়ীতে একটা ভাঙ্গা পালকি ঝুলিয়ে রাখা আছে। রবিঠাকুর নাকি এই পালকিতে আসা-যাওয়া করতেন। বাড়ীর সামনের রাস্তার দু'ধারে সারি করে ঝাওগাছ লাগান আছে। লোক মুখে শোনা যায়, বাউল কবি লালন শাহ্ ওখানেই রবিঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কবির ছেলে রথিন্দ্র দোতলার ব্যালকনি থেকে একটা আধুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল বাউল কবির দিকে। লালন ফকির ঐ আধুলি রথিন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। এসে সেগুলো পরে এটা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ফকিরের আস্তানায় গিয়ে হাজির হন এবং তাঁর বহু গান লিখে নিয়ে নিজের নামে চালু করেছিলেন। এরপর দু'জনের বহু সাক্ষাৎ হয়েছে। এই বাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ করে বাংলাদেশে যে সব কিংবদন্তী ছড়ান হয়েছে তার প্রায় সবটাই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।

www.pathagar.com

মেহেরপুরেও মেদনীপুর জমিদার কোম্পানীর এক বাংলো আছে। জীবননগরেও পরিত্যাক্ত ও জীর্ণশীর্ণ এক জমিদার বাড়ী আছে। দর্শনায় কেরু কোম্পানীর চিনির কল রয়েছে। কুষ্টিয়া শহরে একটা পুরাতন দোতলা বাড়ী আছে। রবিঠাকুর যখন আখ মাড়াই-এর কারখানা করেছিলেন তখন তাঁর থাকার জন্য এই বাড়ী করা হয়। এ বাড়ীতে আমি কয়েক মাস ছিলাম। এটা সরকারী রিকুইজিশন করা, বাড়ীটা খুবই অস্বাস্থ্যকর।

তিন-চার মাস পর হঠাৎ বোর্ড অব রেভিনিউ থেকে একটা চিঠি পেলাম, ঢাকায় এক সপ্তাহের জন্য জয়েন্ট ডেপুটি কমিশনারদের একটা সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং কোর্স হবে, তাতে শরীক হতে হবে। খুব বিরক্ত হলাম। সিনিয়র মেম্বারকে লিখলাম লম্বা চিঠি। জানতে চাইলাম, পোস্টিং দেওয়ার তিন মাস পর এই সাত দিনের ট্রেনিংটি প্রহসন কিনা? আমরা যদি রেভিনিউ সম্বন্ধে অজ্ঞই থাকব তা হলে এই তিন মাস কি করলাম? আসলে তো আমরা প্রত্যেকেই তহশিল ও অন্যান্য রেভিনিউ অফিস ইনস্‌পেকশন করে করে মোটামুটি রেভিনিউ এডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তা হলে আবার এই অত্যাচার কেন? অবশ্য যাদের ঢাকায় থাকার জায়গা আছে, তাদের কথা ভিন্ন।

যাহোক, নির্ধারিত দিনে ঢাকায় হাজির হলাম। দেখলাম সবারই একই মনোভাব। হ্যাচ বার্নওয়েল সাহেব আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি লম্বা এক চিঠিতে সরকারের এ কাজের নিন্দা করেছ। জবাবে বললাম, 'স্যার অন্যায় বা অবাস্তব কোন কথা তো আমার চিঠিতে ছিল বলে মনে হয় না। তিনি জানতে চাইলেন, 'তুমি কি সবার হয়ে লিখেছ না নিজের কথাই লিখেছ?' বললাম, 'স্যার, সরকারের এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটাই একটা বাজে জিনিস। হঠাৎ কর্তাদের কেউ ঘুম থেকে উঠেই ভাবেন- আরে ঐ ছোকরাদের তো একটু ট্রেনিং দেওয়া দরকার। ব্যাস, অমনি তলব। তিনি একটা ক্যাপস্‌টেন সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "তুমি স্মোক কর? খুলে দেখি ওতে একটি সিগারেটও নেই। বললাম 'স্যার, আপনার এই প্যাকেটটি আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রামের মতই। সবই ফাঁকা। সবাই হেসে খুন। হ্যাচ বার্নওয়েল সাহেবের বাসায় রাতে দাওয়াতে তিনি অবশ্য পুষিয়ে দিয়েছিলেন।

সাতদিন হৈ-চৈ করে কাটল। মাঝে একদিন আমাদের জয়দেবপুর তহশিলে নিয়ে গেলেন ঢাকা জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট (রেভিনিউ)। এই ছিল ট্রেনিং প্রোগ্রামের চূড়ান্ত এবং একমাত্র প্রোগ্রাম। ভদ্রলোক আস্তে করে বললেন, 'নাজির সাহেবের এক চিঠিই প্রোগ্রামকে ভেস্তে দিয়েছে। না হলে আরো কিছু ছিল।'

ট্রেনিং-এর কথাই যখন ওঠেছে, এখানে বলে রাখি, ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের এক ইসলামিয়াতের কিছু মামুলি শিক্ষা ছাড়া

www.pathagar.com

ইসলামী আইন, শাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনটারই কোন রকম ট্রেনিং কোনদিন দেওয়া হয়নি।

কুষ্টিয়ায় থাকাকালে মূলত নিজের অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই ব্যাপকহারে তহশিলগুলো পরিদর্শন শুরু করলাম। কখন জেলা কালেক্টর আবার কখন জেলা সেটেলমেন্ট অফিসারকে সাথে নিয়ে যেতাম। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি একাই বেরুতাম। এতে রাজস্ব বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা সতর্ক হয়ে ওঠত এবং তহশিলদারদের বহু কথিত জুলুম কিছুটা কমবে-আমি এই আশা পোষণ করতাম। কখনই আগেভাগে কোন সফরসূচী দিয়ে যেতাম না। কুষ্টিয়ায় প্রায় সব জায়গায় জিপে যাওয়া যেত। একদিন দুপুরে কালেক্টর সাহেব আর আমি চুয়াডাঙ্গা মহকুমার জীবননগর তহশিলে গিয়ে হাজির। প্রচন্ড রোদ আর গরম। তহশিল অফিসের বাইরে পূর্ব নির্দেশ মত একটি নোটিশ ঝুলছে। তাতে তহশিলদার সাহেব ও তাঁর দু'জন সহকারী কোন্ ক্যাম্পে খাজনা আদায় করতে গেছে তার বিবরণ লিখিত আছে। তহশিল অফিসের দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দেওয়া হল। কোন সাড়া নেই। কিন্তু জোরেশোরে ধাক্কা দেওয়ার পর দরোজা খুলল। স্বয়ং তহশিলদার চোখ কচলাতে কচলাতে সম্মুখে দন্ডায়মান। জিজ্ঞেস করলাম, কি করছিলেন?

'হুজুর, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম যেন আপনারা দু'জনে আমার তহশিলে ইন্‌সপেকশনে এসেছেন।

তাঁর এই অদ্ভুত জবাব শুনে অন্তত মুহূর্তের জন্য আমরা হাসব না ধমক দেব, ঠিক করতে পারলাম না। বললাম, 'কথা তো মিথ্যা নয়। আপনার টাঙ্গানো নোটিশে দেখা যাচ্ছে, আপনি এখন এখান থেকে অনেক দূরে এক গ্রামের ক্যাম্পে অবস্থান করছেন এবং বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সেখানে থাকার কথা। এখানে ঘুমানর কথা তো নয়?' তিনি কোন জবাব না দিয়ে খামোশ রইলেন। অফিসের ভেতরে গিয়ে দেখলাম দু'টো বড় বড় কাঠের সিন্দুক তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। -এগুলো কি? জবাব এল ঃ 'হুজুর, এগুলো জীবননগর জমিদার বাড়ী থেকে আনা হয়েছে। এতে কালেকশনের টাকা-পয়সা রাখা হয়।' বললাম, 'আপনার তহশিলে এত টাকা আদায় হয়? খুলুন তো তালা দু'টো।' তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু আবার জোরের সাথে বলায় তালা খুলে দিলেন। ভিতরে গুড়ের বড় বড় গোলাকার পাটালি এবং এ দিয়েই দু'টো সিন্দুক পূর্ণ করে রাখা হয়েছে। বললাম, 'খাজনা কি কাঁচা পয়সার বদলে এই সব দিয়ে আদায় করা যায় নাকি?' তহশিলদারের মুখে কোন জবাব নেই। নির্দেশ দিলাম ক্যাশ বাক্স খোলার এবং হিসাব বই দেখানর। ক্যাশবাক্স খোলার পর টাকা-পয়সার পাশে কিছু স্বর্ণালঙ্কারও দেখলাম। এই সব সোনাদানা দিয়ে কি করেন আপনি? এতগুলো গহনা তো আপনার স্ত্রীর হতে পারে না। আর যদিও বা হয় সরকারী অফিসের ক্যাশ বাক্সে

www.pathagar.com

আসে কিভাবে?' এবারও কোন জবাব নেই। তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললাম, 'যদি তাড়াতাড়ি জবাব না দেন তবে কালেক্টর সাহেবের সামনে আপনাকে শারীরিক দন্ড দেয়া হবে।' কাজ হল, তহশিলদার সাহেব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং হাত জোড় করে একবার কালেক্টর সাহেবের পায়ে আর একবার আমার পায়ে আছড়ে পড়তে লাগলেন।

তাঁর এই কাণ্ড থামানর জন্য জোরে ধমক দিলাম এবং দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম, 'যদি সত্য বলেন তবে সহানুভূতি পাবেন, নতুবা চাকরিও যাবে, হাজতবাসও ঘটবে। স্বপ্ন আপনি ঠিকই দেখেছিলেন এবং শুনেছি দিবা স্বপ্ন সাধারণত মিথ্যা হয় না এবং তার প্রমাণও আপনি দেখতে পাচ্ছেন।' তারপর অনেক চাপাচাপির পর তিনি মুখ খুললেনঃ 'হুজুর, ওগুলো আমি কিনেছি বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য আর গহনাগুলো আমার স্ত্রীর।' বুঝলাম, এঁকে যত সোজা ভেবেছিলাম, এ তা নয়। তাই তারই টেবিলে বসে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ দিলাম। আমার কঠোর মনোভাব দেখে তহশিলদার সাহেব ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন, 'হুজুর, আপনি ওয়াদা করেছেন, সত্য বললে মাফ করে দিবেন, এবার সত্য বলব। আমি গুড় প্রজাদের কাছ থেকে অল্প দামে কিনে থাকি এবং হাটের দিন ফেরিওয়ালা বা ফড়িয়াদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে থাকি।'

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমরা দু'জনও এরকমই আন্দাজ করেছিলাম। তবে গহনাগুলো সম্পর্কে তিনি কিছুতেই সত্য বললেন না। পরিশেষে ইন্‌সপেকশন রিপোর্টে বিস্তারিত সব লিখে এক কপি সরাসরি রেভিনিউ বোর্ডেও পাঠাবার নির্দেশ লিপিবদ্ধ করলাম। তহশিলদারকে বললাম, 'পরিপূর্ণ সত্য আপনি বলেননি। মনে হয় এই অলঙ্কার গ্রামের মানুষের কাছ থেকে রেখে টাকা ধার দেওয়ার কারবার আপনি চালাচ্ছেন। এত অলঙ্কার আপনার স্ত্রীর হলে তহশিলদারের চাকরি করতে এই গ্রামে পড়ে থাকতেন না। আর গুড়ের ব্যবসার যে কাহিনী শুনিয়েছেন তাও পুরা সাচ্চা নয়। সরকারী টাকায় আপনি এই ব্যবসা ফেঁদেছেন। আপনার গহনাগুলো সিজ করা হলো। লিস্ট বানান এবং একটা থলিতে সীলমোহর করে আমার গাড়ীতে উঠিয়ে দিন। কুষ্টিয়া ট্রেজারিতে জমা করিয়ে রশিদ নিয়ে সহকারী তহশিলদারকে চার্জ বুঝিয়ে দেবেন, তিনি আপতত এই তহশিলের দায়িত্বে থাকবেন।'

গুড়ের সিন্দুকও তালা মেরে সীল করে দেওয়া হল। তহশিলদার সাহেবকে সাময়িক বরখাস্ত করে রেভিনিউ ডেপুটি কালেকটরকে তদন্ত করার নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে ওখান থেকে রওয়ানা দিলাম। কালেকটর তিমুরী সাহেব এসে বললেন, তহশিলদার সাহেব জবরদস্ত চালাক লোক। জবাবে বললাম, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি।'

www.pathagar.com

বলে রাখি, রেভিনিউ তহশিলদারদের এই জাতীয় চরিত্র প্রায় সব জায়গায় দেখেছি, কিছুটা কম-বেশী এই যা পার্থক্য। তবে কর্তব্য-সচেতন তহশিলদার যে ছিল না, এ কথা সত্য নয়।

আগেই বলেছি, আমার এক বড় ভাই জেলার বিশেষ রিলিফ অফিসার। সেই সূত্রে জেলা পর্যায়ের বেশ ক'টি কমিটির সদস্য সচিব তিনি। পদাধিকার বলে আমি কয়েকটি এবং ডিএম সাহেবের পক্ষে তার চেয়েও বেশি সংখ্যক কমিটির সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হত এতে স্বাভাবিকভাবেই আমি খুব বিব্রত বোধ করতাম। সভা কক্ষে ঢুকলে সবার সঙ্গে ভাই সাহেব দাঁড়াবেন না বসে থাকবেন- এটা যেমন তাঁর সমস্যা, আমার জন্যেও কম অস্বস্তিকর নয়। সরকারকে বললাম, আমাকে অন্যত্র বদলি করতে- যদিও আমার ভাই আমার চেয়ে অধিক দিন যাবত এখানে আছেন। নচেত তহশিল ইনসপেকশন ছাড়া অন্য কোনো কাজ আমার দ্বারা হবে না। সরকার অবস্থা বুঝলেন এবং আমাকে ফরিদপুরে বদলি করে দিলেন।

বলা ভাল যে, পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী প্রথা বিলোপের পর যে রাজস্ব কাঠামো চালু করা হয়েছিল সেটা মোটামুটি এ রকম, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি তহশিল অফিস আর ইউনিয়ন ছোট হলে সে ইউনিয়নে একটি তহশিল অফিস। সাধারণত এ সব অফিসে একজন তহশিলদার ও দু'জন সহকারী তহশিলদার থাকত। জমিদারদের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তহশিলদার হতেন। সহকারীরা নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত। কাজ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ছাড়া কোনো সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এদের জন্য ছিল না, তাই জমিদার আমল থেকে চলে আসা প্রজা পীড়নটা সহজেই নতুন কাঠামোতে ঢুকে পড়েছে বলা চলে। তাদের ওপর থাকতেন সার্কেল ইনসপেকটর, এঁরাও ননগেজেটেড তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। এঁদের ওপর থাকতেন একজন মহকুমা ম্যানেজার। মহকুমা ম্যানেজার থাকতেন রেভিনিউ ডেপুটি কালেকটর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। কে কত রাজস্ব আদায় করল এবং খাস মহল ইজারা বাবদ কে কত রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা করল-এটাই ছিল কৃতিত্বের একমাত্র মাপকাঠি। বাকী কোনো কিছু নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত কি না, জানি না। প্রাদেশিক পর্যায়ে অবশ্য একটি রাজস্ব বোর্ড ছিল। সেখানে প্রধান তিন-চার জন থাকতেন। এঁরা যে কি করতেন, কখনো বুঝতে পারিনি। তাঁরা মাঝে-মধ্যে মফস্বলে সফরে গিয়ে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখতেন। তাঁরা রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমার বিচার-আচার করতেন বলে শোনা যেত। দেওয়ানী আদালত দেশে জারি থাকার পরও রাজস্ব বোর্ডের প্রয়োজনটা কি, কোন দিনই আমি বুঝে উঠতে পারিনি। বিশেষ করে যখন সরকারের একটা রাজস্ব বিভাগ, তার সেক্রেটারী এবং একজন মন্ত্রীও ছিলেন, আসলেও এটাকে বৃটিশ প্রভূদের

www.pathagar.com

'লিগেসি' বা ফেলে যাওয়া ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায়, আজ অবদি এই 'লিগেসি' কিন্তু চলেই আসছে। অবশ্য রাজস্ব বোর্ডের অন্যান্য কাজও আছে, যেমন–কাস্টমস, আবগারি, ট্যাকসেশন ইত্যাদি। কিন্তু যে কথা আমার মাথায় ঢুকে না সেটা হল, তা হলে অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রণালয় দু'টো করছে কি? অর্থমন্ত্রণালয় একটি বিশাল সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য কিন্তু সচিবালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাজস্ব মন্ত্রণালয়ের সাম্রাজ্য বহিরাঙ্গনে বিশাল কিন্তু সচিবালয়ের অন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের মতই। এই দুটো সাম্রাজ্যের ওপর আবার একটি অতিরিক্ত দফতরের ব্যয়ভার কিন্তু বেচারা সাধারণ করদাতাকেই যোগাতে হয়। আমরা অনেক সময় শাসনযন্ত্র সংস্কারের কথা শুনি এবং কিছু কিছু দেখিও। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য তিনটির সংস্কারের কথা খুব–একটা শুনি বলে মনে হয় না। আসলে এই তিনটি দৈত্যই বড় জটিল; তাই কেউ ওখানে হাত দিয়ে আঙ্গুল পোড়াতে চায় না। নচেত আমার দৃঢ় বিশ্বাস এগুলোকে সমন্বয় করে যথেষ্ট সংকোচন করা যায়। এমন কি তিনটেকে একটা করেও কাজ চালান যায় বলেই আমার বিশ্বাস। এ কথাগুলো বলছি এজন্য যে, আমরা দেখেছি খাজনা মাফের সাড়ম্বর ঘোষণা। অন্যদিকে ডেভলাপমেন্ট ট্যাক্স বলে খাজনার বাজনাসহ করদাতার ঘাড়ে অন্তত দশ গুণ বোঝা চাপান হয়েছে এবং আরও হচ্ছে । আমি বলি কি সত্যি সত্যি খাজনা মাফ করে দেওয়া আদৌ কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নয়। ধরা যাক, আমরা বছরে খাজনা বাবদ রাজস্ব আদায় করি সাত থেকে নয় কোটি টাকা। এই টাকা আদায় করতে ছ' থেকে সাত কোটি টাকা ব্যয় হয়! হাতে থাকে দু' থেকে আড়াই কোটি টাকা। যদি এই টাকা আমরা যুক্তিসঙ্গত কিস্তিতে জমির মালিকদের কাছ থেকে আদায় করি এবং তাকে জমির খাজনা মুক্ত করে দেই তা হলে অসুবিধা কোথায়? ব্যাংকে ঐ টাকা জমা রাখলে মুনাফা পাওয়া যাবে সেটা সরকারের নেট লাভ আর খাজনা আদায়ের খরচটা তো বেঁচেই গেল। এখন একটা কথা থেকে যায়, সেটা হল খাজনা আদায়কারী কর্মচারী এবং বোর্ডের অন্যান্য কর্মচারী –এরা যাবে কোথায়? বেশ তো ঐ টাকা দিয়ে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। সেখানে এদের সহজেই নিয়োগ করা যেতে পারে। কেবল ঐ সব কর্মচারীকে বেতন দেবার জন্যই সারাদেশের করদাতাদের বিশেষ করে চাষীদের ওপর ক্রমবৃদ্ধি হারে কর চেপেই থাকবে –এটা কোন সুস্থ চিন্তা হতে পারে না। দুর্ভাগ্য শেরে বাংলা ফজলুল হক তো বার বার আসেন না। এ সব জটিল বিষয় চিন্তা করার সময় আর ধৈর্য কারই বা আছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে যুগ্ম আর অতিরিক্ত কালেক্টরদের প্রশিক্ষণ তো বিলাসিতাই বলতে হবে। সিভিল সার্ভিসের লোকদের কথা অবশ্য আলাদা। কারণ বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মরত থাকাটা হল প্রশিক্ষণ, সুতরাং এ নিয়ে আমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

www.pathagar.com

কুষ্টিয়া এমন এক জেলা যেটি বিভাগ পূর্ব সময়ে নদীয়া জেলা থেকে ছেঁটে নেওয়া হয়েছে। এটা ছিল একটা মহকুমা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি, মহকুমা অফিসার,এসডিও, জেডিসি, জেলা জজ- জেলা পর্যায়ের কোন অফিসারেরই কোন অবস্থান এমনকি অফিস দপ্তর- এর জন্য বাড়ীঘর পর্যন্ত ছিল না। সুতরাং জায়গাটা খারাপ লাগছিল। তার ওপর যে বাসায় ছিলাম সেটি সরকার রিকুইজিশন করে নিয়েছে এবং এতে কোন বিজলী ছিল না। তবে এখানে বেশীদিন থাকতে হয়নি।

www.pathagar.com

চৌদা সালকা সাজা

মাস ছয়েক পরই আদেশ পেলাম ফরিদপুর যাবার। শুনলাম,ওখানে নাকি ভীষণ বন্যা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা ১৯৫৭-এর বন্যা। ট্রেনে রাজবাড়ী এবং সেখানে থেকে নৌকায় করে ফরিদপুরে পৌঁছালাম। বন্যায় রাস্তাঘাট সবকিছু ডুবে একাকার হয়ে গেছে। আমার নতুন বাসার মেঝে পানির উপর থাকলেও মেঝে আর পানির স্তর প্রায় বরাবর হয়ে রয়েছে। বন্যাকবলিত বাড়ীতে সাপের আড্ডা যে নিশ্চিত, তাতে অন্তত আমার কোন সন্দেহ ছিল না। বড় রাস্তার পার্শ্বে এক টুকরো খোলা জায়গা। তারপর একতলা পুরাতন বাড়ীটা। রাস্তার অপর পাশে পুলিশ লাইন। কিছুদিন থাকতে হবে এখানে, সুতরাং মনটাকে বেঁধে নেওয়াই ভাল। ডিএম সাহেব সিএসপি অফিসার এবং বেশ ভারিক্কি গোছের লোক। পরদিন প্রথম মোলাকাত করতে গেলাম। একই সার্ভিসের কয়েক বছর সিনিয়র তিনি, বেশ স্নেহ-আদর করলেন। তবে সঙ্গে কিছু নসিহত করতেও ছাড়লেন না।

জেলাটি রাজনৈতিক দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মোহন মিয়া, ওহিদুজ্জামান, শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবদের জেলা। এ ছাড়াও কবি জসীম উদ্‌দিন এবং আরো অনেকে এই জেলার লোক। তা ছাড়া ইতিহাসের দিক থেকে ফরিদপুরের একটি ঐতিহ্য তো রয়েছেই। হাজী শরিয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া প্রমুখ সংগ্রামী পুরুষের জন্মস্থান এই জেলা।

শহরটি জেলা শহর হিসেবে খুব একটা জৌলুসপূর্ণ নয়। জেলা জজ আবদুল মওদুদ একজন সুসাহিত্যিক। পুলিশ সুপার একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। মোটামুটি জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের একটি টিমের মতই মনে হল। সবাই মিশুক।

এখানেও কিন্তু আমার দায়িত্ব রাজস্ব বিভাগীয়। হ্যাঁ, আবার সেই তহশিলদার। দায়িত্ব নেবার পরপরই ঢাকার রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য হ্যাচ বার্নওয়েলের চিঠি পেলাম, জমি-জমা বরাদ্দ সংক্রান্ত এক তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কয়েক শত একর চরের জমি আগের কালেক্টর সাহেব তখনকার প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বা তাঁর পরিবারের কারো নামে বরাদ্দ করেছিলেন। মোহন মিয়া সাহেবের পরিবার সেই জমি তাঁদের বলে দাবী করছেন। তাঁদের নাকি বড়-সড় একটা ফার্মিং করার পরিকল্পনা রয়েছে ঐ জমিতে।

www.pathagar.com

ডিএম সাহেবের 'মলি' নামের একটা ভাল লঞ্চ ছিল। ফরিদপুরে আমার প্রথম সব্রেজমিনে সরকারী দায়িত্ব পালন করতে ঐ লঞ্চ নিয়ে রওয়ানা দিলাম। তদন্তের বিশদ বিবরণ আজ আর আমার মনে পড়ে না। তবে আমার তদন্তের ফলে দু'পক্ষের কোন পক্ষই যে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হননি,সেটা বেশ মনে আছে। অবশ্য এটা ছিল অতি গোপন তদন্ত। সুতরাং কোন পক্ষ থেকেই তদবির হয় নি, কাগজ পত্র এবং স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা আর তহশিল পরিদর্শনের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল। পরোক্ষ উপকার হয়ত এক পক্ষ পেয়ে থাকবে। জমি আদতে ছিল খাস। বড়-সড় ফার্মিং না করে ছোট ছোট চাষীদের বরাদ্দ দেওয়া হোক-এই ছিল আমার সুচিন্তিত অভিমত।

এই সময়টায় ঢাকা ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই উত্তপ্ত। হ্যাঁ, এর কিছুদিন পরই প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকারকে পরিষদ কক্ষেই খুন হতে হয়।

একদিন রাতে ডিএম সাহেবের দোতলা বাংলোর ছাদে আমরা প্লেয়ারস থ্রি সিগারেটের সেবায় সর্বোতভাবে নিয়োজিত এবং সেই সঙ্গে জেলা জজ মওদুদ সাহেবের রসাল গল্প চলছে আর মাঝে মাঝে রাজনৈতিক পর্যালোচনাও হচ্ছিল। এক সময় পাশের দেওয়ালের ঘড়িতে বাজল রাত বারোটা। হঠাৎ জজ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললাম, এরই নাম 'জিরো আওয়ার।' কথাটা এমনিই বলেছিলাম। তাই এ নিয়ে কোন কথা হল না। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত ছিলাম যে, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা শেষ পর্যন্ত যা করলেন পরিষদ কক্ষে, এরপর বড় রকমের কিছু একটা ঘটবেই এবং তা যে কোন মুহূর্তে।

জজ সাহেব বিশেষ করে তাঁর কোর্টের গল্প শুনাতেন। আসামীদের বয়ান, সাক্ষীরা কেমন চালাকি করে ইত্যাদি নান কথা। শুনতে ভাল লাগত কিন্তু মনের ভেতর আমার কেমন যেন লাগত। জজ সাহেব গল্পের মধ্যে তাঁর মতামত দিয়ে ফেলতেন-যে সব মামলার তখনও হয়ত শুনানি শেষ হয়নি।

জজ সাহেব এক আসামীর মৃত্যুদন্ড দেন। হাইকোর্টও সে দন্ডাদেশ বহাল রাখে। কিন্তু আসামী সমানে বলে চলেছে যে জজ সাহেব একপেশে বিচার করেছেন, সে নির্দোষ। এমনকি প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেও সে নারাজ। জেলখানায় আমি তার সাথে কথা বলি। জিজ্ঞেস করেছি, জজ সাহেব কি তোমাকে কখন চিনতেন? তার জবাব, 'না চিনলে কি অইবো! যেদিন আমি প্রথম কাঠগড়ায় দাঁড়াই সে দিন আমার বিরুদ্ধে সাজান মামলার বিবরণ পুলিশের কাছ থেকে শুনে জজ সাহেব আমার জবানবন্দী নেবার আগেই আমার দিকে তাকিয়ে কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন, 'বেটা, তুমি এরকম জঘন্যভাবে মানুষ খুন করেছ?' এরপর শত রকমে আসল ঘটনা তাঁর কাছে তোলা হয়েছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, জজ সাহেব সেই প্রথম

www.pathagar.com

দিনই আমাকে ফাঁসিতে লটকাবেন ঠিক করে ফেলেছিলেন, আমি হুজুর সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

শেষ পর্যন্ত প্রায় জোর করেই ফাঁসির সেই আসামীর আত্মীয়-স্বজনরা তার মত আদায় করে গভর্নর সাহেবের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন করেছিল। কিন্তু দন্ডাদেশ রদ হয়নি। আজ এত বছর পরও যখন মনে পড়ে লোকটার কথা, মনে হয় কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। লোকটা হয় তো সত্যিই নির্দোষ ছিল। কিন্তু কোন দিনই জজ সাহেবকে সে কথা বলতে পারিনি- এজন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়। বিচার কাজে কারও কোন মন্তব্য করা আদৌ সমীচীন নয়।

যাকগে, সেই রাতে প্রায় আড়াইটার সময় যে যার বাসায় ঘুমোতে গেলাম। ভোর পাঁচটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল। খুব বিরক্তির সঙ্গে উঠে ফোন ধরলাম। ঢাকা বিভাগের কমিশনার কাদরী সাহেব অন্যদিকে। বললেন, 'নাজির, সিদ্দিকী (ডিএম)-কে ফোনে পাচ্ছি না। হয়ত তার টেলিফোনের লাইন ইতিমধ্যেই বিছিন্ন করা হয়েছে। তাঁকে এক্ষুণি বলে দাও, মার্শাল ল' জারি হয়েছে- প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন।' আমি জানতে চাইলাম- স্যার, আর্মি ক্ষমতা গ্রহণ করেছে না প্রেসিডেন্ট? তিনি বললেন, না প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ফোনের লাইন কেটে গেল এবং এক সপ্তাহের আগে আর ভাল হল না।

ফোন ছেড়ে মনে হল শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। আমি মনে মনে আওড়াচ্ছিলাম, 'প্রেসিডেন্ট হ্যাজ টেকেন ওভার।'

গাড়ীর ড্রাইভার আসতে তখন অনেক দেরী। পিয়নের একটা সাইকেল নিয়ে ছুটলাম। ডিএম সাহেবের স্ত্রী ঢাকায়, সুতরাং গার্ডসহ ওপরের কামরার জানালায় টোকা দিতে লাগলাম। বললাম, আমি নাজির, চিন্তা নেই, দরজা খুলুন তাড়াতাড়ি। মনে হল, ভদ্রলোক হতচকিত হয়ে পড়েছেন। বললাম, তাড়াতাড়ি খুলুন, ঢাকার মেসেজ আছে। আপনার ফোন তো ডেড। তাই আমাকে আসতে হল।

এবার দরজা খুললেন তিনি। তাঁর গার্ডকে নিচে পাঠিয়ে কমিশনার সাহেবের কথা সব বললাম। এরপর চায়ের হুকুম করলেন তিনি। এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি দু'জনে ত্বরিত তা ঠিক করলাম। ঠিক হল সকাল ৮টায় জেলার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের এক সভা ডিএম সাহেবের বাংলোয় বসবে এবং আশু করণীয় সেখানে নির্ধারণ করা হবে। সেই সাথে এও বলে দেয়া হবে যে, সামরিক বাহিনীর লোকদের সাথে আমাদের আচরণ কি হওয়া উচিৎ হবে।

মিটিং-এর কিছু আগেই গেলাম ডিএম সাহেবের বাংলোয়। এর মধ্যে তিনি যশোর আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে একটা ওয়ারলেস মেসেজ পেয়েছেন যে, যশোর

www.pathagar.com

থেকে জেলা সামরিক প্রশাসক তাঁর দলবল নিয়ে আসবেন, তাঁদের যেন যথাযথ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়।

দেশে মার্শাল ল জারি হয়েছে, সব বেসামরিক আইন আপাতত অকার্যকর। রেডিও-র মাধ্যমে মার্শাল ল'র আদেশ-নির্দেশ জারি হতে থাকবে- সেই মোতাবেক সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে আর সামান্যতম ব্যতিক্রম হলে কঠোর সাজা। সদা-সর্বদা রেডিও খুলে রাখতে হবে। মেসেজটা পড়া শেষ হতেই ডিএম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাবছ? জবাবে বললাম, 'আল হামদো লিল্লাহ- কিছু সময় পাওয়া যাবে'।

মিটিং-এ ডিএম সাহেব অবস্থা ব্যাখ্যা করে সামরিক বাহিনীকে সবরকম সহযোগিতা করতে বলেছিলেন সকলকে। আমার এজলাসটা মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটরকে দেওয়া হবে এবং আমার নতুন জিপটা তাঁর জন্য নির্ধারণ করা হল। তিনি থাকবেন সার্কিট হাউজে।

আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যেহেতু প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, ডিএম সাহেব তাঁর প্রাধান্য বজায় রাখবেন সর্বক্ষেত্রে- যতক্ষণ না অন্য কোন নির্দেশ আসছে। এটা এ জন্য প্রয়োজন যে, এমন অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি হবে যখন সাধারণ মানুষ ঝামেলার মুখে পড়বে তখন তাদের অনুকম্পা দেখাবার প্রয়োজন হবে। এ ছাড়াও সরকারী কর্মচারীরা ঝামেলায় পড়লে তাদের সহায়তা দেবারও প্রয়োজন পড়বে।

সকাল থেকে শহরের সব জায়গায় বেশ একটা ভীতি আর আতঙ্ক। প্রায় সর্বত্র রেডিও (টিভি তখনো হয়নি) খুলে সামরিক আইনের ধারা-উপধারা শুনছে মানুষ। উর্দু ঘোষক আনওয়ার বেহজাদের কণ্ঠে মাঝে মাঝেই উচ্চারিত হচ্ছিলঃ 'চৌদা সাল কা বামুশাক্কাত সাজা হোগা'। বাস্তবিকই মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে বৈকি। আমার কানে আজো সেই কণ্ঠস্বর বাজে।

কিছুক্ষণ পর ডিএম সাহেব তলব করলেন। তাঁর বাংলোর দপ্তরে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি জানালেন যে, আমাদের এখানে জেলা সাব ডেপুটি মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর সাহেবের নাম মেজর ভাট্টি। তিনি যশোর ছাউনি থেকে তাঁর লোক-লস্কর নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুরের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন। সুতরাং কাল পর্যন্ত সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে রেডিওর ঘোষণা মোতাবেক মানুষজন তাদের বাড়ীর দেওয়াল চুনকাম করতে শুরু করেছে। না করলে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ড।

রাস্তাঘাটের আশেপাশের ঝোঁপঝাড় পরিষ্কার হচ্ছে। আর দোকানের জিনিসপত্র পুকুরের পানিতে ফেলা হচ্ছে। এক আজব কান্ড। কেবলই নতুন নতুন আদেশ-নির্দেষ জারি হচ্ছে আর মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে।

www.pathagar.com

ভাট্টি সাহেব এলেন তাঁর লোক-লস্কর নিয়ে। তিনি আগের ব্যবস্থামত সার্কিট হাউজে অবস্থান নিলেন। শহরের জেলা পর্যায়ের সকল অফিসার এবং মহকুমার অফিসারদের নিয়ে তিনি এক সভা ডাকলেন। আমাদের পরামর্শ মত ডিএম সাহেব নিজের নামে এই সভার নোটিশ জারি করলেন এবং সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করলেন।

সভায় খুব গরম গরম কথাবার্তা হল, কেউ কাজে ফাঁকি দিলে চাকরিচ্যুতিসহ জেল হবে। নিম্ন কর্মচারীদের গাফিলতির জন্য ওপরওয়ালারা দায়ী থাকবেন। সবাই মিলে জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে। ব্যবসায়ী মানেই বাটপার- অতএব তাদের সায়েস্তা করতে হবে। আর বেআইনী মালপত্র পাওয়া গেলে সামরিক আইনে ত্বরিত বিচারের ব্যবস্থা, ৭ থেকে ১৪ বছরের জেল, বেত্রাঘাত ইত্যাদি। সময় মত অফিসে না গেলে তৎক্ষণাত চাকরি যাবে। ঘুষখোরদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। সাধারণ মানুষকে আমন্ত্রণ জানান হবে সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য।

একটা জনসভার ব্যবস্থা করা হল পরের দিন। আবার আমরা ডিএম সাহেবকে পরামর্শ দিলাম তিনিই যেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। হলও তাই। ডিএম ও মেজর ভাট্টি ভীষণ গরম বক্তৃতা করলেন। জেল, বেত্রাঘাত, সামরিক আইনে বিচার, মৃত্যুদন্ড-এ সব ছাড়া কোন কথাই নেই। ফলে ব্যবসায়ী মহল দারুণ ঘাবড়ে গেল। দোকানপাট খোলা থাকল ঠিকই কিন্তু জিনিসপত্র সব সরে গেল গোপন আস্তানায় অথবা পুকুরে পানির নিচে।

ডিএম, এসপি, জেলা জজ এবং আমি মাঝে-মধ্যেই এক সাথে বসতাম। ঢাকার খবর, করাচীর খবর আর নিজেদের জেলার খবরা-খবর নিয়ে আলোচনা করতাম আমরা। সেই সঙ্গে আগামী দিনের কর্মপন্থা কি হবে- তাও আলোচনা করা হত।

একদিন নির্দেশ আসল যে, ডিএম সাহেবকে মার্শাল'ল এডমিনিসট্রেটর সাহেব সহকারী সাব এসিস্ট্যান্ট মার্শাল ল' এডমিনিসট্রেটর নিয়োগ করেছেন। তার মানে ডিএম সাহেব মেজর সাহেবের সহকারী হিসেবে কাজ করবেন। আমরা সকলেই একটু হতচকিত হয়ে গেলাম, আসলে মনঃক্ষুণ্নই হলাম। কিন্তু উপায় নেই। কিল খেয়ে হজম না করলে সামরিক আইনের বিরোধী বলে সরাসরি জেলখানায় অবস্থান নিতে হবে এবং পরে বিচারে ১৪ বছরের শ্রম কারাদন্ড ও কয়েক ঘা বেত খেতে হবে।

স্রোতের মত জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ আসতে থাকল ভাট্টি সাহেবের বাসস্থানের সামনে রাখা বাক্সে। সেগুলো তদন্ত করার জন্য পাঠান হচ্ছে ডিএম সাহেবের কাছে। অবস্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে আসছে। এদিকে আমি ভাট্টি সাহেবের সঙ্গে মোলাকাতও অব্যাহত রেখেছি তাঁকে তুষ্ট রাখার জন্য। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা

www.pathagar.com

ডিএম সাহেব তাঁর বাংলোয় ডেকে পাঠালেন। গিয়ে শুনলাম, ফরিদপুরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াহিদ উদ্দিনকে গ্রেফতার করার জন্য ভাট্টি সাহেব ডিএম সাহেবকে বলেছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অপরাধ, তাঁর গাড়ী ভাট্টি সাহেবের গাড়ীকে সামনে যাবার রাস্তা ছাড়েনি। আসলে রাস্তাটা এত সরু যে মাত্র একটা গাড়ীই যেতে পারে। কিন্তু মার্শাল ল জারির পর সামরিক কর্তাব্যক্তিদের অত বিষয় তলিয়ে দেখার সময় কোথায়? ব্লাডি সিভিলিয়ানরা দেশটাকে শেষ করে দিয়েছে– তার ওপর আবার আদব–কায়দা পর্যন্ত শেখেনি।

মহা মুশকিল। কি করা যায়! বিকেলে যথারীতি জজ সাহেব, এসপি, ডিএম এবং আমি এক বৈঠকে বসলাম। নানা আলোচনার পরও আমরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। এমন সময় ভাট্টি সাহেবের জিপ ডিএম সাহেবের বাংলোয় এসে হাজির। এসেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন সেই 'বাস্টার্ডকে' গ্রেফতার করা হয়েছে কি না। আমরা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সবচেয় বড় চেয়ারটায় বসতে বললাম। চা–নাস্তার আদেশ দিলেন ডিএম সাহেব। ভাট্টি সাহেবের প্রশ্নের জবাবে জানান হল যে, ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করার জন্য একটা লিখিত আদেশ দিতে হবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে গ্রেফতারের কারণটাও লিখতে হবে। এ বিষয়ে আমরা জেলা জজের সাথে পরামর্শ করেছি। তাঁর মতে কারণটা লেখার আগে আপনার সাথে পরামর্শ করা উচিৎ। কারণ আপনার গাড়ীকে সামনে যেতে দেয়নি এটা লিখলে ওপরওয়ালা হয় তো বলবেন সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা ছিল না। ঘটনাতো একজন সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়ে। আপনি সম্মতি দিলে তাঁকে এখনি বেঁধে আনা যাবে এবং এখানে আপনার সামনেই। বেচারা একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। হয়তো বা সন্দেহও করতে লাগলেন যে, আমরা 'ব্লাডি সিভিলিয়ানরা' তাঁর সাথে সহযোগিতা করতে চাচ্ছি না– অন্তত তাঁর সম্মানটাকে ঠিক মর্যাদা দিচ্ছি না। যা হোক, তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি সিপাই দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করাব। বেশ তাই হবে ঠিক হল।

এর মধ্যে চা–নাস্তা এসে গেল। ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে আলোচনাটা জেলার ডিএম সাহেবের মর্যাদা, তাঁর ক্ষমতা এবং সরকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং মার্শাল ল জারির পর মার্শাল ল'র অনুকূলে কি কি করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যাওয়া হল। আমি যেহেতু দু'নাম্বার সুতরাং দু'একটা ফালতু কথাও ছেড়ে দিলাম যাতে তিনি একটু ঠান্ডা হন। শেষমেশ ভাট্টি সাহেব সত্যি একটু নরম হয়েছেন মনে হল। বললেন, তিনি তাঁর জিএইচকিউর সঙ্গে পরামর্শ করে ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করবেন। সেদিনের মত সব ঠান্ডা হল।

পরদিন ডিএম সাহেব তাঁকে নিয়ে মহকুমা সদরগুলো সফর করার ব্যবস্থা করলেন। অফিসে অফিসে ত্রাস, হাটে–বাজারে ভীতি আর আতঙ্ক। ভিক্ষ মাংনেওয়ালা

www.pathagar.com

ফকির-মিসকিনরা পর্যন্ত সব উধাও। কারণ প্রাণের মায়া বড় মায়া। এ এক অদ্ভুত দৃশ্যই বলতে হবে।

এদিকে ভাট্টি সাহেবের সাথে আমার মোটামুটি খাতির হয়ে গেল। আমার এজলাস, আমার নতুন জিপ তাঁর জন্য ছেড়ে দিয়েছি, তিনি খুব খুশী। আমার চেম্বার এজলাসের পাশেই। মাঝে-মধ্যে তিনি আসতেন। দেখতেন যত পুরনো ফাইল ছিল সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে দিচ্ছি। তিনি খুশী হয়ে ডিএম সাহেবের কাছে আমার প্রশংসা করতেন। এরই ভেতরে আলাপে আলাপে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, এই ইঞ্জিনিয়ারকে সেদিন গ্রেফতার করলে নানা রকম প্রতিক্রিয়া হত- তাতে শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপর তাঁর ওপরওয়ালারা খেপে যেতে পারতেন। একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া জেলা পর্যায়ের একজন অফিসারকে এভাবে নিগৃহীত করলে অন্য অফিসাররাও ঘাবড়ে যেত। মার্শাল ল'র কাজতো তাঁদের দিয়েই করাতে হবে বা হচ্ছে। সহযোগিতা নিয়েই কাজ করা ভাল। ঐ একই অফিসারকে যদি দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা যেত তা হলে জনসাধারণের মধ্যে তোমার এবং মার্শাল ল'র সুনাম হত। তাতে ওপরওয়ালারাও খুশী হতেন তোমার ওপর। আমাদের সে চেষ্টাই করা উচিৎ। তিনি বুঝলেন। বললেন, তোমরা আমার জন্য ভাল কাজই করেছ।'

তাঁকে আরও বুঝালাম যে, সরকার ডিএম সাহেবকে তোমার সহযোগী করেছেন ঠিক কিন্তু তাঁর ক্ষমতা এবং মর্যাদা কিছুই লাঘব করেননি। যা কিছু করতে চাও তাঁকে দিয়ে করানই ভাল। আমি তোমার জায়গায় হলে তাই করতাম। ব্লাডি সিভিলিয়ানরা কিন্তু সেভাবেই কাজ উদ্ধার করে থাকে।'

নানা ঘটনার মধ্যে প্রায় এক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে শাসন ব্যবস্থা ও কাজের ভেতর একটা সিস্টেম চালু হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই আমরা সেটা বুঝে নিয়েছি।

হঠাৎ এর মধ্যে একদিন ঘোড়ার গাড়ী চড়ে মোহন মিয়া সাহেব আমার বাসায় এসে হাজির। শহরে তাঁদের পরিবার সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁকে কখনো দেখিনি। তিনি খুব আলাপি লোক। অল্পক্ষণের মধ্যেই জমিয়ে ফেললেন। সবিস্তারে পূর্ব পাকিস্তান এসেমব্লির ভেতর শাহেদ আলীর খুনের কিচ্ছা শুনালেন। তাঁর ভূমিকা কি ছিল তাও বিস্তারিতভাবে বললেন। তাঁর গায়ে কত জোর সেটা তাঁর মাসল টিপে দেখতে বললেন। শেখ মুজিবুর রহমান আর তিনি মিলে কিভাবে ডায়াসে চড়াও হয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছেন, তার একটা ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে ফেললেন। প্রায় এক ঘন্টা গল্প করলেন। হাসলেন এবং হাসালেন। কোন তদবির করলেন না কিন্তু। বিদায় বেলায় তাঁকে বললাম, ভাগ্যিস দেশে মার্শাল ল হয়েছে যে আপনার মত ব্যক্তিত্ব এই বান্দার বাসায় আসলেন আর এত গল্পসল্প করলেন। জবাবে জানালেন যে, তিনি দেশে খুব-একটা আসেন না। যখন আসেন, জেলা পর্যায়ের বিশেষ করে শাসন বিভাগের

www.pathagar.com

অফিসারদের সাথে দেখা করা তাঁর রীতি। প্রসঙ্গত জানালেন, জমি সংক্রান্ত আমার ইনকোয়ারি রিপোর্ট তাঁর পক্ষে না গেলেও শেখ মুজিবের পক্ষে যায়নি- এতে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। বললাম, কেবল বোর্ড অব রেভিনিউকে খুশী করাই আমার দায়িত্ব ছিল, অন্য কাউকে নয়।

হঠাৎ মাথায় একটা বদবুদ্ধি খেলে গেল। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করার ব্যাপারটা আমার মাথায় সবসময় খচখচ করত। এর একটা বিহিত করা দরকার। আমার একাউনটেন্টকে ডেকে বললাম, মেজর সাহেব সার্কিট হাউজ থেকে কোর্টে এবং কোর্ট থেকে সার্কিট হাউজে যত বার জিপে যাতায়াত করেছেন লগবুক থেকে সেটা বের করে সরকারী গাড়ী নিজস্ব কাজে ব্যবহার করলে যে রেটে ভাড়া দিতে হয় সেই রেটে একটা বিল তৈরী করতে। একাউনটেন্ট একটা বিল তৈরী করে আমাকে দিলেন। বিলটি নিজে সই করে মেজর সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর এজলাসে। ভদ্রলোক এজলাসটা খুব পছন্দ করেন। মেঝে থেকে উঁচুতে বসার ব্যবস্থা- তাও আবার লাল শালু দিয়ে মোড়া।

বিল পেয়ে তো মেজর সাহেবের মাথা গরম। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার কামরায় এসে হাজির। বেশ রাগত স্বরেই বললেন, 'এটা কি? আমাকে হেরাস করার ফন্দি নাকি? আমি তো সরকারী কাজে ঐ গাড়ী ব্যবহার করেছি- আমি ভাড়া বা পেট্রোলের পয়সা কেন দেব? তোমরা সারাদিন গাড়ী চড়, তোমরাও এই ভাড়া দাও নাকি?' এরকম অনেক কথা বললেন তিনি।

আমি বললাম, আমাদের একটা সিভিলিয়ান রুল আছে। সেই রুল মোতাবেক কোন অফিসার বাসা থেকে কার্যক্ষেত্রে যাবার জন্য সরকারী গাড়ী ব্যবহার করলে সেটাকে বক্তিগত কাজে ব্যবহার গণ্য করা হয়। অফিস থেকে সরকারী কাজে গাড়ী করে কোথাও গেলে সেটার খরচ সরকার বহন করে থাকে। আবার অফিস থেকে বাসায় যাওয়াটাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে।

আমার জবাব শুনে মেজর সাহেব আরো ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'তুমি যে রোজ বাসা থেকে গাড়ী করে অফিসে আস, তুমি কি পেট্রোলের খরচ দিয়ে থাক?' বললাম, 'আমি যেদিন বাসা থেকে সরাসরি অফিসে আসি সেদিন নিশ্চয়ই লগবুকে আমার ব্যক্তিগত ব্যবহার লেখা হয় এবং নিয়মিত আমার মাস মাহিনা থেকে তা সরকার আদায় করে নেয় আর যেদিন বাসা থকে ডিএম সাহেবের বাংলো হয়ে অফিসে আসি সে দিন সরকারী কাজ লেখা হয় এবং ঐ দিনের গাড়ী ব্যবহারটা ডিউটি হিসেবে লেখা হয়।'

www.pathagar.com

মেজর সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। হাসতে হাসতে বললাম, 'মেজর সাহেব, ব্লাডি সিভিলিয়ানদের এ রকম বহু বাজে ধরনের নিয়ম-কানুন আছে। না বদলান পর্যন্ত এসব আমাদের মানতেই হবে।' তিনি সোজা বেরিয়ে গেলেন। বুঝলাম, ডিএম সাহেবের সাথে দরবার করবেন। আমি ডিএম সাহেবকে ফোনে যতটা সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় ঘটনাটা বলে রাখলাম। তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম যে, একটা দুষ্টামি করব মেজরকে শিক্ষা দেবার জন্য।

ঘন্টাখানেক পর ডিএম সাহেব জানালেন যে, মেজর সাহেব তাঁর কাছে গিয়ে আমার কীর্তি সম্বন্ধে জানিয়েছেন। শেষমেশ ডিএম সাহেব তাঁকে বলেছেন যে, আমি যা করেছি তা আইন মোতাবেকই করেছি। দেশে মার্শাল ল জারি হয়েছে। এখন একজন সরকারী কর্মচারী কি করে আইনের খেলাপ করতে পারে? তাছাড়া এই বিল না করলে তাঁকেই একদিন সামরিক আইনে এবং ডিপার্টমেন্টাল শাস্তির মোকাবিলা করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি কিছুই করতে পারছেন না আপাতত। তবে তিনি সামরিক শাসক হিসেবে একটা লিখিত আদেশ জারি করে দিলে ডিএম সাহেব এই বিল প্রত্যাহার করতে পারবেন।

পরদিন সকালে মেজর সাহেব তাঁর এজলাসে না বসে বিলটা নিয়ে আমার চেম্বারে ঢুকলেন। বসে পড়েই বললেন, 'আমি সামরিক অফিসার। আমি তোমাদের সিভিলিয়ানদের আওতায় পড়ি না। সুতরাং তোমার বিল তুমিই রাখ। আমি কিছুই জানি না এ সমস্ত। এখন তুমি কি করতে চাও?' আমি মনে মনে ভাবলাম, লোকটাকে আর একটু খেলাতে হবে। মাথা এখনো একটু উত্তপ্ত আছে মনে হচ্ছে। বললাম, 'ভেবে দেখি। আমাকে তো তোমার মার্শাল ল থেকে বাঁচতে হবে। কাল যদি তোমার হাবিলদার সাহেব এসে ইনকোয়ারি শুরু করে এবং সরকারী তহবিল তছরুফের অভিযোগ আনে তা হলে তো তুমিই আমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে, বেত্রাঘাত করবে, চাকরিটা নেবে আর জেলে পুরবে। আমার বাল-বাচ্চা রাস্তায় নামবে। খবরের কাগজে ফলাও করে রটবে এক সিএসপি অফিসার তহবিল তছরুফের দায়ে এই এই শাস্তি ভোগ করছে সুতরাং একটু ভেবে দেখি।' ডিএম সাহেব তাঁকে কি বলেছেন সে সম্পর্কে মেজর সাহেব আমাকে কিছুই বললেন না।

দু'দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন সকালে মেজর সাহেব আমার কামরায় ঢুকলেন। বললেন, 'তুমি কি ভেবেছ আমার সেই বিলটার বিষয়ে?' বললাম, 'ওটা আমি মিলিটারী একাউনটেন্ট জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেব ভাবছি। তিনি যদি মওকুফ করে দেন, দেবেন। আর ওখানে পাঠিয়ে সিভিল একাউনটেন্ট জেনারেলকে জানিয়ে দেব বিষয়টা যাতে আমার ওপর কোন গাফিলতির অভিযোগ না আসে। সরকারী রেভিনিউর বিষয়ে আমাদের কারই কিছু করার নেই।'

www.pathagar.com

তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিলিটারী একাউনটেন্ট জেনারেলের নাম শুনেই। বললেন, 'আমার চাকরিটাই যাবে তা হলে।' বললাম, 'কেন? তুমি বলবে তুমি সরকারী এবং মার্শল ল'র ডিউটি করেছ।'

তিনি বললেন, 'না না- আইনে যা আছে তার খেলাফ করে তো আর ডিউটি করা যায় না। দেখ নাজির, তুমি আমার ভাই। তা ছাড়া এখন তুমি আমার সহকর্মী এবং আমরা একটা টিম হয়ে এই জেলায় কাজ করছি। তোমার আর আমার লক্ষ্যের মধ্যে কোনই তফাত নেই। তুমি এসেছ সিভিল সার্ভিস থেকে আর আমি আর্মি থেকে এই যা তফাত। তাছাড়া আমি তো সব আইন-কানুন জানি না। তুমি আমাকে এ যাত্রায় সাহায্য না করলে আমার সার্ভিসে একটা খুব খারাপ ছাপ পড়ে যাবে। আমাকে ওঠিয়ে নেবে এখান থেকে এবং পরে কোর্ট মার্শাল করতে পারে।' আরো অনেক কথা। মনে মনে ভাবলাম, ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করার ইচ্ছাটা কোন্ আইন বা ডিউটিতে পড়েছিল? কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করে বললাম, 'ভেবে দেখব। ডিএম সাহেবের সাথে পরামর্শ করব এবং তারপর তোমাকে জানাব কি করা যায়। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।' বুঝলাম এই একটা মাত্র বিল তাঁর গত কয়েক দিনের ঘুম নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই ঘটনার পর ভাট্টি সাহেব হয়ে এলেন বেশ ঠান্ডা। ব্লাডি সিভিলিয়ানদের সঙ্গে অনেক নরম ব্যবহার করছেন। কোন কিছু করতে হলে ডিএম সাহেব এবং মাঝে-মধ্যে আমাদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করছেন। এই আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়েই তাঁর মাথায় আমরা ঢুকাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি যে, বেত্রাঘাত আর ১৪ বছরের 'বামুশাক্কাত কয়েদ হোগা' দিয়ে বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা যাবে না। ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দূর করতে হবে। অফিস-দপ্তরে স্বাভাবিক কাজকর্ম ফিরিয়ে আনতে হলে আবহাওয়ার পরিবর্তন দরকার। এ কথা সত্য যে, অফিস-দপ্তরে কাজের গতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভাট্টি সাহেব কিন্তু এখন জনসাধারণের পিটিশনের মধ্যে ডুবে আছেন এবং আস্তে আস্তে হাঁপিয়ে উঠছেন মনে হল। এক সন্ধ্যায় বলে ফেললেন যে, বেশীরভাগ পিটিশনই মিথ্যা এবং অন্যকে শত্রুতাবশে ঘায়েল করার জন্যই করা হয়েছে। বললেন, সরকারী অফিসারদের দূর্নীতি সম্বন্ধে তিনি আরো মনোযোগ দিবেন। ভাল কথা। তাঁর কাজে বাধাতো কেউ দিচ্ছে না। তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট চাইলেন। দেওয়া হল। এবার আমরা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সংযোজনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে ভেবে।

ইতিমধ্যে সরকারী অফিসারদের 'স্ক্রিনিং' শুরু হয়েছে। নানা গুজব নানা ভীতিপ্রদ গল্প রটান হচ্ছে। সম্ভবত সামরিক সূত্র থেকেই। এর মধ্যে একটা কথা বলা হয়নি। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ফরিদপুর সফরে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছিলেন। তাঁকে সার্কিট হাউজে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ডিএম সাহেব আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ সরকার বিষয়টি কিভাবে নেবেন, তা আমাদের ধারণার বাইরে। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছিল। একজন ভিআইপির প্রতি যা যা করণীয় আমরা তা করতে ত্রুটি করিনি। ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হল। দু'দিনের মধ্যেই ঢাকা থেকে জনান হল যে, একটা হেলিকপ্টার যাচ্ছে তাঁকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করার জন্য। আমরা আনন্দিত হলাম। অবশ্য তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নয়, আমাদের সিদ্ধান্ত যে সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে, সেটা বুঝতে পেরে।

এক দুপুরে অফিসে কাজ করছি। জেলা জজ মওদুদ সাহেব টেলিফোন করে জানালেন যে, চারটি বড় বড় খাম নিয়ে উর্দিপরা এক চাপরাশী ঢাকা থেকে তাঁর চেম্বারে এসেছে। তাঁর এক সাবজজের নামে একটা খাম ডেলিভারী দিতে। বাকী তিনটি খামের ওপর লেখা নামও তিনি পড়ে ফেলেছেন। একটি এসপি, দ্বিতীয়টি এডিশনাল এসপি এবং শেষেরটির ওপর আমার নাম লেখা আছে। সাবজজ সাহেবের খাম তাঁর সামনেই খুলে দেখা গেছে সেটি স্ক্রিনিং-এর কাগজপত্র। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তোমার নামে খাম আসলো কেন?' বললাম, 'বুঝলাম না। তবে আমাদের প্রেসিডেন্ট আমাকে দুর্নীতির দায়ে শত চেষ্টা করেও বাঁধতে পারবেন না।' ভদ্রলোক কিন্তু আমার কথায় চিন্তামুক্ত হলেন না। বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ পর ডিএম সাহেবের ফোন পেলাম। তিনি বললেন, 'নাজির, দুপুরে খেতে যাবার আগে আমার বাসায় এস।' বুঝলাম জজ সাহেব তাঁকে আমার নামের খামের কথা নিশ্চয়ই বলেছেন। খামের জন্য অপেক্ষায় রইলাম। সততার সাথে বলতে পারি, মনে ভয়ের কোন লেশ ছিল না। এটা মনে কোন দাগই যেন কাটল না।

প্রায় আধঘন্টা পর সেই উর্দিওয়ালা চাপরাশী আমার কামরায় পর্দা ঠেলে ঢুকে এক সালাম দিল। বললাম, কি? খামটি দু'হাতে আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেব এর জবাবটা আমাকেই নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনি হুকুম করলে আমি একদিন থেকে আগামীকাল ঢাকায় আপনার জবাব নিয়ে যাব।'

খাম খুলে মাথা গরম হয়ে গেল। লেখা আছে, 'অত্যন্ত জরুরী। মার্কিন মুল্লুকে ১২ জন সিনিয়র অফিসারকে উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান হবে। যাঁদের মনোনীত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আমাকে অন্য একজনের বদলি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমাকে যাঁর বদলি হিসেব নির্বাচিত করা হয়েছে সে ভদ্রলোক নারায়ণগঞ্জের এসডিও- এস কে মাহমুদ। ইনি আমার থেকে দু'বছরের জুনিয়র। পাঞ্জাব প্রদেশের লোক।

www.pathagar.com

চাপরাশীকে বলে দিলাম যে আমি পরে এই চিঠির জবাব দেব, কাল একটা টেলিগ্রাম পাঠাব। তুমি চলে যাও। সে একটু ইতস্তত করে বলল, ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেবকে কি বলব? তিনি আমাকে হাতে হাতে জবাব নিয়ে যেতে বলেছেন। বললাম, তাঁকে বল যে, ফোনে তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলব। এবং একটি তার তাঁকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেব।

চাপরাশী চলে গেল। ফোনে জজ সাহেবকে খামের বিষয়বস্তু জানালাম। আর খামসহ ডিএম সাহেবের বাংলোয় হাজির হলাম। চিঠি ও কাগজপত্র পড়ে ডিএম সাহেব বললেন, 'কংগ্রাচুলেশন'। বললাম, কিসের? বললেন, 'কেন, তুমি আমেরিকা যাবার জন্য নির্বাচিত হয়েছ বলে। জিজ্ঞেস করলাম, কাগজের ডান দিকের লিস্টের একজনও কি যাবে? বাম দিকে মূল ব্যক্তিরা আর ডান দিকে বদলিরা। বদলিরা যাবে মূল ব্যক্তিরা না গেলে। দেশে মার্শাল ল। তা ছাড়া কেউ আমেরিকা যাবার সুযোগ ছেড়ে দেবে নাকি? বদলিরা যেতে পারবে কেবল কেউ মারা গেলে। সে রকম কিছু আমি আদৌ কল্পনা করি না।

ডিএম সাহেব বললেন, 'কি করবে তুমি? সরকারের সিদ্ধান্তের বরখেলাপ করে আবার কোন ঝামেলায় পড়ে না যাও। সামরিক আইনের পাগলা ঘোড়া চারদিকেই ছুটে বেড়াচ্ছে।' বললাম, 'না– আমি তারবার্তায় লিখে দেব যে আমার জুনিয়রের বদলি হিসেবে আমি এ মনোনয়ন গ্রহণ করতে অপারগ এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি কোন ফরম পূরণ করতে পারছি না। যদি ন্যায়ভাবে নামের তালিকা প্রণয়ন করা হয় তবে আমি সব কিছু করতে রাজি।' বললেন, 'কোথায় তার পাঠাবে?' বললাম, 'কেন, করাচীতে– যেখানে এই চিঠির উৎপত্তি। এবং একই তার পাঠিয়ে ঢাকায় চিফ সেক্রেটারীর কাছে রিপোর্ট করব।' তিনি আমাকে নিরুৎসাহিত করলেন এই কারণে যে, সামরিক আইন তো কোন স্বাভাবিক আইন নয়। কি করতে কি হয়ে যায়, কিছুই বলা যায় না।

আমি বাসায় খেতে না গিয়ে নিজের দপ্তরে চলে এলাম। তারবার্তা দু'টো পাঠিয়ে ঢাকায় ডেপুটি সেক্রেটারী এইচ আর মল্লিকের সাথে ফোনে কথা বললাম। তারবার্তার কথা তাঁকে বলে দিলাম। তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন আমার এটা খুবই অন্যায় হয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই মনোনয়ন এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের ছ'জন অফিসারের নাম কে পাঠাল? নিশ্চয়ই এখানকার সরকারই পাঠিয়েছে। এবং সেটা আপনার দপ্তর থেকেই হয়েছে। যা হোক, আমি এটাকে অন্যায় বলে মনে করি এবং আমার সিদ্ধান্ত তো আমি কেন্দ্রীয় সরকারকেই জানিয়েছি আর কেবল আপনাদের অবগতির জন্য সেটাই রিপোর্ট করেছি মাত্র। ভদ্রলোক বেশ চটে গেলেন। আমিও ফোন ছেড়ে দিলাম।

www.pathagar.com

দশ দিন পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে একটা লম্বা তারবার্তা এল। সারকথা তারা আমাকেই মূল তালিকাভুক্ত করেছেন এবং মাহমুদকে বদলি তালিকায় দেখিয়েছেন। বলা হয়েছে, আমি যেন বিশেষ বার্তাবাহক মারফত সকল ফরমালিটি অনুসরণ করে করাচীতে নির্ধারিত তারিখে হাজির হই। এই তারবার্তা প্রাদেশিক সরকারের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তাদের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

তারবার্তার খবরটি ফোনে মওদুদ সাহেবকে বললাম। তিনি মহাখুশী। এরপর সেটি হাতে করে ডিএম সাহেবের বাংলোয় হাজির হলাম। তারবার্তাটি তাঁর হাতে দিলাম। পড়েই ওঠে দাঁড়িয়ে আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'নাজির, হাজার হলেও পাকিস্তান, ন্যায় বিচার আছে।' জবাবে বললাম, 'হ্যাঁ তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এই বস্তুটির খুবই অভাব। একজন পাঞ্জাবী সহকর্মীকে তুষ্ট করার জন্য এখানকার কর্মকর্তারা যাঁরা এখানকারই লোক, আমার ওপর অবিচার করেছিলেন।'

আমি যাবার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাঝখানে ঘটল আর এক বিপত্তি। কেন্দ্রীয় সামরিক সরকারের কৃষি মন্ত্রী, নেত্রকোনার অধিবাসী, ফরিদপুর সফরে এসে কৃষি উন্নয়নে মার্শাল ল জারি করতে চাইলেন। ডিএমকে বললেন, 'আপনার একজন এডিএমকে এই দায়িত্বে দিয়ে দিন। ডিএম সাহেব সবিনয়ে বললেন, একজন রেভিনিউ জয়েন্ট কালেক্টর আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে হায়ার ট্রেনিং-এর জন্য ইউএস-এ চলে যাবেন। মন্ত্রী শুনেই খাপ্পা। বললেন, তাঁর বিদেশ যাওয়া বাতিল করে দেওয়া হবে, তাঁকে কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়ে দিন। ডিএম সাহেব খুবই বিব্রত বোধ করলেন। আমি এখন কি করি? এত কান্ড করে যাওয়ার শিকা ছিঁড়ল- বিড়াল এসে এখন মাছটি নিয়ে পালাবার উপক্রম। মন্ত্রীকে বললাম, স্যার, আমি কিছু বলতে পারি কি? মন্ত্রী বললেন, বলুন। বললাম, স্যার, কৃষি উন্নয়ন করতে হলে কৃষি বিষয়ের কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই সেটা করা উচিৎ। রেভিনিউ-এর লোক কৃষি করলে কৃষির লোক কি চিকিৎসা বিভাগ চালাবে কিংবা একজন ম্যাজিস্ট্রেট কি ব্রিজ বানাবে? যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁকে দিয়েই তো সে কাজ করান ভাল। যাঁরা শাসন বিভাগে আছেন তাঁরা ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত হলেই সবচেয়ে ভালভাবে কাজ ওঠান যাবে। মন্ত্রীর রাগ হল কিনা জানি না, হঠাৎ প্রায় চিৎকার করেই জেলা কৃষি অফিসারের খোঁজ করলেন। অফিসার বেচারা উঠে দাঁড়াতেই তাঁর উপর একচোট ঝাল ঝাড়লেন মন্ত্রী। ভাবটা এই রকম যে, দেশের কৃষি ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য একমাত্র এই অফিসারটিই দায়ী। বকাঝকার পর আমার ঘাড়ে যে ভূতটি চাপানর চেষ্টা হয়েছিল তা এখন বেচারা জেলা কৃষি অফিসারের ওপর সওয়ার হল। আমি রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

www.pathagar.com

কেবল মন্ত্রী হাফিজুর রহমানই নন, আমার সহকর্মীদের এবং অন্যান্য পেশার লোকদের মধ্যেও ধরে আনতে বললে, বেঁধে আনার মনোভাবটি প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি। কেউ না চাইলেও আমরা তাঁকে প্রভুর আসনে (মনে মনে হলেও) বসিয়ে তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য, সত্যি বলতে কি, বাড়াবাড়ি করে ফেলি। এটা যেন আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় ট্রেনিং-এর ব্যাপারে আমার মনোনয়নের ব্যাপারে ঘাপলা, যাবার পূর্বক্ষণে কৃষি উন্নয়নের ধূয়া তুলে তা ঠেকাবার ব্যবস্থা, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রথমটিতে একজন উপ-সচিব আর দ্বিতীয় ঘটনায় একজন মন্ত্রী- এঁদের দু'জনের চরিত্র মূলত একইভাবে ফুটে উঠেছে।

থাক সে সব কথা। আমেরিকার ভিসার জন্য বুকের এক্সরে নিয়ে সেই ছবি দরখাস্তের সাথে দাখিল করতে হত। জানি না, কমিউনিজমের বীজ না ক্ষয় রোগের বীজ- কোনটা তাঁরা দেখত। ঢাকায় তাঁদের কনসাল জেনারেল একদিন আমাদের ডেকে বক্তৃতা করলেন। এরপর করাচী গমন, আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের বক্তৃতা এবং খানা। ওখানে দিন তিনেক রেখে আমাদের মগজ ধোলাই ঠিক নয় তবে মগজে কিছু পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা হল। আমরা ঢাকা থেকে করাচী টৌকিও হনুলুলু হয়ে লসএঞ্জেলেসের সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হলাম। দলে সর্বমোট বিশ জন ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাত জন এবং বাকীরা অন্যান্য প্রদেশ ও কেন্দ্র থেকে।

www.pathagar.com

লস এঞ্জেল্‌সের সূর্যাস্ত

প্রায় মাস তিনেক আমাকে ক্যালিফোরনিয়া স্টেটের লস এঞ্জেল্‌সে থাকতে হয়েছিল। পাহাড়ী এলাকা এটা। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বেশ বড় শহর। আধুনিক ঝলমলে মনোরম নগর। তবে সব সময়ই যেন একটু শীত শীত ভাব লেগে রয়েছে। সেখানকার ইংগেলউড নামক এলাকার সিটি কাউন্সিল প্রধানের সহযোগী হিসেবে তিনমাস কর্মরত ছিলাম। সেই সময় আমেরিকার মামলা-মোকদ্দমার বিভিন্ন প্রকৃতির সাথে পরিচিত হই। যেমন একবার দেখলাম এক ভদ্র মহিলা স্থানীয় এয়ার পোর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছেন। কারণ এয়ার পোর্টে প্লেন ওঠা-নামার শব্দে তাঁর ছোট ছেলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সুতরাং তাঁর দাবী- হয় এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দর অন্যত্র সরিয়ে নেবেন আর তা না হলে তাঁকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবেন। এই ধরনের নানা রকম মজাদার মামলার সাথে আমি রোজ পরিচিত হতাম। তবে অন্য এক ধরনের মামলা আমাকে নিয়মিতই শুনতে হত- তাহলো বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন। এখানে মামলার মোট সংখ্যার প্রায় নব্বই ভাগই ছিল সংসার ভাঙ্গার আবেদন।

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে ওখানকার নিয়ম হল ক্লাবে যাওয়া। বিভিন্ন ক্লাবগুলো আলো-ছায়ায় বেশ ভালই জমে ওঠে। কিন্তু কেন যেন সুদূর বিদেশ-বিভুই-এও মন ওদিকে টানত না। বোধ হয় হৃদয়ের গভীরে আমার নিসর্গ প্রেম একটু বেশী মাত্রায় রয়েছে। তাই এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়- পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায় সেই সব সবক-ই বেশী রকম কাছে টানে আমাকে। ফলে কর্মক্লান্ত দিনের শেষে চলে যেতাম একটা হ্রদের ধারে। সূর্যের আলোয় হ্রদের পানি ঝিল-মিল করত। ওখানে বসে আত্ম-সমাহিত হয়ে পড়তাম; ভুলে যেতাম পারিপার্শ্বিকতা। তন্ময় হয়ে চিন্তা করতাম আমেরিকার চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা। আবার মনের পর্দায় সহসাই ভেসে উঠতো ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাগুলো। তখন মনে হতো বাহ্যিকভাবে এদেশটা উন্নতি করছে ঠিকই তবে কোথায় যেন বিরাট একটা গলদ থেকে গেছে- যেজন্য তাদের সামাজিক তথা পারিবারিক জীবন ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এসব সাত-পাঁচ ভেবে বেশ মর্মযাতনা অনুভব করতাম। এইভাবে কেটে যেত সময়। তারপর হঠাৎ এক সময়

www.pathagar.com

দেখতাম অগ্নিগোলক সূর্যটা কোন ফাঁকে এসে ডুবে গেছে হ্রদের শান্ত শীতল পানিতে। তখন টের পেতাম সূর্যাস্ত। ফিরে আসতাম নীড়ে।

এইভাবে দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনমাস। আমি ফিরে এলাম ওয়াশিংটনে। ফিরতি পথ। তাই আমাদের জন্য বেশ কয়েকটা পার্টির আয়োজন করা হয়। আমেরিকায় যিনি আমার সঙ্গী হিসেবে ছিলেন তিনি হলেন হান। কোন একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিসেস ওয়াল্টার হান। বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা হচ্ছিল। এতদিনের চাপা কৌতূহলটা হঠাৎ প্রশ্নের আকারে ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার। মিসেস হানকে প্রশ্ন করলাম- 'আচ্ছা, আমি আপনাদের এখানে যে কটা মামলা শুনেছি তার মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বইটা হল বিবাহ-বিচ্ছেদের। এর কারণ কি?'

তিনি বললেন- 'এটা বুঝতে হলে আপনাকে আমেরিকার সামাজিক বিন্যাসের সাথে পরিচিত হতে হবে। প্রথমত আপনি আমাদের দাম্পত্য জীবনটাই দেখুন না।'

সকালে মিঃ হান ঘুম থেকে ওঠেন অফিসে যাবার তাড়া নিয়ে। উঠে চট-পট মুখ হাত ধোন এবং প্রাতঃক্রিয়াদি সারেন। এদিকে আমি নাস্তা তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অবশ্য নাস্তা বানাবার ফাঁকে ফাঁকে আমিও সকালের অন্যান্য কাজ সেরে নিই। তারপর দুজনে বসে গোগ্রাসে কোন রকমে নাস্তাটা গিলি। অতপর মিঃ হান ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেড়িয়ে যান। যাবার আগে 'হা ডালিং' বলে একটু আদরের পরশ বুলিয়ে দেন আমার গালে। তারপর দীর্ঘ আট ঘন্টা অফিসের ডিউটি আওয়ার তাঁর। অফিস থেকে বেড়িয়েই বিনোদনের জন্য উনি চলে যান ক্লাবে। সেখানে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে যখন তিনি বাসায় ফেরেন তখন তাঁর ভিন্নরূপ। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ তিনি। মুখ হাত ধুয়ে কোন রকমে রাতের আহারটা সেরে নেন। তারপর ঘন-ঘন হাই তুলতে তুলতে দু'-একটা সিগারেট টানেন। সেই ফাঁকে হয়তো ছোট-খাট পারিবারিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আলাপও হয়। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। তারপর তিনি তাঁর নিদ্রাতুর শরীরটাকে এলিয়ে দেন বিছানায়। সুতরাং ঘুমিয়ে পড়ি আমিও।'

'এবার বলুন, স্ত্রী হিসেবে আমি মিঃ হানকে চাই একজন সজীব স্বামীর ভূমিকায়। কিন্তু পাই না। এটা হল মুদ্রার একপিঠ। এবার ঘটনাটাকে অন্যদিক দিয়ে বিচার করুন। অফিসে মিঃ হানের একজন মহিলা সেক্রেটারী আছে সে আট ঘন্টা মিঃ হানকে পাচ্ছে তার কাছে; আর সেই মহিলা সেক্রেটারীটা বস হিসেবে মিঃ হানকে খুশী করতে সদা-সর্বদা ব্যস্ত। ফলে হানের ইচ্ছামতো সে সাজ-গোজ করে, পোশাক-আশাক পরে; এমনকি কথা-বার্তা ধরন-ধারনেও হানকে খুশী করতে ব্যস্ত থাকে সে। আর আমি? আমিও চাকরী করি আর এক অফিসে। এদিকে আমারও একজন বস রয়েছেন।

www.pathagar.com

তাঁর মনোরঞ্জনে আমাকেও ব্যস্ত হতে হয়। সুতরাং দুজনের জীবনে দুটি ভিন্ন স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে; কেবল রোববার ছাড়া।'

আবার বলেন মিসেস হান, 'এই ঘটনাকে শুধু আমাদের মনে করে সীমিত করবেন না। আসলে এই ব্যাপারটা আমেরিকার শতকরা নিরানব্বইটা দম্পতির ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যাবে।'

'ফলে যা হবার তাই হয়। এক ছাদের তলায় থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে বিভেদের প্রাচীর উঠতে থাকে। দাম্পত্য জীবনের যা মূলকথা তা হল 'আস্থা'। সত্যি বলতে কি এতেও চিড় ধরে। ফলে স্বামী-স্ত্রী হয়েও আমরা অনেক সময় পরস্পরের দিকে অবিশ্বাসের চোখ নিয়ে তাকাই। পরিণতিতে যা ঘটে তা হল বিবাহ-বিচ্ছেদ। সুতরাং আপনি যে বলছেন-শতকরা নব্বইটা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা শুনেছেন আপনি'-এটাই তো একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার। নিয়মমতো শতকরা নিরানব্বইটা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা কোর্টে আসা উচিত।'

'এখন বলুন, এই যে আমার এবং হানের বৈবাহিক সম্পর্ক ভাঙ্গনের মুখোমুখি, এজন্য অপরাধী কে? আমি না হান? আমার মনে হয় আমাদের দুজনের একজনও অপরাধী নই, প্রকৃত গলদটা রয়েছে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায়, সমাজ বিন্যাসে।'

অনেকদিন পর রমনা পার্কে লেকের ধারে বসে কেন যেন এই কথাগুলো আবার মনে হল। বোধ হয় কিছু কিছু এমন কারণও ঘটেছে যেগুলো অবচেতন মনে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আজকাল প্রায়ই শুনি নারী মুক্তি তথা নারী প্রগতির কথা। চাকরী-বাকরীতে নারীদের সমানাধিকার দানের কথা। কিছু বুদ্ধিজীবী নামধারী লোক নারীদের সমস্ত কাজে সমানাধিকার দানের নিশান-বরদার সেজেছেন।

অবশ্য নারী মুক্তির আমিও বিরোধী নই। সামাজিক কর্মক্ষেত্রে নারীদের অধিক হারে অংশগ্রহণ- আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি। কিন্তু মহিলাদের ব্যাপকভাবে বাইরের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ধুয়া তুলে যেমন তাদের রিকসা চালাতে বলাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না, তেমনি আমাদের এমন কিছু কিছু কাজ রয়েছে যেগুলোতে নারীদের যোগ দেওয়াটা বৃহত্তর সামাজিক মাপকাঠিতে ঠিক হবে না। ধীর-স্থির ও সুস্থ মাথায় যে কেউ চিন্তা করলে আশা করি এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবেন না। অবশ্য মহল বিশেষের ফাঁদে কেউ যদি আটকা পড়ে থাকেন সেটা ভিন্ন কথা।

তাই আজ সমাজকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে, যাঁরা সামান্যতম ভাবনা-চিন্তাও করেন তাঁদের মনে রাখা উচিত- নারী মুক্তি তথা নারী প্রগতির নামে আমরা যেন কোন সামাজিক ব্যাধি বা সমস্যা খরীদ করে না আনি। কারণ রোগ যখন একবার সমাজ দেহে ভাল মত জাঁকিয়ে বসবে তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সেই ভোগান্তির

www.pathagar.com

শিকার হতে হবে। আর আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের রোগ অর্থাৎ বাদশাহী রোগ- এই মনে করে আহলাদে আটখানা হয়ে অনেকে হয়তো তা এদেশে আমদানী করতে চাইবেন। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত পাশ্চাত্যের যত ধন-দৌলত আছে সেই তুলনায় আমাদের কিছুই নেই। আর এই দৌলতের যাদুতেই তারা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করছে। টাকার মোড়কে তারা তাদের বহু সামাজিক ব্যাধিকে ঢেকে রেখেছে, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ নুন আনতে আমাদের পান্তা ফুরায়।

আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের প্রায় দেশেই স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে তাদের ছেলে-মেয়েদের কোন অসুবিধা হয়না। কারণ সেসব দেশে শিশুদের জন্য বহু হোম বা আশ্রম রয়েছে। সেখানে তারা অত্যন্ত আদর-যত্নের মধ্যে লালিত-পালিত হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে বাপ-মা বেঁচে থাকা সত্বেও সেই ঘরের ছেলে-মেয়েরা এতিম-মিসকিনে পরিণত হয়; সামাজিকভাবেও তারা অবজ্ঞা ও বিদ্রুপের পাত্র হয়ে পড়ে। তাই পাশ্চাত্যের নারী মুক্তি তথা নারী প্রগতির কথা বলে যদি আমরা নারীদের সংসার বিমুখ করে যত্রতত্র চাকরিতে নিয়োগ করি তবে সেদিন বেশী দূরে নেই যে দিন আমাদেরও শতকরা নব্বইটা বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার সম্মুখীন হতে হবে। আর আল্লাহ না করুন সেদিন যদি আসেই তবে সেক্ষেত্রে শিশুপালন আমাদের এদেশে যে কি বিরাট সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। নারী-পুরুষের এ প্রসঙ্গে অন্যান্য ঝামেলার কথা না হয় বেমালুম বাদই দিলাম কিন্তু কেবল একটি শিশুপালন সমস্যাতেই গোটা জাতি অচিরে পঙ্গু হয়ে যাবে। আর যেকোন সমস্যা সৃষ্টি করা যত সহজ সমাধান করা তত সহজ নয়- এই সব সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতে তাকালাম আমার সুদীর্ঘকালের চিন্তার নীরব সঙ্গী সূর্যের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে তলিয়ে গেছে সূর্য। অগত্যা নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মন আমার নতুন প্রভাতের স্বপ্নে বিভোর!

www.pathagar.com

ডেভিডের প্রেতাত্মা

মার্কিন মুলুকের ট্রেনিং শেষ করে সঙ্গী-সাথীরা ভাবছিল অন্তত এক মাসের ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগত সফরে সময়টা উপভোগ করা যায় কিনা। আমিও চাচ্ছিলাম তাই। কিন্তু ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাস বাদ সেধে বসল। এ্যামবেসী আমাদের ট্রেনিং সংগঠকদের জানিয়ে দিল যে, আমাদের ট্রেনিং শেষ হওয়া মাত্র দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। কারণ আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর আমাদের পদোন্নতি দিয়ে জেলায় জেলায় ডেপুটি কমিশনার করে পাঠাবার জন্য ভীষণ উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন। প্রলোভনটি দারুণ। ছুটি, সফর, আনন্দ ইত্যাদি সব কল্পনাকেই এক নিমিষে বাতাসে মিলিয়ে দিল। সবাই কে কত আগে দেশে ফিরতে পারবে, তাই নিয়ে ভাবনা শুরু হল। কারণ, যে আগে যাবে সে ভাল পোস্টিং পাবে।

দেশে ফিরে কিন্তু এই আকাশ কুসুম ভাবনা প্রায় সকলেরই মুহূর্তেই উবে গিয়েছিল, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গী-সাথীদের। যতদূর মনে পড়ে, ফেরার পর কেউই সরাসরি পদোন্নতি পায়নি অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়নি। আমার নিজের কথা সব সময় ভিন্ন। এখানেও হল তাই। অন্যরা সকলেই ঢাকার সেক্রেটারিয়েট বা অন্যান্য দপ্তরে, মনের মত না হোক, একটা যুতসই পোস্টিং পেয়ে গেল। কিন্তু এই অধমের কপালে জুটল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অধীনে চাকরি। কারণ সম্ভবত এই যে, আমার ত্রিকুলে কেউ নেই যে একটু সদয় হবার জন্য সেকশন অফিসার বা সর্বশক্তিমান ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছে তদবির করবে। সতুরাং নিজেই গেলাম মল্লিক ভাইয়ের (এইচ আর মল্লিক) কাছে বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে নেবার জন্য।

'কি মনে করে এসেছ?' তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, 'আমাকে তো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডিপোজিট করেছেন। এখন যাবটা কোথায়- করাচী, পিন্ডি না অন্য কোথায়? যদি করাচী বা পিন্ডি যেতে হয় তা হলে চাকরিতে ইস্তফা দেবার কথা ভাবতে হবে আমাকে। আমার নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে যে জন্য এতদিন বিদেশে কাটিয়ে এসেই আবার প্রদেশের বাইরে পোস্টিং নিয়ে কাজ করা সম্ভব হবে না।' তিনি বললেন, 'না, তোমাকে আদমশুমারির চিফ কমিশনারের অধীনে প্লেস করা হয়েছে- পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম ডিভিশনের জয়েন্ট কমিশনারের দায়িত্ব নেবার জন্য।' বুঝলাম, 'চাকরিটা মোটেই আকর্ষণীয় নয়।' এটাও বুঝতে অসুবিধা হল না যে,

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এঁর কাছে সময় নষ্ট করে লাভ হবে না বলে চলে এলাম।

উচ্চতর প্রশাসনিক ট্রেনিং সমাপ্ত করে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সার্টিফিকেট বয়ে এনে নিয়োগ পেলাম একটা অপ্রশাসনিক দায়িত্বে। চট্টগ্রামে আমার স্বাভাবিক অভ্যর্থনাই হল। তবে যেহেতু প্রশাসনের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছি–হ্যাঁ, কক্ষচ্যুতও বলা চলে, সেহেতু সার্কিট হাউজে আমার ঠাঁই হল না। উঠলাম ওখানকার এক ডাকবাংলোয় (আজকাল এটা পর্যটনের সৈকত নামের মোটেল)। ওখানে অবশ্য ছিলেন মাহবুবুজ্জামান–এডিএম জেনারেল, আমার ব্যাচমেট। তাতে কি? সে আছে প্রশাসনের মূলধারায় আর আমি আছি একটি নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন জৌলুসহীন এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক ক্ষমতাহীন পদের অধিকারী হয়ে। চট্টগ্রামের ডিসি ছিলেন একজন সিএসপি জনাব আফজল আগা। প্রথামাফিক তাঁকে সালাম দিতে গেলাম এক সন্ধ্যায়। ভদ্রলোক পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য অফিসারদের মতই খুব আন্তরিক আর স্নেহমাখা ব্যবহার করলেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় উঠেছ?' বললাম, 'স্যার, বৌ–বাচ্চা নিয়ে উঠেছি ডাকবাংলোয়।' তিনি বললেন, 'সার্কিট হাউজে নয় কেন?' বললাম, 'অন্যদের অসুবিধা হতে পারে ভেবেই হয়ত আমাকে ওখানে কোন রুম বরাদ্দ করা হয়নি।' 'কেন, জামান তোমার ব্যাচমেট না?' তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে আমার ব্যাচমেট।'

আগা সাহেব তখনই এডিএম জামানকে ফোন লাগালেন। কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল। আমি বসে বসে বিব্রতবোধ করছিলাম। কারণ জামান আমার বন্ধু এবং ব্যাচমেট। সে ভাবতে পারে আমি তার বসের কাছে অভিযোগ করেছি তাই এই ফোন।

ফোন রাখার পর তাঁকে বললাম, 'স্যার, কোন সময় প্রয়োজন পড়লে যদি রুম খালি করে দিতে হয় সে অবস্থায় অসুবিধায় পড়তে পারি ভেবেই হয়ত জামান এ ব্যবস্থা করেছে। তার এ ব্যবস্থা আমারও অপছন্দ নয়। আমাকে একটা বাড়ী বরাদ্দ করে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। তিনি তৎক্ষণাত ডেপুটি কালেকটরকে ফোনে আদেশ করলেন যে, ফেয়ারী হিলের বাংলোকে দু'ভাগে ভাগ করে সামনের অংশটাকে আমার জন্য ঠিকঠাক করে বাকীটা মাহবুবুজ্জামানের নামে বরাদ্দ রাখতে। সময় মাত্র ৭ দিন।

আমি এসেছিলাম সালাম জানাতে সৌজন্যের খাতিরে, কিন্তু হয়ে গেল অভাবিত এ কান্ড। তাড়াতাড়ি জামানের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। সে অবশ্য কোন প্রতিক্রিয়া জাহির করল না। বলল ঐ বিরাট বাংলোয় তারা রাতে ভয় পায় কারণ কথিত আছে যে, বাংলোর সামনের দিকের একটা কামরায় এক বৃটিশ এডিএম–ডেভিড নাস্তা করাকালীন সময়ে গলায় মাছের কাঁটা বিঁধে মারা যান। সেই থেকে ডেভিডের অশান্ত আত্মা রাতে এক গ্লাস পানির জন্য ঘুরে বেড়ায়। এই আজগুবি গল্প

www.pathagar.com

আমি অন্যত্রও শুনেছি। আসলে এক সন্ত্রাসীর হাতে গুলি খেয়ে এডিএম ডেভিড ঐ বাংলোয় মারা গিয়েছিলেন। জামানকে বললাম, আমার নাম শুনে নাটোরে ভূত পালিয়েছে–এখানেও কোন ভূত আর আসর জমাতে পারবে না। আমি এলে দু'জন একত্রে থাকা যাবে।

বুঝলাম, ডিএম সাহেব অমায়িক হলেও কড়া প্রশাসক। নাহলে বাংলো ভাগাভাগি এবং সম্মুখের অংশ আমাকে প্রদান–বিশাল ক্ষমতাধারী এডিএম জেনারেল সাহেব এত সহজে হজম করে নিতেন না।

নতুন করে অফিস স্থাপন এবং সেটাকে কাজের উপযোগী করে সাজান, প্রয়োজনীয় কর্মচারী যোগাড় করে সেটাকে চালু করা, সে যে কি ঝামেলা–তার স্বাদ পেলাম এখানেই প্রথম। কারণ, এতদিন তো সাজান অফিস, গোছান এজলাস–এ নিয়েই কাজ করেছি।

এডিএম জামান এবং বিভাগীয় কমিশনার জনাব হাসান তোরাব আলী যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন। বিশেষ করে ডিসি সাহেব নিজে। তাঁকে বললাম, প্রয়োজনে আপনার নাম ভাঙ্গান যাবে? বললেন, বিলকুল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত একটা সরকারী জিপ সারিয়ে চট্টগ্রামে পৌছাতে দু'দিন সময় নিল। কারণ বেচারার স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। মাঝপথে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। যে ড্রাইভার জিপটি চালাচ্ছিল তার বাড়ীটা অবশ্য ফেনীতে। সুতরাং এক সাথে দু'টো কাজই হল, জিপের আরাম লাভ আর ড্রাইভারের বাড়ীতে একটু সৌজন্য সাক্ষাৎ।

এডিএম জামানকে বললাম, আমার জিপের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একজন ড্রাইভার যোগাড় করে দিতে। সত্যি সত্যি এক বৃদ্ধ নিম্নবর্ণের হিন্দু ড্রাইভার যোগাড় হল। বেচারার একটাও দাঁত নেই। তাই তার কথা বুঝতে কষ্টই হয় এবং চোখেও যে সে কতটুকু দেখে তা আল্লাহ্ই জানেন। কিন্তু লোকটা ছিল অত্যন্ত বিনয়ী এবং নরম মেজাজের। কখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী রাস্তায় গেলে রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে একটু–আধটু চা খাবার জন্য ছুটি চাইত। এসব ক্ষেত্রে বিশ–ত্রিশ মিনিট পর সে যখন ফিরে আসত তখন তাড়ির গন্ধে যাত্রীদের নাভিশ্বাস শুরু হত। বলা যায়, এই নিয়ে কম–বেশী দেড় বছর আদমশুমারির কাজে লিপ্ত রইলাম। প্রথমে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি থানা এবং ইউনিয়ন সফর শুরু করলাম আর আদমশুমারি এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বেড়াতে লাগলাম। আমার ধারণা, একটা উৎসাহ–উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করতে না পারলে কাজটি ঠিকভাবে করতে পারব না। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যানদের সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে ডিসি সাহেব এক

www.pathagar.com

ইশতিহার জারি করলেন। ফলে চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা আমাকে অভাবনীয় সাহায্য এবং সহযোগিতা করলেন। তাঁদের সঙ্গে এত হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল যে, আজ ত্রিশ বছর পরও তাঁদের স্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত নই এবং আমি যে তাঁদের নিজের লোক এটা তাঁদের ভালবাসার মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে ওঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সফর করলাম। কখনো হাতির পিঠে, পায়ে হাঁটা পথে, মানুষের পিঠে ঝুড়ির মধ্যে বসে। সত্য কথা বলতে কি কোন রকমের বাহনই বাদ দেইনি। মুরংদের এলাকায় ক্যাম্প করলাম, তাদের জীবনধারা অবলোকন করার জন্য। আমাদের এ ক্যাম্পটি ছিল তাদের এক হেডম্যানের বৈঠকখানায়। একদিনের কথা, পথে সন্ধ্য হয়ে গেল পথ চলতে চলতে। হেডম্যানের বাড়ি তখনো বেশ দূরে। আমার সাথে ছিল এক অফিসার এবং গাইড। রাতে জঙ্গলে ভয়ের কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে গাইড বলল, সরকারের নাম করলে জন্তু-জানোয়ার এমন কি নেকড়ে পর্যন্ত পালিয়ে যায়। আগে রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে এরা পালাত। এখন পাক সরকারের নামে পালায়।

খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম হাঁটতে হাঁটতে, বিশেষ করে চড়াই-উৎরাই করতে করতে। শেষে একটা বাড়ী পাওয়া গেল- তবে সেটা হেডম্যানের বাড়ী নয়। অগত্যা গেলাম সে বাড়ীতে। গাইড বাড়ীর ভেতর গিয়ে আমাদের পরিচয় দিল। সে ফিরে এসে জানাল, বাড়ীতে কোন পুরুষ নেই। যারা বাইরে আছে তারা রাতে ফিরবে না। বাড়ীতে এক বুড়ী, তার ছেলের বউ এবং দুটো বাচ্চা আছে। তবে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। রাতে থাকা যাবে।

বাড়ীটা বাঁশের পাটাতনের উপর। নিচে থাকে শুকর আর উপরে বাড়ীর লোকেরা। পাটাতন আবার দু'ভাগে ভাগ করা। ভেতরে থাকে বাড়ীর লোক আর সামনের দিকে থাকে কোন মেহমান বা বাড়ীর কোন পুরুষ। কাঠের গুড়ি সাইজ করে কেটে এবং যথাসম্ভব তা মসৃণ করে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সময়টা ছিল শীতকাল। বেশ ঠান্ডা পড়েছিল। চট দিয়ে তা রোধ করার ব্যবস্থা। মিনিট দশকের মধ্যে ভেতর থেকে গরম পানি এল আমাদের হাত-মুখ ধোবার জন্য। কিছুটা অবাক হলাম। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে একটা মুরগী, কিছু চাল এবং খানিকটা লবণ মহিলারা ঠেলে আমাদের কামরায় পাঠিয়ে দিল। আমরা গাইডকে খোঁজ করে পেলাম না। আমার অফিসার (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মরহুম আজিজুল ইসলাম) ভেতরের লোকদের কোনভাবে বুঝালেন যে, আমরা রান্না করতে পারব না। তাই আপনারা চালটা ফুটিয়ে দিন। মুরগী লাগবে না। লবণ-মরিচ দিয়েই রাতের খাওয়াটা চলে যাবে। আমরা খুব খুশী হয়ে খাব। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল 'ডবল ডি' লাগবে কিনা? এই 'ডবল ডি'টা কি জিনিস জানতে চাইলাম সহযাত্রীর কাছে। তিনি জানালেন এটা হচ্ছে বাড়ীতে

www.pathagar.com

তৈরি মদ– যা এরা প্রায় সকলেই পান করে থাকে। ভেতরের লোকদের বুঝান হল 'ডবল ডি'টি কিছুই লাগবে না, কেবল চালটা ফুটিয়ে দিলেই চলবে।

প্রচন্ড ক্ষিধে পেয়েছিল, তার ওপর পাহাড়ী পথ চলার ক্লান্তি। কখন যে কাঠের বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। হঠাৎ শুনলাম একটি পুরুষ কণ্ঠ– বাবু, সরকার বাবু উঠ। চা খাও। স্বপ্ন দেখছি নাকি! উঠে বসলাম। আজিজুল ইসলাম পাশে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। আমাদের গাইড জোড় হাত করে আমাদের দুজনকে চা খাবার জন্য ডাকছে। একটা টিনের বাটিতে গরম লাল চা থেকে ধুঁয়া উঠছিল। জিজ্ঞেস করলাম চা কোথা থেকে এল? সে জানাল, বাড়ীর যিনি মালিক সেই মহিলা মাত্র পাঁচ মাইল দূরে তাকে এক দোকানে পাঠিয়েছিল মেহমানদের জন্য চা–চিনি আনতে। সে এতক্ষণ ঐ কাজে ব্যস্ত ছিল। সে তার অনুপস্থিতির জন্য মাফ চাচ্ছিল হাত জোড় করে।

আজিজুল ইসলাম সাহেবকে ঘুম থেকে উঠালাম। ভেতরের মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে গেল। কোন বাঙালী পুরুষহীন পরিবারে হঠাৎ রাতে হাজির হওয়া বেগানা মেহমানদেরকে এইভাবে আপ্যায়ন করা হবে, এটা আমি কিছুইতে ভাবতে পারছিলাম না। আমাদের দেশের অন্যত্র দূরে থাক পশ্চিমা দেশের গ্রামাঞ্চলেও এটা পেতাম কিনা সত্যি সন্দেহ রয়েছে।

চা পান করার পর মনে হল আমাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর ভাত এল লবণ–মরিচসহ। সেদ্ধ মুরগীটাও আমাদের স্যামনে হাজির করা হয়েছে। কিন্তু খেতে সাহস পেলাম না। কৃতজ্ঞতাভরা মন নিয়ে বাকী রাত ঘুমিয়ে কাটালাম। সকালে উঠেই দেখি গরম পানি তৈরী, হাত–মুখ ধোবার জন্য।

রাঙ্গামাটির ডিসি সাহেব আমাদের ক্যাম্পে হাতী পাঠিয়েছেন। আমাদের আরো ভেতরে সফর করার জন্য। ঘটনাক্রমে আমাদের মেজবানের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়েই হাতী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমাদের ক্যাম্পে। ভালই হল। হাতীতে চড়েই রওয়ানা হলাম গন্তব্যপথে। আপ্যায়ন বাবদ কিছু টাকা–পয়সা মহিলাকে দিতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

শেষমেশ হাতীর পিঠে চড়ে পৌছলাম ক্যাম্পে। অর্থাৎ মুরংদের হেডম্যানের বাড়ীতে। তার বাড়ীর চেহারা–ছবি ও নির্মাণ প্রক্রিয়া, প্রায় ঐ একই রকম। হেডম্যান মাঝবয়সী লোক। ভাল বাংলা বলতে পারে। সরকারী অফিসারদের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে। এখানকার পুরুষরা যেমন একটা লেংটি পরে, মেয়েরাও তাই। আমরা হেডম্যানকে জোর করে একটা হাফপ্যান্ট দিয়ে বললাম, এটা পরে নাও। সে বলল, তোমাদের এ কাপড় পরলে আমার বউ আমাকে অসভ্য বলে ভেগে যাবে। তুমি

www.pathagar.com

'সরকার' হয়ে কি এটা চাও যে আমার স্ত্রীর সাথে আমার বিচ্ছেদ হোক। বুঝলাম এ কাপড় পরা আর না পরা কতটা স্পর্শকাতর বিষয়। মেয়েরা ঝরনার ধারে গোসল করতে যায়। হাতে তালি বাজিয়ে জানিয়ে দেয় যে তারা গোসল করতে যাচ্ছে। কোন পুরুষ মানুষ যেন সে দিকে না যায়।

পাহাড়ের ওপর ছিল বেশ ঘন জঙ্গল। এ জঙ্গলে ছিল জাম্বুরা বা বাতাবী লেবুর গাছ, আর ছিল এক ধরনের আলুর গাছ (কেশর আলু)। প্রায়ই নাস্তাতে এগুলো খেতাম।

একদিন পাশের বাড়ীর এক মহিলার বাচ্চা হল। ডেলিভারি এবং ডেলিভারি পরবর্তী বিশ্রাম করল মহিলাটি সর্বমোট ১ ঘন্টা। তারপরেই বাচ্চাটাকে পিঠের ঝোলায় ফেলে কাজে চলে গেল। এদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হল, একটা ষাঁড়কে কোন খোলা জায়গায় বেঁধে নারী-পুরুষ গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে আর গান গায়; মাঝে মাঝে ষাঁড়টিকে তীরবিদ্ধ করে রক্ত ঝরায় এবং এভাবে তারা সারারাত নাচতে ও গাইতে থাকে- ষাঁড়টা মারা না যাওয়া পর্যন্ত তার ওপর তীর চালনা অব্যাহত থাকে। মৃত ষাঁড়টিকে আগুনে পুড়িয়ে খায় তারা। বলাই বাহুল্য যে, সারারাত এই উৎসবে 'ডাবল ডি'-এর স্রোত বইতে থাকে।

আলাপে জানলাম তুলো কিনতে সমতল ভূমির মানুষরা এখানে আসে এবং দাদন করে। এসব ব্যবসায়ী যদি কোন মুরংকে ৫০ টাকা দাদন করে তবে তারা তার সব তুলো নিয়ে যাবে এবং বলবে যে এখনও তাদের টাকা পাওনা থাকল। আগামী মওসুমে এসে ঐ পাওনা টাকার তুলো নিয়ে যাবে। পঞ্চাশ টাকার সুদ বাবদ প্রতি বছর তুলো নিতে থাকবে। মূলটা সবসময় অপরিশোধিত থেকেই যাবে। হেডম্যান জানাল যে, এক মৌলবী সাহেব সমতল ভূমি থেকে এসে ইসলাম প্রচারের নামে একাধিক বিয়ে-শাদী করে এবং নানারকম অনাচারে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের রোষে পড়ে অবশেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। খৃষ্টান পাদ্রীরা অবশ্য চিকিৎসা ও সাহায্য দিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। হেডম্যান আমাকে খুব সতর্কতার সাথে জিজ্ঞাসা করল যে, এই যে 'ডেসিমল কয়েনের' প্রচার-প্রচারণা হচ্ছে সেটা পাহাড়ী মানুষদের ঠকাবার জন্য কিনা। বেশ বুঝলাম যে, পাহাড়ী মানুষদের সরলতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে আমরা সমতল ভূমির শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষরা চরমভাবে তাদের ঠকিয়ে যাচ্ছি যুগ যুগ ধরে। আমার ধারণায় বৃটিশ সৃষ্ট ভেদনীতিকে ১৯৪৭ সালের পরও অব্যাহত রেখে প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ী মানুষ আর সমতল ভূমির মানুষের মধ্যে পর্বত প্রমাণ আস্থাহীনতা এবং বৈষম্য জিইয়ে রাখা হয়েছে। আর এরই পরিণতিতে আজকের দিনের পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের সব মানুষ সমান, তারা যেখানে ইচ্ছে অবাধে সেখানে যেতে পারবে, বসবাস করতে পারবে-এটাই স্বাভাবিক। পাহাড়ী মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং তাদের সামাজিক চাহিদা মোতাবেক

www.pathagar.com

উন্নয়নের ত্বরিত ব্যবস্থা করা গেলে আস্থাহীনতা এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হত না। যাদের একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে রাখা হয় তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করবেই। এবং চৌহদ্দির বাইরে যারা তারাও ভেতরের মানুষদেরকে বিশেষ সুবিধাভোগী মনে করে হিংসা করবেই। হয়েছেও তাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু উপজাতি রয়েছে–তাদের কথা বর্ণনা করার অবকাশ এখানে নেই। ১০ দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আবার নিজ আস্তানা চট্টগ্রামে ফিরে এলাম। প্রতিটি ইউনিয়ন সদর ও থানা সদরে গিয়ে সভা করছিলাম আর মাঝে–মধ্যে চট্টগ্রাম সদরে ফিরে প্রাদেশিক কমিশনার এবং অন্তত একবার জাতীয় চিফ কমিশনারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মফস্বলের কিছু কিছু এলাকা ঘুরিয়ে দেখালাম। কিভাবে সমস্ত বিষয়টিকে সংগঠিত করা হয়েছে তা তাঁদেরকে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করালাম। বেসরকারী লোকদের সংগঠিত করা হয়েছে দেখে তারা বেশ খুশি হলেন।

চট্টগ্রামে থাকাকালীন সময়ের দুটো বিষয় উল্লেখ না করে পারলাম না। আমার আদমশুমারির কাজে আশাতিরিক্ত সমর্থন ও সহযোগিতা পেলাম স্থানীয় বিত্তশালী, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং পরিবারের প্রধানদের কাছ থেকে। এ মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং ফেনী শহরে। প্রাদেশিক সেন্সাস কমিশনার বেশ জোরের সাথে আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন তাঁর পৈতৃক বাড়ীতে যাই। আগেই বলেছি তিনি ফেনী মহকুমার (বর্তমানে জেলা) লোক। আমি ফেনী শহরে একাধিকবার সফর করলেও তাঁর পৈতৃক বাড়ীতে কখনও না যাওয়ায় সম্ভবত তিনি মনে মনে রুষ্ট হয়ে থাকবেন। আর তাই হয়তো পরবর্তী সফরসূচীতে তাঁর পৈতৃক ভিটা সফরও সংযুক্ত করলেন। তাঁর এই ব্যাগ্রতা এবং যাঁরা আমাকে অতিরিক্ত সাহায্য–সহযোগিতা করেছেন তাঁদের অনেকের অন্তরে একটি খায়েশ লুকিয়ে রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছিল। সেটি হচ্ছে, আদমশুমারি শেষে জেলাভিত্তিক যে সেন্সাস রিপোর্ট তৈরী হবে তাতে তাদের পরিবারের উল্লেখ যাতে করা হয় জেলার নামী–দামী, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ও বনেদী বংশ হিসেবে–সেটাই আমাকে বুঝিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা। সত্যি এসব দেখে বার বার এই ভেবে আমার নিজের ওপর করুণা হয়েছে যে, আমি আজো আমাদের সামাজিক জীবনের বহু কিছু সম্পর্কেই অজ্ঞ রয়ে গেলাম।

চট্টগ্রামে আমার অবস্থানকালে ১৯৬০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আর বিভীষিকাময় সয়লাবের কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। সেই মহাদুর্যোগের কয়েকদিন পূর্ব থেকে আবহাওয়া বেশ খারাপ চলছিল এবং ক্রমেই সেটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। মানুষের চোখে–মুখে একটা অজানা বিপর্যয়ের আতঙ্ক ছায়া ফেলেছিল। একদিন কোর্ট বিল্ডিং–এর তিনতলার এক কামরায় বসে কাজ করছি। আমার প্রধান সহকারী এসে

www.pathagar.com

বলল, 'স্যার, ছুটি দিতে হবে, কারণ রেডিওতে আট নম্বর বিপদ সংকেতের কথা বলা হচ্ছে, বৃষ্টিও বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিসির অফিসও ছুটি হয়ে গেছে। মানুষ যে যার বাড়ীতে চলে যাচ্ছে।' জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলাম পশ্চিম আকাশ কেমন যেন লালাভ অথচ আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। তাঁকে বললাম, 'ঠিক আছে, আপনারা সবাই বাড়ী যান।' তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল আসন্ন মৃত্যু যেন তাঁকে ইতিমধ্যেই ঘিরে ফেলেছে। নিজের এ বিপদের মধ্যেও তিনি আমাকে বাসায় যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। দুর্ভাগ্যের কথা, ঐ ভদ্রলোক আর কখনো চাকরিতে ফিরে আসেননি। বাড়ীতে পৌঁছেছিলেন ঠিকই কিন্তু সপরিবারে সর্বনাশা প্লাবনের পানিতে ভেসে গিয়েছিলেন।

সেদিন সবাইকে বিদায় করে বাসায় ফিরলাম। কোর্ট বিল্ডিং থেকে ফেয়ারী হিলের বাসা মানে একটা পাহাড় থেকে অর্ধেক রাস্তা নেমে পাশের পাহাড়ের চূড়ায় আরও অর্ধেকটা ওঠতে হবে। বলতেই হয় যে, বাতাসের প্রচন্ড দাপটের মধ্যে বহু কষ্টে এইটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছিল। পথে একটা বড় গাছের গোড়ায় তিনজন পুরুষ একজন মহিলাকে বৃষ্টির ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের ওখান থেকে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে বললাম। কারণ গাছটির উপড়ে যাবার মত অবস্থা প্রায় হয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ গাছ চাপা পড়ে অন্তত দুটি প্রাণী প্রাণ হারায়।

টেলিফোন লাইন আর বিজলী ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাসায় স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা সব দরজা-জানালা বন্ধ করে বসেছিল। রেডিও খুলতেই শুনলাম মহাবিপদ সংকেতের কথা। বার বার ১০ নম্বর সংকেত দেখাতে বলা হচ্ছিল। এরপর হঠাৎ করে রেডিও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বাতাসের বিকট আওয়াজ-যা জীবনে কখনো শুনিনি, শুনতে থাকলাম। কামরার পশ্চিম দিকের জানালার কাঁচের ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেছে। সমুদ্রের মহাগর্জন আর আকাশের বজ্রধ্বনি গোটা প্রকৃতিকে এক অবর্ণনীয় বিভীষিকায় পরিণত করেছিল। আরো দেখলাম বটের পাতার মতো বস্তু আকাশে উড়ছে। আসলে এগুলো ছিল মানুষের ঘরবাড়ীর টিন।

ফেয়ারী হিলে বহু পুরাতন দেশী-বিদেশী বড় বড় গাছ ছিল। এর অনেকগুলো উপড়ে গিয়েছিল; বাদবাকী গুলোর ডালপালা ভেঙ্গে অন্য কোথাও পাড়ি জমিয়েছিল। উড়ন্ত টিনগুলো কিছু কিছু আমাদের লন, উঠান আর বারান্দায় এসে পড়েছিল। লক্ষ্য করলাম বিজলীর তারও ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে।

এই তান্ডব বিকেল তিনটে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত সমানে চলল। তবে একথা বলতেই হয় যে, সন্ধ্যার পর বাতাসের ভয়াবহতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। রাত এগারটার দিকে অবশ্য ঝড়ের গতি অনেকটা কমে এল। আমার বাংলোর পেছনের অংশে একজন নতুন এডিএম সম্প্রতি এসে উঠেছেন। মধ্যরাতের পর ভাবলাম তাঁর

www.pathagar.com

একবার খোঁজ নেয়া দরকার। নূরু নামের একজন লোক আমাদের রান্নাবান্না ও বাজারের কাজে সাহায্য করত। সে রান্না ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে অবস্থান নিয়েছিল। বহু কষ্টে আমার কামরার দরজা একটু ফাঁক করতেই একরাশ দমকা বাতাস ঢুকে কামরাটাকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল। বাচ্চারা চিৎকার করতে থাকল আর আমি নিজে ধরাশায়ী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। সাথে সাথে ওঠে দরজার ফাঁক দিয়ে চিৎকার করে নূরুকে ডাকতে লাগলাম। বাতাসের প্রচন্ড আওয়াজ আমার ক্ষীণ কণ্ঠকে কোথায় ওড়িয়ে নিয়ে গেল। শেষে যখন দেখলাম চিৎকার করে লাভ নেই তখন বাইরে বেরিয়ে এলাম। রান্নাঘরের দরজায় লাথি মেরে মেরে নূরুকে ডাকতে থাকলাম। অল্প পরেই সে দরজা খুলে দিল।

অন্ধকারে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে টর্চের আলোয় বিজলীর তার, ভাঙ্গা টিন ও গাছের ডালপালা এড়িয়ে প্রতিবেশীর জানালা পর্যন্ত পৌঁছতে আমরা দুজন কম করে হলেও দশ বার ভূলুন্ঠিত হয়েছি। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। সেদিকে আমাদের কোন খেয়ালই ছিল না।

জানালায় লাঠির ক্রমাগত আঘাতের ফলে উত্তর দিকের একটা ছোট জানালা খুলে গেল। এক বৃদ্ধার মুখ। ভদ্রলোকের আম্মা। তিনি যা বললেন তা এই যে, তাঁর ছেলে অবস্থার ভয়াবহতা দেখে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর খাটের নিচে শুয়ে আছেন। এতক্ষণ তিনি আর তাঁর ছেলের বউ তাঁর শুশ্রুষা করছিলেন। আমি খোলা জানালা দিয়ে চিৎকার করে ভদ্রলোকের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম, 'আরে বাইরে আসুন।' বাতাসের গতি কমে গেছে, ভয়ের কিছু নেই।

কিছুক্ষণ অব্যাহত চিৎকারের পর ভদ্রলোক সত্যি সত্যি জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, বসার ঘরের দরজাটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বুঝলাম, তাঁদের কারো কোন শারীরিক ক্ষতি হয়নি। কিছুক্ষণ পর নিজের বাসায় ফিরে এলাম। সকাল হল। এক নতুন বিপদ, খাবার পানির অভাব। বাইরে গিয়ে যে পানি সংগ্রহ করব সে অবস্থাও নেই। কারণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বিজলীর ছেঁড়া জীবন্ত তার এবং দুমড়ান-মুচড়ান টিন।

কিন্তু যত বিপদই হোক, পানির ব্যবস্থা তো করতেই হবে। পাহাড়ের নিচে দেখলাম ছোট ছোট বালতিতে পানি বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু আমরা পাহাড় থেকে নামার একমাত্র সিঁড়ি অতিক্রম করতে পারছিলাম না। বড় বড় গাছ, উড়ে আসা টিন আর বিজলীর তার পড়ে রয়েছে সিঁড়ি আগলে। শেষ পর্যন্ত মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মেয়েদের শাড়ি কাপড়ের পাড় জোড়া দিয়ে বেশ লম্বা একটা রশি তৈরি করা হল। মুখবন্ধ ছোট একটা ড্রাম রশির এক প্রান্তে বেঁধে নিচে নামিয়ে দিলাম। সাথে ড্রামের ভেতর দিয়ে দিলাম ১৫টি টাকা। তিন বালতি পানি ড্রামে ভরে দিল পানি বিক্রেতারা।

www.pathagar.com

প্রতি বালতি পানি বিক্রি হচ্ছিল পাঁচ টাকা হিসেবে। আস্তে আস্তে ড্রামটি টেনে উপরে তোলা হল এবং সেটা সারাদিনের সঞ্চয় হিসাবে থাকল।

বেলা বারটা নাগাদ আমাদের পাহাড়ে ওঠা-নামার সিঁড়িটা কিছু পরিষ্কার করা হল। কিছুক্ষণ পর একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রবর্তক সংঘের একজন কর্মকর্তা আমাদের বাসায় এলেন- আমরা বেঁচে আছি কিনা দেখতে। জানতে পারলাম রিয়াজউদ্দীন বাজারের প্রায় সব দোকান লুট হয়ে গেছে ঝড়ের মধ্যেই। শুনলাম বহু মানুষ গাছ ও মাটি চাপা পড়েছে। হালিশহর আর পতেঙ্গার দিকের কোন খবর তখনো জানা যায়নি। কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার শহরে নেই। ঢাকা গেছেন তাঁরা কনফারেন্স করতে। অতিরিক্ত কমিশনার সিএসপি কেরামত আলী সাহেব ছিলেন দায়িত্বে। ঢাকার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। গুজব রটেছে যে, কমিশনার সাহেব ঢাকা থেকে সড়ক পথে আসতে গিয়ে ফেনীতে আটকা পড়েছেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সারওার জাহান চৌধুরী, প্রবর্তক সংঘের কর্মকর্তা এবং আমি গেলাম একটা জিপ যোগাড় করা যায় কিনা সে উদ্দেশে। শেষমেশ ডিসির পুল থেকে একটা জিপ, কিছু মোটা দড়ি, দুটো কুড়াল, কিছু পানি এবং এক বস্তা চিড়া নিয়ে আমরা বিমানবন্দরের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হলাম। রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে একপা একপা করে এগিয়ে প্রায় বিমানবন্দর পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেলাম। পথে মানুষজন কমই দেখলাম। কর্ণফুলীতে ভাসতে দেখলাম বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ও বাচ্চাদের লাশ। কর্ণফুলীকে অত্যন্ত শান্ত মনে হচ্ছিল- যেন সে কিছুই জানে না। আর সমুদ্র? সেতো একেবারে নির্লিপ্ত এবং অতিমাত্রায় বিনয়ী- নিজের পথে বয়ে যাচ্ছে এক মনে।

দূর থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মনে হল, আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। আমরাও তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটির বয়স পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব। আমাদের দেখেই তিনি একপাটি জুতো আমাদের দিকে মেলে ধরে বললেন, এটি আমি এনেছি। তাঁর বলার ধরন থেকে মনে হল যে, একটি মহামূল্যবান বস্তু তিনি ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। বুঝলাম যে, তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছেন। তাঁকে পানি খাইয়ে চিড়া দিলাম চিবাতে। আস্তে-ধীরে জানতে পারলাম তাঁর পরিবারের নয় জন লোকের সবাই ভেসে গেছে পানির তোড়ে। তাঁর বড় ছেলে গাছের উপর উঠেছিল, ওটা ছিল প্রাণ বাঁচানর সর্বশেষ আশ্রয়। কিন্তু নিজেকে সে বাঁচাতে পারেনি- গাছ শুদ্ধই ভেসে গেছে।

তাঁকে জিপে বসিয়ে আরো কিছুদূর অগ্রসর হলাম আমরা। কিছুসংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। তাদের সবাইকে এয়ারপোর্টের একটি বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে ফিরে এলাম। কমিশনার বা ডিসি কেউই ঢাকা থেকে আসতে পারেননি। ঢাকা থেকে অবশ্য ওয়ারলেসে যোগাযোগ হয়েছে। তাঁরা আসতে চেষ্টা করছেন। আগামীকাল

www.pathagar.com

পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন। আমরা অতিরিক্ত কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। আমাদের কথা শুনে তিনি একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। মনে হল আমাদের 'অ্যাডভেঞ্চার' তাঁর খুব একটা পছন্দ হয়নি। তিনি নিজ উদ্যোগে কিছু করতে অপারগতা দেখালেন। তিনি ওপরের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন।

সবার মুখে এক প্রশ্ন– কতজন মারা গেছে? কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য সরকারী কোন উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি। এটা আমাদের শাসনযন্ত্রের ত্রুটি না কোন শাসনকর্তার ব্যক্তিগত অক্ষমতা– সে কথাই ভাবছিলাম। তাছাড়া অতিরিক্ত কমিশনার সাহেব ঘোষণা দিলেন যে, মাত্র তিন জন মারা গেছেন। অথচ সেই সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, তিনি সরকারকে যখন মৃতের সংখ্যা তিন বলে জানিয়েছেন তখন ঢাকায় বসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার গুরুত্ব খাটো করে দেখেছেন। এসব কান্ড-কারখানা দেখে আমি খুব মর্মাহত হলাম। ভদ্রলোক সিভিল সার্ভিসে আমার অগ্রজ, তাই তাঁর সঙ্গে মতবিরোধে লিপ্ত হতে চাইলাম না। তাছাড়া আমি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি গৌণ এবং অপ্রশাসনিক দায়িত্বেনিয়োজিত।

বিবেকের তাড়না থেকেই আমি অতিরিক্ত কমিশনার সাহেবকে জানালাম যে, আমার ব্যক্তিগত সেবা আপনার কাছে সমর্পণ করছি। উদ্ধার ও সাহায্যের কাজে আপনি আমার খেদমত নিতে পারেন–দিন বা রাত্রি যে কোন সময়। তিনি আমাকে কোন কাজ না দিয়ে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করলেন। মনটা মুষড়ে গেল। মানুষ কত হৃদয়হীন হতে পারে। যিনি মৃতপ্রায় মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়াতে গিয়েও ওপরের নির্দেশের অপেক্ষা করেন, তাঁর কথা আর কি বলব।

ঘটনার তৃতীয় দিনে, জানা গেল, প্রাদেশিক গভর্নর লেঃ জেঃ আজম খান আসবেন ঢাকা থেকে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে। তিনি হেলিকপ্টার করে ত্বরিত আসলেন না কেন এবং প্রথম দিনই আসলেন না কেন– এটা আজো আমার মনে একটা প্রশ্ন হয়ে রয়েছে।

গভর্নর সাহেব এসে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের সভাকক্ষে সব দফতরের অফিসারকে ডাকলেন। সামরিক ভাষায় যতরকম শ্লীল এবং অশ্লীল বিশেষণ আছে সব মিশিয়ে অফিসারদের বকাবকি করলেন। বড় অফিসারদের বললেন, মাঠে মাঠে ঘুরে কাজ তদারক করতে। এও বললেন, এই দুর্যোগের সময়ও যারা আরাম কেদারায় বসে থাকবে তাদেরকে সেই চেয়ারের সাথেই গাম দিয়ে সেঁটে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

এক ঘন্টা ননস্টপ বকাবকির পর সবাইকে ছেড়ে দেয়া হল। সভাকক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে গভর্নর আজম খান মোটা-সোটা লোকদের ঘাড়ে হাত রেখে তাঁদের চর্বি কমাবার পরামর্শ দিলেন আর সবার সাথে করমর্দন করলেন। আমি বেচারা রোগা-পাতলা মানুষ। তিনি আমাকে জিজ্ঞাস করলেন কি কাজ কর? বললাম, 'স্যার, পপুলেশন সেন্সাস।' ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'কতজন মারা গেছে?' বললাম, 'স্যার, সরকারতো আমাকে জীবন্ত মানুষের মাথা গুনতে পাঠিয়েছেন, মৃত মানুষের নয়।' তিনি আমার উত্তর শুনে আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ।'

সত্যি কথা বলতে কি আমি এ সভা থেকে অনেকটা নিরাশ হয়েই ফিরলাম। উদ্ধার কাজ বা সাহায্যের কথা বিশেষ কিছু হল না, কেবল অফিসারদের কর্মঠ হবার জন্য বকাঝকা করা হল। এতবড় মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় আর প্লাবনের পরও 'বিগ কাউন্ট' বা চূড়ান্ত গণনা ঠিক সময়েই হল। চূড়ান্ত গণনার আগে প্রাদেশিক পর্যায়ে একটি সম্মেলন হল গণনা তদারককারী কর্মকর্তাদের। সিদ্ধান্ত হল যে, ঢাকা শহরকে সিটি (মহানগর) পর্যায়ে যেভাবেই হোক উন্নীত করতে হবে। তা না হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় শহরের সঙ্গে পাল্লা দেয়া যাবে না। সুতরাং ঢাকা শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোকে এর ভেতর শামিল করে যে করেই হোক লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ আর চট্টগ্রামে অন্তত তিন লক্ষ দেখতে হবে।

আদমশুমারির কাজটি যত নিরস এবং একঘেঁয়ে মনে হয়েছিল পোস্টিং পেয়ে-কাজ শেষ করে মনে হল, একাজ করতে গিয়ে আমি আনন্দ পেয়েছি অনেক। দেশের পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক সফর করে বিরাট জনগোষ্ঠীর সাথে মিশতে পেরেছি। তাদের গ্রাম্য জীবনের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি একান্তভাবে। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকার মানুষগুলোর জীবন ধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটায় আমার নিজের সামান্য অভিজ্ঞতার ভান্ডারে কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছি আর আমার বুড়ো জিপের ততোধিক বুড়ো ড্রাইভারের বেপরোয়া ড্রাইভিং-এ জীবনের ঝুঁকি থাকলেও আনন্দের কমতি ছিল না। প্রতি দশ মাইল যাবার পর গাড়ী থামিয়ে গাড়ীর মাথায় পানি ঢালা, দশ মাইল ধোঁয়া ছাড়া-এ আমাকে যে কি আনন্দ দিত তা কাগজে-কলমে ব্যক্ত করা যাবে না।

প্রাদেশিক সেন্সাস কমিশনার ইতিমধ্যেই চিফ কমিশনার হয়ে গেছেন। ঐ পদে একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে নিয়োগ করা হল। আমি আদমশুমারির দফতর থেকে রেহাই চেয়ে জোর গলায় চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম এবং সেই সাথে অসহযোগের কথাও জানিয়ে দিলাম। চিফ কমিশনার বুঝালেন, আদমশুমারির রিপোর্ট হচ্ছে চিরস্থায়ী একটা রেকর্ড। সেটা তুমি যদি তৈরী করে যাও তোমার নাম চিরদিন থেকে যাবে। তবে আমি অমর হতে রাজী হলাম না।

www.pathagar.com

চার হাজারী নয়– দু' হাজারী

আমার প্রচেষ্টা সফল হল। ঢাকায় বদলি হয়ে এলাম। এবার প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কর্তারা আমাকে শিক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী (উন্নয়ন) হিসেবে নিয়োগ করলেন। আমি মনে মনে খুশি হলাম। কারণ জেলার ডিসি হয়ে যাবার আগে সচিবালয়ের কাজকর্ম এবং এখানকার সিস্টেমটি রপ্ত করে নিতে পারলে জেলার প্রশাসনিক কাজ আমার জন্য সহজ হবে।

ঢাকায় কিন্তু সপরিবারে থাকার বাসস্থানের চরম অভাব। সুতরাং চট্টগ্রাম থেকে এসে উঠলাম রমনা রেস্টহাউজের এক কামরায়। এই জায়গাটা একেবারে বাজারের মত। মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে সপরিবারে থাকা এখানে খুবই মুশকিল। কামরার পেছনের বারান্দায় রান্না করার ব্যবস্থা। আর সামনের বারান্দা চীনাবাদাম বিক্রেতা এবং মাথার তেল মালিশ করনেওয়ালাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এখানে দু'মাস থাকলাম। গণপূর্ত সেক্রেটারী ছিলেন আমাদের সার্ভিসের অগ্রজ জনাব মুয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। আমাকে খুব স্নেহ করতেন তিনি। তাঁর কাছে বেশ কয়েকদিন ধরনা দিলাম। সবসময় তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতেন আর বলতেন বাসা খালি হলেই তোমাকে দেব। এটা একটা রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

শুধু জনাব চৌধুরীর কথার ওপর ভরসা করেই থাকলাম না। আমি নিজেও খোঁজ-খবর রাখতে লাগলাম। একদিন জানতে পারলাম, এলিফেন্ট রোডের ফ্লাট বাড়ী 'নাশেমনে'র তিন তলায় একটা ফ্ল্যাট তিন-চার মাস যাবত খালি পড়ে আছে। ভাবলাম, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামাই শ্রেয়। ট্রাক ভাড়া করে মালপত্র নিয়ে দরোজার তালা ভেঙ্গে ফ্ল্যাটটি দখল করে বসলাম।

এরপর শুরু হল জবাবদিহির পালা। বলা হল, যা করেছি সেটি কেবল অন্যায় নয় ক্রিমিনাল অফেন্সও। জবাবে বললাম, এটা অফেন্সই নয় তাই ক্রিমিন্যালিটির প্রশ্নই ওঠে না। যাঁরা তিন-চার মাস বাড়ী খালি রেখে আমার পরিবারকে অনর্থক কষ্ট দিয়েছেন তাঁরা অফেন্স করেছেন এবং ক্রিমিন্যালও বটেন।

মহা সমস্যা এবার। প্রাদেশিক সরকারের বাড়ীর ভেতর এ জাতীয় অন্যায় এবং বিশৃংখলা- তাও আবার একজন দায়িত্বশীল সিএসপি ডেপুটি সেক্রেটারী কর্তৃক- এটা

www.pathagar.com

কি করে হজম করা যায়। আমি ভাবলাম, সমস্যাটা তো আমার নয়, আমার যা করার তা তো আমি করেই ফেলেছি। এখন দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়।

চৌধুরী সাহেব একদিন আমাকে তলব করলেন। চিফ সেক্রেটারী খুব চটে আছেন। তাই আমাকে সত্বর ফ্ল্যাটটি ছাড়তে হবে। আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম, কাজটি আমার দ্বারা হবে না। বাসা খালি রেখে আমাকে মিথ্যা হয়রানি করা হয়েছে- চিফ সেক্রেটারী আগে এই অন্যায়ের বিচার করুন, তারপর হবে আমার বিচার। তা যদি না হয় তবে পুলিশ দিয়ে আমাকে ওখান থেকে বের করতে হবে। আমি স্বেচ্ছায় ছাড়ছি না।

শেষ পর্যন্ত রফা একটা হল। বলা হল, বেইলী রোডের 'আসিয়ান বিল্ডিং'-এ ঠিক একই রকম একটা বাসা আমাকে দেওয়া হবে। তবে 'নাশেমন'-এর ফ্ল্যাটটি আমাকে ছাড়তে হবে। বললাম, একই রকম বাসা যদি হয় তবে 'আসিয়ান'-এ নতুন লোক পাঠান, আমাকে দিয়ে অহেতুক কেন মালপত্র টানা-টানি করাবেন? কর্তৃপক্ষ আমার যুক্তি শুনতে রাজি নন। সরকারী গাড়ী আমার মালপত্র বহন করে দেবে- অবশেষে এই শর্তে বেইলী রোডের বাসায় যেতে রাজি হলাম। সরকারের মুখরক্ষা করতে।

আবারো বলতে বাধ্য হচ্ছি, ১৯৪৭ সালে আমরা ভারত ভাগ করে স্বাধীন হয়েছিলাম। পুনরায় ঝান্ডা বদলিয়ে '৭১ সালে স্বতন্ত্র দেশ বানিয়েছি। কিন্তু সরকার পরিচালনা পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন, আইন-বিধি কোন কিছুই কি বদলেছে?

স্মৃতিচারণের গোড়াতেই উল্লেখ করেছিলাম যে, নাটোরে রিলিফের কনটিনজেন্সি ফান্ড থেকে একটা জিপ কিনে সরকারকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলাম। সরকারের কিছুই করার ছিল না। কারণ সরকারী আইনে ফাঁক রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সদর দপ্তরের ওপর তলার সাহেবরা তাঁদের কি আছে আর কি নেই- সে খবর রাখার সময় পান না। শাসনযন্ত্রের এই অনড় অবস্থায় কোন কিছুরই যে সঠিক হিসাব ছিল না, তার প্রমাণ ক্ষুদ্র হলেও এখানে তা তুলে ধরলাম।

বাংলাদেশের শাসনযন্ত্রের অবস্থা আমার জানা নেই। আমার পরে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন। আমি আমার সময়কার কথাই বলছি। একটা ফ্লাট চার মাস খালি পড়ে আছে। অথচ সরকারের একজন দায়িত্বশীল সেক্রেটারী বারবার বলছেন, কোন ফ্ল্যাট খালি নেই। এর অর্থ হল তাঁকে বাস্তব অবস্থা জানান হচ্ছে না। নিচের কোন কর্মকর্তা বিশেষ কারণে সেটি খালি রেখেছেন। অথচ মফস্বল থেকে ঢাকা বদলি হয়ে এসে কর্মচারীরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফিরছেন। এ রকম অবস্থায় কোন কর্মচারীর মনেই সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা বা আনুগত্য বোধ বাড়বে না। এ কথাটা বোঝানর জন্য আমার এ দুষ্টকর্মের অবতারণা।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী (উন্নয়ন) হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছি। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কতগুলো স্কুল-কলেজ ছিল যেগুলোর ওপর সরকারের কোনই নিয়ন্ত্রণ ছিল না; না পাঠ্যক্রমের না ব্যবস্থাপনার ওপর। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অসহায় বোধ করতেন এ সব প্রতিষ্ঠানে কোন সমস্যা দেখা দিলে। সরকার যেহেতু এগুলোতে গ্রান্ট ইন এইড দেয় না সুতরাং কোন প্রকার আগ্রহও দেখায় না।

বিভাগীয় সেক্রেটারী এবং ডিপিআই সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ অবস্থান লোপ করে অন্য আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের স্টেটাস দেবার উদ্যোগ নেয়া হল। প্রথমত সিলেবাস একই রকম করার এবং স্থানীয় প্রশাসনকে জড়িত করার পরামর্শ দেয়া হল। আপত্তি ওঠল খৃষ্টান পাদরিদের পক্ষ থেকে এবং কুমিল্লার মহেশ্বর পাঠশালা আর মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমস-এর তরফ থেকে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিলেবাসের বিষয়টি মোটামুটি সহজেই সমাধান হল। তাঁরা সবাই সরকারী সিলেবাস মেনে নিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনায় তাঁদের একচেটিয়া অধিকার ছাড়তে রাজি হলেন না।

একদিন সকালে সেক্রেটারী সাহেব তাঁর কামরায় তলব করলেন। গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক তাঁর সাথে কথা বলছেন আর ক্যাপস্টেন তামাক দিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। সেক্রেটারী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন। জানলাম ইনি আরপি সাহা। কথাবার্তার ধরন থেকে বুঝলাম তাঁর প্রতি সেক্রেটারী সাহেবের সহানুভূতি ও সমীহ- দুটোই আছে।

সাহা বাবু আমার দিকে তামাক এগিয়ে দিয়ে সিগারেটের কাগজ বের করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমি নিজের ব্রান্ড ছাড়া সিগারেট খাই না।

পরবর্তী কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, স্কুলগুলোর সাধারনীকরণ প্রক্রিয়া তাঁর মনঃপূত নয় এবং সেজন্য তিনি দেন-দরবারে এসেছেন। সেই সঙ্গে পরবর্তী রোববারে মির্জাপুরে অনুষ্ঠিতব্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি আমাদের দাওয়াত করতে চান। আমি বিনীতভাবে জানালাম, দাওয়াত কবুল করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, আমি অন্য কাজে সেদিন ব্যস্ত থাকব।

সেক্রেটারীর রুমে তলব করে দাওয়াত দেয়াটাকে আমি আসলে সহজভাবে নিতে পারিনি। তাঁর মির্জাপুরের আস্তানা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমার কাছে কিছু কিছু খবরা-খবর জমা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গ এখন থাক, পরে বলব।

প্রদেশের গভর্নর তখন লেঃ জেঃ আজম খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ডক্টর মাহমুদ হোসেন। এ সম্বন্ধে এককথায় বলা যায়, সবার

www.pathagar.com

অজান্তেই তিনি সবার কাছ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিলেন। এমন অমায়িক এবং এত বিদ্বান ব্যক্তিত্ব না হলে কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মানায়! তাঁর স্নেহ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটির মিটিং-এ তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি।

এ সময় একটা বিষয় খুব গুরুত্বসহকারে বিচার-বিবেচনা করা হচ্ছিল শিক্ষা দপ্তরে এবং বিষয়টিতে গভর্নর স্বয়ং জড়িত ছিলেন। বিষয়টি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যত্র সরাতে হবে। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিকেও শহরের বাইরে সরানর পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। স্থান নির্বাচনের জন্য একাধিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। দিনের পর দিন আলোচনা চলছিল, মনে হচ্ছিল- এ আলোচনার বুঝি আর শেষ নেই। বুঝতে পারলাম, এটি আসলে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

একদিন বিকেলে বিষয়টির ওপর 'ফাইনাল মিটিং' হবে বলে গভর্নর হাউজ থেকে আদেশ পেলাম। যথারীতি সকলকে এ ব্যাপারে জানান হল এবং নির্দিষ্ট সময়ে মিটিংও হল। দেখলাম গভর্নর সাহেবের মেজাজ বেশ গরম। তিনি নানা কথাবার্তা বলে শেষে নির্দেশ দিলেন, আর আলোচনা নয়। ঐ দুটো প্রতিষ্ঠানকেই ঢাকা মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে অবশ্যই স্থানান্তরিত করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অতি সত্বর বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে কড়া নির্দেশ দেয়া হল। সভার কার্যবিবরণী লিখে পরদিন সকালেই লাট সাহেবের দস্তখত নিয়ে সবার কাছে নির্দেশনামা পাঠাতে হবে। ভাবলাম, শহরে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার খাতিরে হয়ত কাজটা করা হচ্ছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যাবে তো? তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে, এই নিয়ে আর মিটিং করতে হবে না।

পরদিন সকালে গভর্নর হাউজ থেকে ফোন পেলাম, আমি যেন সভার কার্যবিবরণী নিয়ে তখনি সেখানে চলে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হলাম কাগজপত্র নিয়ে। শুনলাম, গত সন্ধ্যার সব সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আছে সেখানেই থাকবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিও স্বস্থানে বহাল থাকবে। সাহস করে কাউকে জিজ্ঞেস করিনি, একরাতে হঠাৎ সব কিছু পাল্টে গেল কিভাবে। এ নিয়ে আমি আর মাথা ঘামালাম না। কারণ, এটা আমার কাজের এখতিয়ারে পড়ে না।

একটি ঘটনা এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৬১ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। বিশেষ অতিথির ভাষণ দিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর সলিমুজ্জামান সিদ্দিকী। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শেষ করলেন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত পাঠ করে ঃ 'ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।' অর্থাৎ-'আমার নামাজ, আমার জীবন, আমার মরণ, আমার শয়ন, আমার জাগরণ সবই হে বিশ্ব জাহানের প্রভু, তোমারই জন্য।'

www.pathagar.com

বিজ্ঞান আলোচনার পর পবিত্র কোরআনের এই উচ্চারণ এক অভাবনীয় প্রভাব ফেলল শ্রোতাদের মনে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের ঘটনাটি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। একদিন সেক্রেটারী সাহেব আদেশ করলেন আমি যেন ডক্টর আবদুর রশীদের কাছ থেকে জেনে নেই তিনি কত টাকা বেতনে এই দায়িত্ব কবুল করবেন। ফোন করলাম তাঁকে, তাঁর ওখানে একটু যাব সেই অনুমতির জন্য। তিনি জানতে চাইলেন ভিজিটের উদ্দেশটা কি? বললাম, ব্যক্তিগত। তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, ১০ মিনিটের মধ্যে আমি নিজেই আসছি আপনার কামরায়।

ডিপিআই সাহেবও একজন ডেপুটি সেক্রেটারীর কামরায় দেখা করতে খুব একটা আসতে চান না; আর একজন হবু ভাইস চ্যান্সেলর কিনা নিজেই আসতে চাচ্ছেন। তিনি চাকরির তদবিরের জন্য আসছেন না তো? কারণ, দু'তিন জন প্রার্থী ইতিমধ্যেই আমার সাথে দেখা করে গেছেন। অনুরোধ করেছেন, সেক্রেটারী সাহেব এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের কাছে তাঁদের জন্য যেন একটু সুপারিশ করি।

ডক্টর রশীদ যে অন্য ধাতুতে গড়া তা পরে টের পেলাম। তিনি আমার কামরায় ঢুকেই কোন ভূমিকা ছাড়াই বললেন, 'নাজির সাহেব, আপনার সেক্রেটারী সাহেবকে বলে দিন আমি মাসিক বেতন দু'হাজার টাকার বেশী নেব না।' বুঝলাম, তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে গেছে।

ডক্টর রশীদের মুখে দু'হাজার টাকা বেতনের কথা শুনে অবাক হলাম বৈকি। বললাম, এ প্রদেশে চার জন ভাইস চ্যান্সেলর রয়েছেন– তাঁরা প্রত্যেকে পাচ্ছেন চার হাজার টাকা করে। এখন এক জনকে সরকার কি করে দু'হাজার টাকায় নিয়োগ করবেন? তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমার যা প্রয়োজন তাই নেব, বেশী নয়। আপনারা যদি চার হাজারি 'মনসবদার' চান তা হলে অন্য কারো খোঁজ করুন দয়া করে। আমি হাসতে হাসতে বললাম, একটা ডায়াসে চার জনের চেয়ার বসাতে গেলে সমান চেয়ারই তো বসাব– তিন জনের এক রকম আর চতুর্থ জনের অন্য রকম, তা কি হয়? জবাবে তিনি বললেন, 'অতশত বুঝি না। সাফ কথা, আমাকে যদি ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগের ইচ্ছে থাকে সরকারের তবে দু'হাজার টাকাই বেতন নির্ধারণ করতে হবে। অন্যরা কত পাচ্ছেন সেটা আমার আগ্রহের বিষয় নয়।'

বলে রাখি, এই ডক্টর রশীদ সম্বন্ধে শিক্ষা দপ্তরে বসে একটা গল্প শুনেছিলাম। ভদ্রলোক তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে থাকতেন। তিনি বকরী পুষতেন। হোস্টেলের ছেলেরা নাকি একবার তাঁর একটা খাসি জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল। গোশ্ত রান্নার জন্য দরকার মসলাপাতি আর সেই সঙ্গে পোলাও না হলে

www.pathagar.com

জমবে কি করে? ছেলেরা অত সব পাবে কোথায়। সুতরাং ডক্টর রশীদ ছেলেদের কাছে মসলাপাতি ও পোলাও-এর খরচা বাবদ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গল্পটা গল্প বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু এ ঘটনার পর সেই গল্পের বাস্তবতা নিয়ে অন্তত আমার মনে একটুও সন্দেহ রইল না।

অবাক কান্ডই বটে। সবাই যখন মাইনে বাড়ানর তদবির নিয়ে আসেন তখন একজন লোক এলেন তাঁর বেতন অর্ধেক নির্ধারণ না করলে তিনি ভাইস চ্যান্সেলরের পদ গ্রহণ করবেন না। এই যুগে মানুষটিকে অসাধারণ না বলে উপায় আছে?

শেষ পর্যন্ত এই বতিক্রমী মানুষটিরই জয় হল। ডক্টর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হলেন নির্ধারিত বেতনের অর্ধেক-এ।

দিন গুনছি কবে জেলায় পোস্টিং পাব। এরই মধ্যে আমার ব্যাচের সাথীরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে একে একে সেক্রেটারিয়েটে পোস্টিং নিয়ে ফিরে এসেছে। বাকী কেবল আমি রয়েছি।

একদিন এক মিটিং-এ চিফ সেক্রেটারী হাশিম রাজা সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি জেলায় যাবে কবে'? বললাম, 'যেদিন সরকারের আদেশ পাব'। জানতে চাইলেন, 'কোন্ জেলায় যেতে চাও'? বললাম, 'কুষ্টিয়ায়'। জিজ্ঞেস করলেন, কেন? বললাম স্যার, মাঝে-মধ্যে কলকাতায় বর্ডার কনফারেন্স করতে যাওয়া যাবে, আর ছোট জেলা বলে ঝামেলাও কম হবে।

কয়েকদিন পর এসএন্ডজিএ দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী আমার ব্যাচমেট জামান বলল, তোমাকে চারটি মহকুমাওয়ালা একটা জেলায় যেতে হবে। কারণ তুমি ইতিমধ্যেই জেলায় যাবার জন্য অফিসারদের মধ্যে সিনিয়র হয়ে গিয়েছ। এর কয়েকদিন পর আর একটা চিঠি পেলাম- জেলায় যাবার জন্য আমি যেন নিজেকে প্রস্তুত রাখি। প্রায় এক মাসের মধ্যেই পোস্টিং অর্ডার পেলাম। জেলার নাম বরিশাল- যেখানে আমাকে যেতে হবে। জামানকে জানিয়ে দিলাম আদেশটি বাতিল করতে। বললাম, আমি বরিশাল যাচ্ছি না। সে তার কথায় আমাকে মানাতে চেষ্টা করল। আমি অনড়। একদিন এক মিটিং শেষে চিফ সেক্রেটারী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'নাজির, কবে যাচ্ছ বরিশাল?' -'স্যার, বরিশাল যাব না।' তিনি বললেন, 'কেন যাবে না -খুব ভাল পোস্টিং।' বললাম, 'স্যার, আমি সাঁতার জানি না- তাই যাব না।' তিনি বললেন, 'তুমি সাঁতার জান না, এ কথা পাবলিক সার্ভিস কমিশন জানতে পারলে তোমাকে সিভিল সার্ভিসের জন্য মনোনয়ন দিত না- তা তুমি জান?' বললাম, 'স্যার, ওদের কাজ তো ওরা শেষ করেছে- এখন আমাকে অন্য জায়গায় পাঠান।' তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'নাজির, আমি চিফ সেক্রেটারী থাকলে তোমাকে বরিশাল যেতেই হবে।'

www.pathagar.com

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে এক-দেড় মাসের মধ্যেই খোদ চিফ সেক্রেটারী জনাব হাশিম রাজা বদলি হয়ে গেলেন। বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে হাত মিলাবার সময় বললেন, 'নাজির, আমি চলে যাচ্ছি। তোমাকে আর বরিশাল যেতে হবে না- তুমি যাবে রাজশাহী।' ভদ্রলোক সত্যি জুনিয়র অফিসারদের স্নেহ করতেন। আইসিএস অফিসারদের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। আমরা তাঁদের পরবর্তী সিএসপিরা সেই ট্রাডিশন খুব একটা রক্ষা করতে পেরেছি-এ কথা জোর করে বলতে পারিনা।

অবশেষে পোস্টিং অর্ডার এল। সরকার বাহাদুর রাজশাহী জেলার ডেপুটি কমিশনার হিসেবে আমাকে নিয়োগ করেছেন। রাজশাহীতে সে সময় ডিসি ছিলেন মুজিবুল হক- আমারই ব্যাচমেট। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ বিধায় পোস্টিং-এর পরও কার্যভার গ্রহণ করতে আমার এক-দু'মাস দেরী হল।

এই সময়ের মধ্যে রাজশাহী থেকে লোকজন এসএন্ডজি-এ দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী এবং আরো কারো কারো কাছে তদবির করতে এসেছেন আমার পোস্টিং বাতিল করার জন্য। এ তদবির বিভিন্ন কারণে। নাজির ভীষণ বদরাগী, একগুঁয়ে, হিন্দুদের প্রতি বিরূপ এবং কঠোর প্রকৃতির ইত্যাদি। আমার নাটোরে এসডিও জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর কারণে এইসব গুণবাচক মন্তব্যগুলো এসেছে, সন্দেহ নেই। সরকার বাহাদুর এতে অবশ্য তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখাননি।

হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করলেন, ডাক্তার আজিজ। তিনি পেশায় ডাক্তার এবং কর্মে রাজশাহী পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি নিজেই বললেন যে, তিনি ডেপুটি সেক্রেটারী মাহবুবুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি রাজশাহীর লোক, তাই। এখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমি কবে যাব সেটা জানতে। বুঝলাম, তিনি তদবির করতে এসেছিলেন যাতে আমার পোস্টিংটা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে আপোষ করতে এসেছেন। বললাম, 'জামান কি বলল? আমাকে রাজশাহী যেতেই হবে, তাই না?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনিই যাবেন রাজশাহী। তাছাড়া আপনার পুরাতন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোখলেসুর রহমান সাহেব কমিশনার হিসেবে রাজশাহীতেই আছেন। তিনি আপনাকে পেয়ে খুশীই হবেন।' অনুমান করলাম, জামান তাঁকে বুঝিয়েছে নাজিরকে ভয় করার কোন কারণ নেই। কারণ, কমিশনার সাহেব তো আছেন রাজশাহীতে।

ডাক্তার আজিজকে বললাম, 'মুজিবুল হক সাহেব ইশারা দিলেই আমি আমার যাবার দিনক্ষণ ঠিক করব এবং ওখানে পৌছালেই জানতে পারবেন।'

www.pathagar.com

কয়েকদিন পর নাটোরের তৎকালীন এসডিও দেখা করতে এলেন। এল আর খান সিএসপি অফিসার। 'কি ব্যাপার?' আমি জানতে চাইলাম। সে বললেন, 'স্যার, আপনি যাচ্ছেন রাজশাহী আর এদিকে আমি কয়েকদিনের ছুটিতে যাচ্ছি। ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই।' আমি বললাম, 'কয়েক দিনের ছুটি মানে বিয়ে করতে যাচ্ছ নাকি?' ও সলজ্জ হেসে বলল, 'জ্বি স্যার।' বললাম, 'খুব ভাল। বিয়ে-শাদী করে এস। ওখানে দেখা হবে।' মনে হল, ওর মতলব অন্য কিছু –কেবল বিয়ের খবর দিতে আসে নি ও।

ঢাকায় বসে বুঝতে কষ্ট হল না যে, আমাকে নিয়ে রাজশাহীতে বেশ একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে একটা ভয় বা সংশয়ও বোধ হয় দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

আপ ওধার যাইয়ে

সমস্ত জল্পনা-কল্পনা অবসান ঘটিয়ে একদিন সত্যি সত্যি রাজশাহীর পথে রওয়ানা হলাম। সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে, ঢাকা থেকে ট্রেনে যাব। কিন্তু নাটোরের এসডিওকে খবর পাঠালাম, আমি ঈশ্বরদী পর্যন্ত প্লেনে গিয়ে তারপর সড়ক পথে রাজশাহী যাব। মনে হয়েছিল, যেহেতু আমাকে নিয়ে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছে সেই হেতু আমার আগমন মুহূর্তে আমাকে তুষ্ট করার জন্য বাড়তি কিছু একটা হতে পারে। আমি চাই না, এরকম একটা কিছু হোক। আমি নীরবে-নিভৃতে আমার কর্মস্থলে হাজির হতে চাই। কিন্তু আমার এ পরিকল্পনাটা নেহাতই মাঠে মারা গেল বলতে হয়। যেটা ভয় করেছিলাম, তাই আংশিক হলেও ঘটে গেল।

ইশ্বরদী বিমানবন্দরে নাটোরের এসডিও বেশ কিছু লোকজন নিয়ে আমার অপেক্ষা করছিল। এদের মধ্যে ঐ এলাকার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান- সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। নাটোর পৌছার পর এসডিও আমাদের আপ্যায়ন করল ভীষণ জাঁকালোভাবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষে লক্ষ্য করলাম, মহকুমার প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারমান এবং গণমান্য ব্যক্তিরা সবাই একত্রিত হয়ে আমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন। তাঁদের ব্যাগ্রতা ও আগ্রহ দেখে তাঁদের মতলবটা বুঝে ফেললাম। তবুও তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওঁরা আমাকে ঘিরে ধরলেন। আব্দারের সুরে বললেন যে, এসডিও সাহেবের বদলির অর্ডার এসেছে, যে করেই হোক এ অর্ডার বাতিল করতে হবে।

মুহূর্তের জন্য একটু বিব্রতবোধ করলাম। একজন সিএসপি অফিসার তার বদলি ঠেকাবার জন্য এই পথ বেছে নিবে, এটা ধারণা করতে পারিনি। মনে মনে, সত্যি বলতে কি, বিরক্তিবোধ করলাম। তবে আমার মনোভাব প্রকাশ না করে বললাম, আমি এখনো আমার দায়িত্ব গ্রহণ করিনি। চার্জ নেবার পর ঢাকার সঙ্গে কথা বলে দেখব কি করা যায়। তবে ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের কাছে কোন অঙ্গীকার করতে পারব না।

সন্ধ্যায় রাজশাহী পৌছলাম। ট্রেনে যাচ্ছি জেনে স্টেশনে বহু লোক জমায়েত হয়েছিল ঘটা করে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। ডেপুটি কালেক্টর নেজারত সাহেব জানালেন, এডিএম এবং এসপি সাহেবরাও বহুক্ষণ অপেক্ষা করে বাসায় চলে গেছেন।

www.pathagar.com

সার্কিট হাউজে উঠলাম। ডিসি মুজিবুল হক এবং অনেকেই সৌজন্য সাক্ষাতে এলেন। স্বল্প পরে জানিয়ে দিলাম, কাল সকালে দেখা–সাক্ষাৎ করব, আজ আর নয়।

রাতে কমিশনার সাহেবের বাড়ীতে প্রাক্তন ডিসির বিদায় এবং নতুন ডিসির আগমন উপলক্ষে বেশ জমকাল খানার ব্যবস্থা হল। আমি উপস্থিত হতেই কমিশনার সাহেব আমাকে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি এখনো সেই এসডিও–ই রয়ে গেছ– একটুও মোটা হওনি!

প্রথম সন্ধ্যাটা বেশ ভালই কাটল। মুজিবুল হককে বললাম, কবে যাবি? ও বলল, আগামীকাল। আগামীকালই চার্জ দেব এবং 'কানকথা' বলব। 'কানকথা' অর্থ উত্তরসুরীকে মৌখিক পরামর্শ বা বিশেষ কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা যা নথিভুক্ত করা হয় না।

পরের দিন পূর্বসূরি জানালেন, এখানে তোমার বস হবেন তিন জন। প্রথম বস– কমিশনার, দ্বিতীয় বস– ভাইস চ্যান্সেলর এবং তৃতীয় বস– ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার। পান থেকে চুন খসলেই লঙ্কাকান্ড বেঁধে যায়। এটা তোমার জানা জায়গা। আর কিছু বলে তোমার দৃষ্টিকে আড়ষ্ট করতে চাই না। কেবল ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের কাছে তোমাকে নিজে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেব। –আরে তিনি তো তোমার খালুশ্বশুর– তবু মনে হয় সম্পর্ক খুব–একটা উষ্ণ হতে পারেনি। আসলে ঢাকায় মাহবুবুজ্জামান আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, রাজশাহীতে ডিসি আর ভিসির মধ্যে একটা টানাপড়েন চলছে। আগামী সমাবর্তন উৎসবে ডিসি–এসপি মঞ্চে বসবেন কি বসবেন না সেই নিয়ে।

মুজিবুল হক তার কথা মোতাবেক সন্ধ্যার গাড়ীতে রাজশাহী ত্যাগ করল। আমি আমার নির্ধারিত বাসায় গিয়ে উঠলাম। বিভাগীয় সদর। সুতরাং জেলা এবং বিভাগীয় পদের অনেক অফিসার। সকলেই একে একে নতুন ডিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাচ্ছেন। ভাবলাম, ভিসির সঙ্গে তো পূর্বসূরির সাথে গিয়ে দেখা করে এলাম, কমিশনার সাহেবের বাসায় প্রথম সন্ধ্যায় খানা খেয়েছি। বাকী থাকে মুজিবুল হক বর্ণিত তৃতীয় বস, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার। কমিশনার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন তাঁর সাথে দেখা করেছি কি না। বললাম না, করিনি এবং সে রকম ইচ্ছেও আমার নেই। ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করবেন আর তারপর আমি তাঁর সঙ্গে পাল্টা সাক্ষাৎ করব– এটা ঠিক করেছি। শুরুতেই প্রোটোকল ঠিক করে নেওয়া ভাল। আমি এই জেলার প্রধান কর্মকর্তা। সুতরাং দেশী–বিদেশী যেই হোক, প্রথমে তাঁকেই আসতে হবে পরিচিত হতে– এটাই আমার হিসাব।

www.pathagar.com

তিন দিন অপেক্ষার পর ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার আমাকে ফোন করলেন সাক্ষাতের সময় চেয়ে। সমস্যা মিটে গেল। এই ভেবে স্বস্তি পেলাম যে, এ নিয়ে ভবিষ্যতে আমাকে আর কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না।

পুরান হলেও রাজশাহীকে অনুন্নত শহর বলা চলে। অবশ্য টমটমের সংখ্যা ধীর গতিতে হলেও কমে যাচ্ছিল। এ শূন্যস্থান পূরণ করছিল রিকশা। রাজশাহীতে সমস্যা হল খাবার পানির। পানিতে এত চুন থাকে যে পনের দিনের মধ্যে কাঁচের জগ আর গ্লাসে সাদা একটা আস্তরণ পড়ে যায়।

ডাক্তার আজিজ প্রায়ই কোন না কোন বাহানায় আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। আর এক ভদ্রলোক, ধরনী মৈত্রী, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন আমার অফিসে আসতেন সাক্ষাৎ করতে। তাঁর নাকি দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এটাও একটা যে, প্রতিদিন ডিসির সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। জেলার বিভিন্ন কমিটিতেও ডিসিরা তাঁকে সদস্য বানিয়ে থাকেন। ওদিকে জেলা কাউন্সিলের সহসভাপতি জনাব সামাদও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। একদিন একজন বিচিত্র ধরনের লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন মিঃ পিএন বিশি। সাহিত্যিক প্রমথ নাথ বিশির ছোট ভাই। তিনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এস্টেট অফিসার হিসেবে কাজ করতেন এবং জেলার একজন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। তাঁর শরীরে চামড়া এবং হাড় অবশ্যই ছিল– কিন্তু গোশ্‌তের ভাগ ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। খুব হাসাতে পারতেন তিনি।

একদিন ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব সাক্ষাৎ করতে এলেন এবং তাঁদের একটি অনুষ্ঠানে যাবার জন্য দাওয়াত করলেন। বললেন, ছেলেদের ফাংশান। আপনি গেলে ওরা খুশী হবে এবং আমাদেরও ভাল লাগবে। দাওয়াত কবুল করলাম। ভাবলাম, আমার পূর্বসূরির সঙ্গে সম্পর্কের যে টানাপড়েন ছিল সেটা মিটিয়ে ফেলবার একটু সুযোগ হয়ত পেতে পারি।

দু'দিন পরের কথা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান। ভিসি কয়েকবার ফোন করেছেন রওয়ানা দিয়েছি কি না জানতে। আমি একটা জিপ নিয়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললাম জিপটাকে একটু দূরে কোন অন্ধকার স্থানে রাখতে। পেছন দরজা দিয়ে আমি হলে প্রবেশ করলাম এবং শেষ সারির আমারই মত এক হালকা–পাতলা ছেলের চেয়ারে ভাগাভাগি করে বসে পড়লাম। ছেলেটি কিছুই টের পেল না। সে বিনা দ্বিধায় তারই এক সহপাঠী মনে করে আমাকে বসতে দিল।

মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম নতুন ডিসির আগমন অপেক্ষায় সবাই ব্যস্ত। মিনিট পনের পর আমি কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ দু'জন অধ্যাপক ও দু'জন ছাত্র এসে আমাকে প্রায় শূন্যে তুলে ডায়াসে নিয়ে বসিয়ে দিল।

www.pathagar.com

তাঁদের মুখেই শুনলাম, প্রায় আধা ঘন্টা যাবত তাঁরা সারা এলাকায় ডিসিকে খুঁজছেন। কারণ তাঁরা বাসায় ফোন করে জেনেছেন ডিসি সাহেব ইউনিভার্সিটির উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং মাঝপথের পুলিশ আউটপোস্টও একই বক্তব্য দিয়েছে। অবশেষে তারা অন্ধকারে আত্মগোপনকারী ডিসির জিপটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং সেই সূত্র ধরেই তাঁরা ডিসির সন্ধান পান।

মঞ্চের মাঝখানে বসিয়ে ডিসি সাহেব আমার ওপর বহু বিশেষণ প্রয়োগ করলেন। ছাত্ররা দাঁড়িয়ে হাত তালি দিল। আমি মনে মনি খুশী হলাম এই ভেবে যে, আমাদের ভেতরকার শীতল সম্পর্কটার অবসান হল। এরপর আর কখনও সম্পর্ক খারাপ হয়নি। আমার ঘটনাবহুল দু'বছরের বেশী রাজশাহীর জীবনে সর্বদাই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে একটা উষ্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অথচ মঞ্চে বসার মত একটা মামুলি ব্যাপার নিয়ে আমার পূর্বসূরির সঙ্গে ইউনিভার্সিটির সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

পরে সমাবর্তনের ব্যবস্থাদি আলোচনা প্রসঙ্গে আমি ডিসিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি যে, প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নর-এর নিরাপত্তার জন্য জিম্মাদার হচ্ছেন ডিসি ও এসপি। তার অর্থ তাঁদেরকে মঞ্চেই বসতে হবে- এ রকম আবদার আমি সমর্থন করি না। সমাবর্তন উৎসবে জ্ঞানী-গুণী-বিদগ্ধ জনের সমাবেশ ঘটে, সেখানে ডিসি-এসপির কোন কিছু করার আছে বলে আমি মনে করি না। বরং মঞ্চে তাঁদের সদম্ভ অবস্থান দৃষ্টিকটু ঠেকবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁদের মঞ্চের নিচে যথাযোগ্য স্থানে বসতে দিলেই চলবে।

ঢাকা থেকে খবর পেলাম প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন উৎসবে যোগদানের জন্য রাজশাহী সফরে আসবেন। প্রেসিডেন্ট ঢাকা থেকে রাজশাহী এবং রাজশাহী থেকে সিলেট যাবেন। খোঁজ-খবর নিয়ে এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে বুঝলাম প্রেসিডেন্টের সফরের সময় ঝামেলা হতে পারে। কমিশনার সাহেবের সাথেও কথা বললাম। তিনি ঝামেলার আশঙ্কার কথা স্বীকার করেও প্রেসিডেন্টের সফর বাতিলের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। মনে হল তিনি ভাবছেন এ সফর বাতিল হলে স্থানীয় প্রশাসনের অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। সুতরাং যেভাবেই হোক সফল সফরের ব্যবস্থা করতেই হবে।

আমি ঢাকায় লিখিতভাবে জানালাম যে, আমি এখানে সামান্য কয়েক সপ্তাহ মাত্র এসেছি, এরই মধ্যে এত বড় ঝুঁকি নিতে পারব না। তবে কমিশনার সাহেব এবং পুলিশ সুপার যদি দায়িত্ব নেন, আমার কোন আপত্তি নেই। মজা হল এঁদের কেউই চিফ সেক্রেটারীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে রাজি নন। অথচ সফরের আর মাত্র চার দিন বাকি। এদিকে ডিসি সাহেব তাঁর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সকল ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন প্রায়।

www.pathagar.com

এর মধ্যে একদিন পুলিশ সুপারকে পাশে বসিয়ে নিজে চিফ সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ করলাম ফোনে। কাজী আনওয়ারুল হক সাহেব বুঝলেন বিষয়টা। শেষবারের মত জানতে চাইলেন এটাই আমার চূড়ান্ত মতামত কিনা। বললাম– হ্যাঁ স্যার, এর মধ্যে কোন 'যদি' বা 'কিন্তু' নেই।

এরপর তিনি এসপির সাথে কথা বললেন। প্রেসিডেন্টের রাজশাহী সফর আপাতত স্থগিত হল। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরে কমিশনার সাহেব একদিন কথায় কথায় জানতে চাইলেন আমি প্রেসিডেন্টের রাজশাহী সফর বাতিলের পক্ষে চিফ সেক্রেটারীর নিকট এত দৃঢ় মতামত দিলাম কেন? বললাম, স্যার নতুন শাসনতন্ত্র নিয়ে রাজনৈতিক মহলে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটেই প্রেসিডেন্টের সফরের অনুকূলে নয়। তা ছাড়া আমি এখানে নতুন। কিছু একটা হলে আমার মাথাটাই আগে যাবে। এ জন্যই আমাকে এই স্ট্যান্ড নিতে হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে খবর এল জিওসি ইস্টার্ন কমান্ড আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যাপারে এখানে সফরে আসবেন। তাঁকে জুনিয়র গভর্নরের পদমর্যাদায় অভ্যর্থনা জানাতে হবে। জানতে পারলাম, নির্ধারিত দিনে কমিশনার সাহেব নদীর পাড়ে যাবেন জেনারেল সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাতে। কারণ জেনারেল সাহেব সি–প্লেনে আসছেন।

আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল। কমিশনার একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেলের সম–পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি কি করে একজন মেজর জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাতে যাবেন। আমি আপত্তি করলাম। কমিশনার সাহেব বললেন যে, এতে যদি ভদ্রলোক মাইন্ড করেন। আমি বললাম, 'স্যার এটা নেহায়েত প্রটোকলের বিষয়– এতে কারো কোন মাইন্ড করার কিছু নেই।' তিনি আমার কথা মেনে নিলেন। স্থির হল, আমি, এসপি ও ইপিআর ডাইরেক্টর (যিনি ঢাকা থেকে আগেই এসেছেন সফর উপলক্ষে) যাব নদী তীরে জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাতে। সেখান থেকে কমিশনারের কারযোগে তাঁকে সার্কিট হাউজ নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে জেনারেলের সাক্ষাৎ হবে।

রাজশাহীর নতুন সার্কিট হাউজে ছিল দুটি হল। একটা খাবার কামরা এবং অন্যটি বসার কামরা হিসেবে ব্যবহৃত হত। খাবার কামরায় দেখলাম ইপিআর একটা বিরাট বড় রাজশাহীর মানচিত্র টাঙ্গিয়েছে। বসার কামরায় মৌলিক গণতন্ত্রীদের বসান হয়েছে। জেনারেল তাঁদের সাথে কথা বলবেন।

জেনারেল সাহেব মানচিত্রের সামনে মেঝেতে বসে পড়লেন। গভীর মনোযোগ সহকারে সেটা তিনি দেখতে লাগলেন। আমরা অর্থাৎ কমিশনার, এসপি ও আমি

www.pathagar.com

পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইপিআর ডাইরেক্টর জেনারেলকে মানচিত্রের বিশেষ বিশেষ জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে একটা কিছু বোঝাতে চাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি পেছন ফিরে কমিশনার সাহেবকে লক্ষ্য করে অন্য কামরা দেখিয়ে বললেন, 'স্যার, আপ ওধার যাইয়ে।'। অত্যন্ত অভদ্রভাবে তিনি দু'বার এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

ব্যাপারটা আমার কাছে অসহ্য লাগল। ইপিআর ডাইরেক্টরের এই সীমাহীন ঔদ্ধত্যে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। এখানেই ঘটনার পরিসমাপ্তি হলে হয় তো আমি নিজেকে সংযত করতে পারতাম। কিন্তু ইপিআর ডাইরেক্টর দাঁড়িয়ে কমিশনার সাহেবের পিঠে হালকাভাবে হাত রেখে বললেন, 'স্যার, আপ উস কামরামে যাইয়ে– জেনারেল সাহাব আভি উহা যায়েঙ্গে (স্যার, আপনি ঐ কামরায় যান– জেনারেল সাহেব এখনি আসছেন)।'

প্রচন্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি একটু নিচু হয়ে জেনারেলকে বললাম, 'স্যার, আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই'। আমার কথা ঠিকমত শেষ হবার সুযোগ না দিয়েই জেনারেল ইংরেজীতে রাগতঃস্বরে বললেন, 'মিস্টার ডিসি, তুমি যদি চাও, আমি আমার সমস্ত ফোর্স নিয়ে এখনি চলে যাচ্ছি। আমি তো তোমাদের সাহায্যের জন্য এসেছি– তোমরা না চাইলে চলে যাব।' আমি জবাবে বললাম, 'আমার কথা শোনার ধৈর্য যদি আপনার না থাকে, নিশ্চয়ই যেতে পারেন। তবে জেনে রাখুন, এই জেলার কোন কিছুই সরকার ডিসির কাছ থেকে গোপন রাখে না আর এই বিভাগেরও কোন কিছুই সরকার কমিশনার সাহেবের নিকট থেকে গোপন রাখে না। সৌজন্যবর্জিত হলে আপনাকে এই সার্কিট হাউজ থেকে এখনি যেতে হবে। আপনি আপনার গোপন নথিপত্র নিয়ে বেরিয়ে যান। আপনাকে মাত্র তিন মিনিট সময় দিলাম। যদি এই সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় না যান, আপনাকে যেতে বাধ্য করা হবে।'

আমি যখন উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলছি তখন কমিশনার সাহেব আমার কোটের পেছনের কলার ধরে টানছেন আর বলছেন, 'নাজির চুপ কর। যা হবার হয়েছে, তুমি চুপ কর'। এসপি বললেন, স্যার আপনি শান্ত হোন।'।

আমি বললাম, 'আমার সামনে কমিশনার বেইজ্জত হবেন আর আমি ডেপুটি কমিশনারগিরি করব– সে বান্দা আমি নই'। তারপর জেনারেল সাহেবকে লক্ষ্য করে বললাম, 'আর মাত্র আধা মিনিট বাকী– সিদ্ধান্ত আপনার।' জেনারেল ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ির নিচে তাঁর জিপ অপেক্ষা করছিল। তিনি জিপে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কি মনে করে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত আমার কাছে এসে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'নাজির, আই এ্যাম সরি– ইউ আর রাইট। লেট আস ফরগিভ এন্ড ফরগেট।'

www.pathagar.com

জেনারেল বললেন, 'চল আমরা একটু ঘুরে আসি।' আমরা গিয়ে জিপে বসলাম। জিপ চলতে লাগল। চালাচ্ছিলেন ইপিআর ডাইরেক্টর। জেনারেল আর আমি পাশাপাশি বসেছি। অহেতুক আমরা সারা শহর ঘুরছি। একটা নৈঃশব্দ আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল। আমি এই নৈঃশব্দের বুকে ক্রমাগত আমার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছি।

হঠাৎ জেনারেল মুখ খুললেন। এতক্ষণের নীরবতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। এমন নির্দয় ভাষায় তিনি গালাগাল শুরু করলেন যে, সে সব কথা কখনই লেখা যাবে না। কিন্তু যার ওপর তিনি ফেটে পড়ছেন তিনি সম্পূর্ণ বোবা। তিনি গাড়ী ড্রাইভ করে চলেছেন। তারপর আমার দিকে ফিরে আশ্চর্য নরম কণ্ঠে জেনারেল জানতে চাইলেন আমি আমার মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলেছি কিনা।

আমি বললাম, 'স্যার, এটা আমার কোন ব্যাপার নয়। কমিশনার সাহেব মর্যাদা এবং বয়সে অনেক বড়, তাঁর অপমান আমি মুখ বুজে সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া আমার দুঃখ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আপনিই একমাত্র জেনারেল মর্যাদার আর্মি অফিসার, আমাদের গর্ব। আসল বিষয়টা আপনাকে বলতে পারলাম না–এটাই আমাকে আঘাত করেছে।'

তিনি জবাবে বললেন, 'আমি ভেবেছি তুমি অহেতুক ডাইরেক্টরের কাজে বাধা দিচ্ছ তাই চটে গিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি তোমার রাগের কারণ। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত– ব্যাপারটা ভুলে যাও। ফিরে গিয়ে কমিশনার সাহেবের কাছে আমি মাফ চাইব।'

এক সময় আমরা সার্কিট হাউজে ফিরলাম। সবাই চুপচাপ। পরিবেশ খুবই থমথমে। সবার চেহারায় উৎকণ্ঠার ছায়া। কি হচ্ছে, কি হবে–এই ভাবনাটা সবাইকে যেন পেরেশান করে রেখেছে।

জেনারেল জিপ থেকে নেমে সোজা কমিশনারের কাছে গিয়ে হাজির। তিনি তাঁর কাছে মাফ চাইলেন এবং আমার দিকে ফিরে ইপিআর ডাইরেক্টরের নাম উচ্চারণ করে একটা গালি দিয়ে বললেন, ও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাবে–এ নিশ্চয়তা তোমাকে দিচ্ছি।

আর কোন অঘটন ঘটেনি। বাকী কাজ কর্মসূচী মোতাবেক ঠিকঠাক মত চলল। যাবার সময় জেনারেল খাজা ওয়াসি উদ্দিন আমার ওয়াদা নিয়ে গেলেন ঢাকায় কোন কাজে গেলে অবশ্যই যেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি।

সার্কিট হাউজের ঘটনাটি যে সুদূর লাহোরেও আলোচনার বিষয় হবে, আমার জানা ছিল না। ১৯৬৭ সালে লাহোর স্টাফ কলেজে গিয়েছিলাম। সেই সূত্রে সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে বেড়াতে যাওয়া। একাডেমির ডাইরেক্টর জানালেন যে, আমি নাকি

www.pathagar.com

প্রত্যেক নতুন ব্যাচের কাছে এই হিসেবে পরিচিত যে আমি এক জেনারেলকে সার্কিট হাউজ থেকে বের করে দিয়েছিলাম। তিনি আরো জানালেন যে, আজ সন্ধ্যায় গেষ্ট নাইট আছে। তুমি এস, তোমাকে দেখে নতুন অফিসাররা খুশী হবে। সন্ধ্যায় গিয়ে দেখলাম সত্যি আমি সবার বিস্ময়ের বস্তুতে পরিণত হয়েছি। নানা জন নানা প্রশ্ন করতে লাগল। এই মিলিটারীর যুগে একটা পুচকে ডিসি একজন জেনারেলকে সার্কিট হাউজ থেকে বের করে দিল এবং তারপরও তার চাকরি থাকল।

এ প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের এই জেনারেলের মহত্বের কথাও বলতে চাই। তাঁর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে যখনই দেখা করেছি তিনি আমাকে আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছেন এবং উষ্ণ আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেছেন।

রাজশাহীতে একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। শামসুজ্জামান চৌধুরী সাহেব ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। একদিন তাঁর ফোন পেলাম। তাঁর কণ্ঠে আতঙ্ক। জানতে চাইলাম কি ব্যাপার? -পরীক্ষার হলে ছাত্রছাত্রীরা নকল করছিল। নকল ধরার কারণে তারা হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে। উপস্থিত পুলিশ ও আনসাররা খুব-একটা সুবিধা করতে পারছে না।

এসপিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ঘটনাস্থলে। আমাদের গাড়ী দেখে হাঙ্গামাকারীরা সরে যেতে শুরু করল। আমরা কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে সোজা চেয়ারম্যান সাহেবের অফিস কামরায় গিয়ে হাজির হলাম। বিশদ ঘটনা শুনলাম। এসপি সাহেবকে অনুরোধ করলাম ছাত্রছাত্রীদের বলে দিতে যে, তারা যেন অতি সত্বর স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। নচেত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম, গন্ডগোলের হোতাদের এবং যাদের নকল ধরা পড়েছে তাদের একটা লিষ্ট দিতে। ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে সাতটা নামের একটা তালিকা দিলেন আমার হাতে। তালিকায় দেখলাম ৩ জন ছাত্রী, ৪ জন ছাত্র। ছাত্রীদের মধ্যে একজন এসপি সাহেবের বোন। আর একজন ছাত্রী ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে একজন সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের তনয়। বাকীরাও হোমরা-চোমরাদের সন্তান।

সেন্টার কমিটি এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এ বছর এদের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হল এবং এদের দু'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হল। মজার কথা হল এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন তদবির বা দয়া ভিক্ষার আবেদন আসেনি। তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহল যে এতে খুশী হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

রাজশাহী জেলা ভারতীয় ৪টি জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত–মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং পশ্চিম দিনাজপুর। সীমান্তে ছোটখাট হাঙ্গামা প্রায়ই লেগে থাকত। এর মধ্যে বেশীরভাগই হচ্ছে গরু চুরি আর চোরাচালানি। মাঝে–মধ্যেই ইপিআর সিপাইরা এসব ব্যাপার নিয়ে গোলাগুলির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ত তাদের ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে। তাই মাঝে–মাঝে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বর্ডার কনফারেন্সে বসতে হত। মজার কথা হল, গরু কোন পক্ষই কখনই ফেরত দিত না–একটা না একটা বাহানা করে পরিচিতিতে বিভ্রাট সৃষ্টি করা হত। পদ্মার চরে শিকার অথবা চোরাচালানির সময় একপক্ষের লোক অন্যপক্ষের সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে যেত। এ সব লোকজনদের ছাড়িয়ে আনার জন্য ডেপুটি কমিশনাররা তৎপর হতেন। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যাটি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা–হাঙ্গামা। প্রায়ই শোনা যেত ভারতে দাঙ্গার কথা। তারপর শুরু হত শত শত মোহাজেরের আগমন এবং এখানে–সেখানে বসতি স্থাপন।

মালদহ ও মুর্শিদাবাদ থেকে দাঙ্গার খবর আসতে লাগল। এ সব খবর সাধারণত একটু অতিরঞ্জিত হয়েই আসে। তবে ঢাকার খবরের কাগজগুলোতে এসব দাঙ্গার ঘটনার সমর্থন আসতে লাগল। ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ খুবই সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। এমন কোন মাস বা সপ্তাহ নেই যখন সে দেশে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ঘটছে না। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় প্রতিদিনই দাঙ্গাপীড়িত লোকজন রাজশাহী শহরে এসে ভীড় জমাতে লাগল। জেলা প্রশাসন থেকে এ সব লোকজনকে মোটামুটি এক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হল। এ সময় একদিন প্রাদেশিক গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান রাজশাহী সফরে এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের অতিরিক্ত চিফ সেক্রেটারী আলী আসগর। গভর্নর সাহেব জিপে সারা শহর ঘুরে দেখলেন হিন্দু–মুসলমান সম্প্রীতি ঠিক আছে কিনা। বিকেলে স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে তিনি এক বিরাট জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করলেন। ভারতে মুসলিম নিধনের বিস্তারিত বর্ণনা ছিল তাঁর বক্তৃতায়। শেষে জনতার কাছে এই বলে আবেদন করলেন যে, মুসলমান হিসেবে তারা যেন সংখ্যালঘু ভাইদের আমানত মনে করে এবং তাদের জীবন দিয়ে সংখ্যালঘুদের হেফাজত করে।

গভর্নরের বর্ণনার হৃদয়গ্রাহিতা আর ভাষার যাদুময়তায় আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পাশে বসা বিভাগীয় কমিশনার সাহেবকে অনুচ্চস্বরে বললাম, 'স্যার, আমাদের কপাল পুড়ল। হিন্দুস্থানের দাঙ্গার বিস্তারিত বয়ান যেভাবে লোকজন শুনল তাতে তাদের রক্ত ঠান্ডা থাকা মুশকিল'। আসলেই আমি প্রমাদ গুনলাম। কারণ, কমিশনার সাহেব তো মুরুব্বি। কিছু হলে দায়িত্বটা এসে পড়বে বেচারা ডিসি ও এসপির ওপর। যাহোক গভর্নর

www.pathagar.com

সাহেবের মূল্যবান ও সারগর্ভ বক্তৃতার ওপর খোশ বা নাখোশ হবার কোন সুযোগ নেই অথবা বিচার-বিবেচনারই বা অবকাশ কোথায়?

সন্ধ্যায় গভর্নর সাহেব চলে গেলেন। আলী আসগর সাহেব শহরের অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁকে অবহিত করলাম যে, শহরে চাপা উত্তেজনা আছে এবং প্রতিদিন সেটা বাড়ছে। যারা গন্ডগোল পাকাতে পারে তারা আমাদের মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই সন্ত্রস্ত। কিন্তু লাট সাহেবের আজকের বক্তৃতার পর কি হবে, বলা মুশকিল।

সন্ধ্যার পর এসপিকে সাথে নিয়ে শহর ঘুরলাম। স্থির হল, প্রত্যেক থানা এবং আউটপোস্টে হুঁশিয়ারি জারি করা হবে এবং গুন্ডাদের দিকে কড়া নজর রাখা হবে।

পরদিন সকালে নিজের অফিসে কাজ করছি। দুপুরের আগে কেউ এসে খবর দিল যে গুন্ডারা ঘোষপাড়ায় লুটপাট শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে একটু অবাক হলাম এই কারণে যে, ঘোষপাড়াটা পুলিশ লাইনের সঙ্গে প্রায় লাগালাগি। সেখানে গুন্ডারা এসব করতে সাহস পায় কিভাবে? সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম ঘোষপাড়ায়। বস্তিটা আসলেই গোয়ালাদের। বাড়ীগুলোয় তরজার বেড়া এবং ছাদ করা হয়েছে টিন বা খড় দিয়ে। দেখলাম, দু'জন লোক বিছানায় শুয়ে আছে। এদের গুন্ডারা মারধর করেছে। স্ত্রীলোকরা কান্নাকাটি করছে। কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল পৌঁছেছে। বস্তি আর পুলিশ লাইনের ব্যবধান তিন হাতের বেশী হবে না। বস্তিবাসীদের আশ্বস্ত করলাম।

ফেরার পথে এসপির অফিসে গেলাম। তাঁকে সাথে নিয়ে আমার অফিসে এলাম। এসপির সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম। কিন্তু তাঁর মধ্যে খুব-একটা সিরিয়াসনেস দেখলাম না। গুরুত্ব দিয়ে বললাম, 'গুন্ডাপান্ডারা আপনার ও আমার মেজাজ পরিমাপ করছে। এখনি শুরুতেই এদের মাথা গুঁড়িয়ে দেয়া দরকার। দাগী লিস্টে যারা আছে তাদের রাউন্ড আপ করে ফেলুন। আর চলুন আজ সন্ধ্যায় অন্তত ঘন্টাখানেক দু'জন একত্রে শহরে রাউন্ড দেব। আপনি ইউনিফরমে থাকবেন।' তিনি রাজি, কিন্তু সন্ধ্যায় এসপির দেখা নেই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে তবুও তাঁর খবর নেই।

অবশেষে আমাকেই বেরুতে হল। প্রথম গেলাম এসপির বাংলোয়। সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে আমি হতবাক। তাঁর বসার ঘরের সোফা সরিয়ে ফরাস পাতা হয়েছে এবং ঘরভর্তি লোক কাওয়ালী শুনছে। এসপি সাহেব পাজামার সাথে ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরেছেন আর পান চিবুচ্ছেন।

আমি পর্দা ঠেলে চেহারাটা দেখাতেই তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। এতটা হয়ত আশা করেন নি। যা হোক নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই যে, স্যার, এদিকে আসুন-এখানটায় বসুন।' আমি তাঁর কথায় আমল না দিয়ে

www.pathagar.com

বললাম, 'আমাদের কি কোথাও যাবার কথা ছিল?' জবাব এল, 'স্যার, একটু চা খান তারপর পান চিবুতে চিবুতে দু'জন বেরুব।' বললাম, 'এখন সময় কয়টা, খেয়াল আছে? ঠিক আছে আপনি কাওয়ালী শুনুন, আমি গেলাম।'

এলাম মিউনিসিপ্যাল অফিসে। নির্দেশমত এখানে ইতিমধ্যেই একটা কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। জানলাম, কোন খারাপ খবর আসেনি। এসডিও-এডিসিরা মোটামুটি সতর্ক আছেন এবং তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকায় তাঁরা যোগাযোগ রাখছেন।

ঐ রাতে মুর্শিদাবাদ থেকে কিছুসংখ্যক দাঙ্গা-পীড়িত নারী-পুরুষ শহরে এসে ওঠল। তাদের মুখ থেকে নানা রকম কথা মানুষের মধ্যে ছড়াতে লাগল। বলে রাখা ভাল, রাজশাহী শহরের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষই হচ্ছে হয় মুর্শিদাবাদ না হয় মালদহের।

শহরের কিছু লোককে গ্রেফতার করা হল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। কন্ট্রোলরুমে জানিয়ে দিলাম মোহাজেরদের যেন টাউন হলে রাখা হয়। ঐদিন ভোর থেকেই কিছু কিছু লুটপাটের খবর আসতে লাগল। এসপি যাদের গ্রেফতার করেছেন তাদের একটা লিস্ট নিয়ে এলেন। পুলিশ পাহারার পুরো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, ইপিআরকেও কাজে লাগান হবে। তাদের উইং কমান্ডারকে শহর ও শহরতলীর দায়িত্ব দেয়া হল।

দাঙ্গাবাজরা আমাদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে ভুল ও মিথ্যা সংবাদ কিছু সময়ের জন্য কন্ট্রোলরুমে পাঠাতে থাকল-যাতে আমরা আমাদের শক্তিটাকে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দুর্বল করে ফেলি। কোন কোন জায়গায় আগুনও দেয়া হল।

পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সরকারকে নিয়মিত অবহিত করতে থাকলাম। আমাদের পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও ভারতের দাঙ্গা সম্পর্কে প্রায় নীরব। অথচ ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে রাজশাহীর 'দাঙ্গা' ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার কাউকে কিছু না জানিয়ে এদিক-সেদিক ছুটছেন। তাঁকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলাম, কোথাও গেলে আমাদের যেন অবহিত করা হয়- যাতে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়। মনে হল ভদ্রলোক এতে বেশ বিরক্ত হলেন। এখানে-ওখানে কি হয়েছে সে সব বিষয়ে তিনি ফোনেই আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন। তাঁকে সাফ জানিয়ে দিলাম, এসব প্রশ্নের জবাব তাঁকে বিদেশ দপ্তর থেকেই নিতেহবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেশ ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। এর মূল কারণ ভারতীয় রেডিওর মিথ্যা প্রচারণা। গভর্নর আজম খান আবার রাজশাহী এলেন পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে। সিপ্লেন থেকে নেমে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলেন, 'নাজির, কেতনা হিন্দুকো মারা'? তিনি ঠাট্টা করছিলেন না সিরিয়াস ছিলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে আমি এমন অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলাম না। বললাম, স্যার, 'ওদের হেফাজতের দায়িত্বই তো আমাদের ওপর, মারার নয়। ইসলামের এটাই শিক্ষা।' তিনি আমার কথার জবাব না দিয়ে শুধু মৃদু হাসলেন।

গভর্নর আমাদের নিয়ে কয়েকটি হিন্দু বাড়ী গেলেন দেখতে। তাদের সান্ত্বনা দিলেন, আশ্বাস দিলেন।

গভর্নর আজম খান রাজশাহীতে এবারো একটি জনসভা করার খায়েশ জাহির করলেন। কমিশনার ও আমি দৃঢ়ভাবে তাঁকে নিরস্ত করলাম। বললাম, এখন আমাদের লোকজন চারদিকে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কাজে ব্যস্ত। এ অবস্থায় সভা করলে লোক সমাগম খুব-একটা ভাল হবে না। আমি বলেই ফেললাম যে, তাঁর সেদিনের বক্তৃতার পরই এখানে গোলমাল শুরু হয়েছে। আল্লাহ্‌র শোকর, গভর্নর সাহেব আর পীড়াপীড়ি করলেন না। চলে গেলেন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এই সংকটের সময় এসপি সাহেব এক জিপ দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পেলেন। কমিশনার ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে যশোর থেকে আর্মি তলব করলাম। তাদের ওপর কঠোর নির্দেশ জারি করলামঃ দাঙ্গাবাজদের 'দেখামাত্র গুলি কর' এবং 'মারার জন্য গুলি কর'। নিজে অনবরত জিপে সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম বিভিন্ন এলাকা।

দাঙ্গাবাজদের দমন করার আমার এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেল। লক্ষ্য করলাম, পুলিশের পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছি না। এক সন্ধ্যায় কন্ট্রোল রুমে সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বসেছি- আর্মির অধিনায়ক কর্নেল বারলাস বলেই ফেললেন যে জওয়ানরা বলছে, 'হাম মুসলমানো পে কেইসে গুলি চালায়ে গে?'

সাংঘাতিক কথা। আমার মাথা ঘুরে গেল। তাঁকে বললাম, একজন কর্নেলের মুখ থেকে আমি এরকম কথা আশা করিনি। এরপর পরিকল্পনা বদলাতে হল। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। চার জন বিশ্বস্ত পুলিশ কনস্টেবল ও এক গাড়ী বাছাই পুলিশ নিয়ে শহরতলীর এক এক এলাকায় এক এক সময় হঠাৎ গিয়ে হাজির হতাম। এলাকার সম্ভাব্য দাঙ্গাবাজদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে হাফলাঠি দিয়ে ওদের পায়ে বা হাতে মারতে বলতাম- যাতে জখম সারতে দু'চার দিন লেগে যায়।

একদিন এক এলাকায় গিয়েছি। এক হিন্দু বৃদ্ধা এসে অভিযোগ করলেন যে, তাঁর কান ও হাতের স্বর্ণের অলংকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বাড়ী আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানতে চাইলাম দুষ্কৃতকারীকে তিনি চিনতে পেরেছেন নাকি?

www.pathagar.com

বৃদ্ধা একটি ঘর দেখিয়ে বললেন যে, ঐ ঘরের মালিক। খোঁজ নিয়ে কাউকে পাওয়া গেল না।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ভাবলাম, এই মুহূর্তে কঠোর না হলে মানুষের জানমাল রক্ষা করা যাবে না। তাই পাশে দন্ডায়মান এক সিপাইকে বললাম, দুষ্কৃতকারীর ঘরটি জ্বালিয়ে দাও। হুকুম তামিল হল। আমার পরিকল্পনা ফল দিতে শুরু করল। ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরের একটি এলাকা। ওখানে ছিল একটি হাট, একটি তহশিল অফিস ও একটি প্রাইমারি স্কুল। এক গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু নিম্নবর্ণের লোক বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। অবস্থার উন্নতি হয়েছে দেখে তারা নিজেদের বাড়ী ফেরার পথে ঐ হাটে রাত্রি যাপন করছিল। পাশের গ্রামের লোকজন তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের সব লুটে নেয় এবং তিন-চার জন লোক ওখানে নিহতও হয়।

এই ঘটনায় খুব দুঃখ পেলাম। আহতদের চিকিৎসার জন্য ত্বরিত একটা ফিল্ড হসপিটাল ওখানে খোলার ব্যবস্থা করলাম। ওখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত ইপিআরদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

একদিনের কথা। রাত্রি তখন দু'টো। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে ক'দিন পর বাসায় ফিরেছি। সবে খেতে বসেছি। ভাত মুখেও তুলিনি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রেলওয়ে স্টেশন থেকে কেউ ফোন করেছে। বলল, স্যার নাটোরে আগুন জ্বলছে। ওখানকার স্টেশনের কর্মচারীরা একটা কামরায় আটক হয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ।

এডিএমকে ফোনে বললাম, কিছু পুলিশ নিয়ে রওয়ানা হয়ে যেতে। পরক্ষণেই ভাবলাম- না, আমার নিজেরই যাওয়া উচিত। ছ'জন পুলিশ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বলে রাখি, পুলিশের নিচের দিকের লোকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে তাদের কর্তব্য পালন করতে।

মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিটে নাটোরে পৌছলাম। স্টেশন মাস্টারের কামরায় কর্মচারীরা সব ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। আমার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে ওরা দরজা খুলে দিল। ওদের মুখে শুনলাম, ঈশ্বরদী থেকে গুন্ডারা এসে ওখানে কয়েকজনকে ছোরা মেরেছে।

হঠাৎ আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোক বাবাগো বলে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল। গা শিউরে উঠল। এমন ভয়ংকর কান্ড আমার পাশে ঘটবে, ভাবতেও পারিনি। খুব কড়া এ্যাকশন নিলাম। দাঙ্গাবাজরা সব হাওয়া হয়ে গেল।

www.pathagar.com

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আর এক কান্ড দেখলাম। একটা একতলা পাকা বাড়ী দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাড়ীর সম্মুখে এসডিও, পুলিশ সার্কেল ইনস্‌পেক্টর এবং দু'একজন ম্যাজিস্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁরা তখনও জানেন না যে, ওঁদের ডিসি ঘটনাস্থলে এসে গেছেন।

এসডিওকে বকাবকি শুরু করলাম, 'আপনি প্রাক্তন আর্মি অফিসার–একটা বাড়ী পুড়ছে আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন। আপনি মানুষ না অন্য কিছু।' বলতে বলতে আমি নিজেই বাড়ীর ভেতর ঢুকবার জন্য অগ্রসর হলাম। ওঁরা পেছন থেকে আমাকে বারণ করতে লাগল। বলতে লাগলেন, 'বাড়ীর ভেতরে কেউ জীবিত নেই, সব মরে গেছে।'

ভেতরে ঢুকে দেখলাম বাঁদিকের একটা চালাঘরে এক মহিলা ও শিশুর লাশ। আগুনে ঝলসে গেছে। ওদের বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। এবার মূল বাড়ীর সামনের কামরার দরজা দিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, একটা খাটে এক বৃদ্ধ পেট কাটা অবস্থায় পড়ে আছে আর তার পাশে এক মহিলা শুয়ে আছে। মনে হল মহিলার শ্বাস–প্রশ্বাস যেন চলছে। ওপরে নজর গেল। কড়িকাঠ জ্বলছে। যে কোন মুহূর্তে ওদের ওপর পড়তে পারে।

মহিলাকে বাঁচানর জন্য এগিয়ে গেলাম। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি আমার পেছনে পেছনে অনেকে বাড়ীর ভেতর ঢুকেছে। মহিলাকে উদ্ধারের কাজটি আর আমাকে করতে হল না, সঙ্গীদের দু'জন সে কাজটি করল। আমার ধারণাই ঠিক। মহিলা জীবিত। সে জল জল বলে ঠোঁট নাড়ছিল। এসডিও সাহেবকে লক্ষ্য করে বললাম, একটু আগে ভেতরে ঢুকলে দু'টো প্রাণই বাঁচত।

শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। অল্প কিছুদূর যাবার পর একটি গাছ থেকে কে যেন উচ্চস্বরে বলছে, 'বাবাগো আমি এখানে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কে'? জবাব এল, 'আমি সিংড়ার মানুষ'। তাকে অভয় দিকে বললাম, 'এখন ভয় নেই, নিচে নেমে আয়।'

শহরের মুখে বিশিষ্ট স্থানীয় রাজনীতিক মজিদ সাহেবের বাড়ী। তাঁর বাড়ীর কাছে একটি মসজিদ। দেখলাম একটা লোক মসজিদে বসে আছে। সে নামাজ পড়তে– না ভয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে, বলতে পারব না। তাকে মসজিদ থেকে বেরুতে বললাম। সে ভয়ে ভয়ে আমাদের সামনে এল। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? তোমার বাড়ী কোথায়? সে জানাল, সে একজন ব্যবসায়ী এবং বাড়ী এ পাড়াতেই। এখানে মসজিদে তুমি কি করছ? আমি জানতে চাইলাম। সে নিরুত্তর রইল। পুনঃপুন জিজ্ঞাসার পরও

www.pathagar.com

যখন সে মুখ খুলল না তখন আমার ইশারা পেয়ে এক সিপাই তাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিল। দাঙ্গাবাজরা বুঝুক তাদের রাজত্ব কায়েম হয়নি।

মজিদ সাহেবকে ডাকতে বললাম। প্রতিবেশী বাড়ী আক্রান্ত হয়েছে। মানুষ মরছে, বাড়ীঘর পুড়ছে আর এঁরা নরম বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। এই এঁদের মানুষের প্রতি ভালবাসা আর এই এঁদের রাজনীতি।

সারা শহর ঘুরে ঘুরে বলে দিলাম, শান্তিপ্রিয় মানুষের কোন ভয় নেই। আপনারা নিরাপদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্মি এসে যাবে। দাঙ্গাবাজদের ক্ষমা করা হবে না।

সারা শহর শান্ত হয়ে গেল। কে বলবে কিছুক্ষণ আগে এখানে নারকীয় কান্ড ঘটে গেছে। আমরা রাজশাহীর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। মসজিদে মসজিদে তখন ফজরের আযান হচ্ছিল।

রাজশাহীর দাঙ্গা নিয়ে ভারত খুব হৈ চৈ করছিল এবং বাইরের দুনিয়াতেও অপপ্রচার চালাচ্ছিল। সম্ভবত সে কারণেই একদিন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এক সাংবাদিক গোষ্ঠী রাজশাহী সফরে এলেন। ঠিক সেই সময় মালদহ ও মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা-তাড়িত পালিয়ে আসা মানুষে রাজশাহীর টাউনহল ক্যাম্প উপচিয়ে পড়ছে।

সাংবাদিকদের আমি নিজে অভ্যর্থনা জানালাম। আমার এক নতুন শিক্ষানবীশ এনাম আহমদ চৌধুরীকে তাঁদের সহযোগিতার কাজে নিয়োজিত রাখলাম-যাতে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, যেখানে খুশী যেতে পারব কিনা? বললাম, দাঙ্গার সময় সবাইকে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রাস্তায় বেরুতে হয়। তাঁরা যদি সে ঝুঁকি নেন, আমাদের কোনই আপত্তি নেই। তাঁদের একটা জিপ দেওয়া হল-যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন।

সাংবাদিকদের দলটি বিকেলে ফিরে এল। তাঁদের মুখপাত্র আমাকে বললেন, 'আপনি একজন 'হ্যারাসড' ডিসি। একদিকে সারি বেঁধে ওপার থেকে বীভৎস নৃশংসতার কাহিনী নিয়ে শত শত মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে আসছে আশ্রয়ের খোঁজে আর অন্যদিকে নিজের এলাকায় বিরাজ করছে অশান্ত পরিস্থিতি।' আমি জানতে চাইলাম, আমার সহকর্মী তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে কিনা? ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'মোটেই না। তিনি আমাদের কাজে প্রচুর সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমাদের দোভাষীরও কাজ করেছেন।' খুশী হলাম।

একদিন পর ভারতীয় সংসদে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এক বিবৃতি ঝাড়লেন, 'রাজশাহী সরকারী প্রশাসন বিশ্বের ঝানু সাংবাদিকদেরও বিভ্রান্ত করেছে'। বুঝলাম এটা ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের কর্ম। অথচ বিদেশী সাংবাদিকরা যা দেখেছেন এবং লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যা জানতে পেরেছেন তাই রিপোর্ট করেছেন। আমাদের

www.pathagar.com

প্রতি তাঁদের সহানুভূতি থাকার কোন কারণ নেই। আতিথেয়তা বলতে একটা জিপ ছাড়া তাঁদের আর কিছুই দিতে পারিনি। না, এক পেয়ালা চা-ও খাওয়াতে পারিনি। তাঁরা ফিরে যাবার পথে সাক্ষাৎ করতে এলে বলেছি, 'মাফ করবেন, আমি আপনাদের কোন রকম আপ্যায়ন করা থেকে বিরত রইলাম-যাতে কেউ কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে না পারে-সেজন্য। আশা করি, আপনারা সেটা বুঝবেন।'

নাটোর মহকুমার আবদুল মজিদ এমএনএ আমার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ খানের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করলেন যে, ডিসির অত্যাচারে মুসলমানরা জেলা থেকে হিজরত করছে। এর বিহিত ব্যবস্থা করা হোক। এই অভিযোগের জবাব দেবার জন্য তাগিদ এল।

এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর কঠোর না হলে দাঙ্গা থামাতে আমাকে আরো অনেক পেরেশানিতে পড়তে হত। একথাও সত্য যে, প্রশাসন শিথিলতা দেখালে বহু নিরীহ লোককে প্রাণ দিতে হত।

আমার বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। জেলা এসপি এস এম নওয়াব ছিলেন বলতে গেলে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। আর্মি তলব করা হয়েছিল মূলত দাঙ্গাবাজদের ভয় দেখানর জন্য। আর্মির মনোভাবের কথা আগেই বলেছি। তবে ইপিআর বাহিনী যতটুকু পেরেছে সাহায্য করেছে। পুলিশের যে অংশ আমি নিজে পরিচালনা করেছি তাদের সহযোগিতা পেয়েছি। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা ছিল বৈরী। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় সীমান্তের ওপার থেকে দলে দলে স্বজনহারা মানুষ এসে সমগ্র জেলাকে আবেগ থরো থরো করে ফেলেছিল। ভারত যদি মুসলিম নিধন বন্ধ করতে পারত তবে আমাদের এখানকার দাঙ্গাবাজরা ঘর থেকে বেরুনর সাহস পেত না-এ কথা আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি।

সব কিছু ঠিকঠাক মত গুছিয়ে নেবার উদ্যোগ নিলাম। সরকারকে জানিয়ে দিলাম, বর্তমান এসপিকে নিয়ে আমার কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁকে অবিলম্বে সরিয়ে নেয়া হোক। নচেত আমি লম্বা ছুটি নিয়ে সরে যাব এখান থেকে। এক সপ্তাহের মধ্যে এসপি কুমিল্লা বদলি হয়ে গেলেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস। নানা অনুষ্ঠানে দিনটা কেটে গেল। ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাতে ঘুমাতে গেলাম। মধ্যরাতের পর ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলেই পেলাম দুঃসংবাদ। নওগাঁয় এক সিনেমা হলের ভেতর পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং সেখানে কি এক ঘটনা নিয়ে গন্ডগোল বাধলে এসডিও আইয়ুবুর রহমানের নির্দেশে গুলি চালান হয়। এসডিও কোন রকমে তাঁর বাসায় এসেছেন কিন্তু শত শত লোক বাসা ঘেরাও করে রেখেছে। পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক। যে কোন সময় এসডিওর বাসায় উত্তেজিত জনতা আগুন দিতে পারে।

www.pathagar.com

নতুন এসপিকে তাঁর বাসায় গিয়ে ঘুম থেকে তুললাম। রেলওয়েকে বললাম, একটা মোটরট্রলি রাজশাহী পাঠাতে। কমিশনার সাহেব অসুস্থ তবুও কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে নিজে গিয়ে ঘুম থেকে জাগালাম। বললাম, 'স্যার, ঢাকা থেকে ফোন এলে বলবেন ডিসি ঘটনাস্থলে গেছে। ফিরে এলে রিপোর্ট পাঠান হবে। দয়া করে কোন মতেই কোন মন্তব্য করবেন না।' আমি ফিরতে উদ্যত হয়েছি তখন কমিশনার মোখলেছুর রহমান সাহেব আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'নাজির, একটু দাঁড়াও। মনে রেখ, তুমিও এক সময় এসডিও ছিলে।'

মোটরট্রলি ঝড়ের বেগে চলছে। অন্ধকার রাত। ঠান্ডা বাতাস। আমার তো হাত-পা জমে যাবার অবস্থা। এসপি সাহেব দু'টো কম্বল এনেছিলেন-পায়ের উপর দিলাম। কিন্তু প্রচন্ড বাতাসের কারণে কম্বল রাখা যাচ্ছিল না।

ভোর সাড়ে চারটায় নওগাঁ ডাকবাংলোয় পৌছলাম। আমি তখন শীতে রীতিমত কাঁপছিলাম। চৌকিদারকে বললাম, 'গরম পানি দাও আর খুব গরম চা বানাও।' গরম পানি দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করলাম। এবং লেপ ও কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়েই পরপর তিন কাপ গরম চা গিললাম।

জানতে পারলাম, এখনো এসডিওর বাসা অবরুদ্ধ। উত্তেজিত জনতা মাঝে-মাঝে বাসা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়ছে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করছে। এ খবরও ছড়িয়ে পড়েছে যে, ডিসি-এসপি এসে ডাকবাংলোয় উঠেছেন।

ডাকবাংলোটা একেবারে সদর রাস্তার উপর। প্রাচীর নেই, তবে বেড়া দেয়া আছে। ক্রমেই ভীড় জমছে এবং সেটা বেড়েই চলেছে। চৌকিদারকে বললাম, পাবলিককে বেড়ার বাইরে থাকতে বলে দাও আর কেউ ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলে তার বিপদ হবে। এতে কাজ হল। কেউ ভেতরে ঢুকবার সাহস করল না।

এসপিকে বললাম, রাতে যা ধকল গেছে, নাস্তা না খেয়ে কিন্তু কোন কাজ করছি না। ইতিমধ্যে নাস্তাও তৈরী। একজন পিয়নকে ডেকে বললাম এসডিওর বাসায় গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে বল ডিসি সাহেব তাঁকে ডাকবাংলোয় যেতে বলেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নাস্তা করবেন।

এসপি বাধা দিয়ে বললেন, 'এ কাজ করবেন না। জনতার মুড ভাল নয়। এসডিওকে এ অবস্থায় রাস্তায় পেলে মারপিট করতে পারে।' আমি রসিকতা করে বললাম, 'মারলে দু-এক ঘাই মারবে-একেবারে মেরে ফেলবে না তো। তিনি একজনকে গুলি করেছেন-ছেলেটা বাঁচবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং দু-এক ঘা খায় খাক না।'

www.pathagar.com

এবার সিরিয়াস কণ্ঠে এসপিকে বললাম, 'এসডিওকে যদি উত্তেজিত জনতার মাঝখান দিয়ে বের করে আনতে পারি তা হলে আমাদের সমস্যা পানির মত সহজ হয়ে যাবে।' তিনি আর আপত্তি করলেন না।

এখন আমাদের রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষার পালা। এসডিও কি আসতে পারবেন? কাজটা নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ। এসপি আর আমি একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছি। যতটুকু সময় আসার জন্য লাগে তা পার হয়ে গেছে। আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল।

প্রায় আধঘন্টা পর এসডিও সশরীরে এসে হাজির হলেন। জনতা তার কোন ক্ষতি করেনি। আমরা নাস্তায় মন দিলাম। ইচ্ছে করেই সময়ক্ষেপণ করছিলাম। নাস্তাটাও ভাল হয়েছিল। এদিকে বাইরে উত্তেজিত মানুষ নানারকম ধ্বনি দিচ্ছে, চিৎকার করছে এবং সমস্ত ভীড়টা এখন ডাকবাংলোর সম্মুখে স্থানান্তরিত হয়েছে। এসপিকে বললাম, আপনি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারী করুন। তিনি একটু ইতস্তত করে বারান্দায় গিয়ে পায়চারী শুরু করলেন। জনতা এসপি সাহেবকে বারান্দায় পায়চারী করতে দেখে রোষে ফেটে পড়ল। নানারকম চিৎকার, স্লোগান শোনা গেল এবং এসপিকে নানা পদের জীবজন্তুর বাচ্চা বলে গালাগাল দিতে লাগল। এই প্রক্রিয়া প্রায় পনের মিনিট চলল। এসপি কামরায় ফিরে এসে বললেন, 'ডিসি সাহেব, এ সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে–আপনি বললে ব্যাটাদের শায়েস্তা করে দেই।' আমি বললাম, 'না, তা ঠিক হবে না। ওরা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, আমাদেরও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। ওরা চাইলে এসডিওর বাংলো ইতিমধ্যে জ্বালিয়ে দিতে পারত। এসডিওকে বহাল তবিয়তে এখানে আসতে দিত না।'

এসপি সাহেবকে বললাম, আপনি আবার গিয়ে ওদের বলুন ওরা যেন ওদের মধ্য থেকে চার জনের এক প্রতিনিধি দল পাঠায়–ডিসি সাহেব কথা বলবেন।

জনতার আসল সমস্যা এবার শুরু হল। আধ ঘন্টা পার হয়ে গেল তবুও তারা চার জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারল না। তারা দাবী জানাল, ডিসি সাহেবকে বাইরে আসতে বলুন। এসপি আমাকে বাইরে যাবার অনুরোধ জানালেন। আমি এ অনুরোধ নাকচ করে দিয়ে বললাম ওদের বলুন ডিসি এসডিওর কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনেছেন। তিনি এসডিওর কথাকে একতরফা বলে মনে করছেন। সুতরাং আপনাদের পক্ষের বক্তব্য শুনেই সবার সঙ্গে কথা বলবেন। এখন বাইরে এসে তাঁর কোন কথা বলা মানে এসডিওর একতরফা বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করা। তাই অন্তত দুজন হলেও ভেতরে পাঠান, যারা আপনাদের কথা বলবে। এ ওষুধ ধরল। তারা এ কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেল। আধা ঘন্টা পর দুজন ছাত্র জনতার প্রতিনিধি হিসেবে ভেতরে এল।

www.pathagar.com

তাদের নাস্তা খেতে দিলাম। তারা ইতস্তত করতে লাগল। বললাম, চা খান, সারা রাত তো রাস্তায় কাটিয়েছেন। সিগারেট অফার করলাম। ওরা বলল আমরা খাই না।

ছাত্র দুজন বলল, 'স্যার, আমরা বেশীক্ষণ ভেতরে থাকলে পাবলিক আমাদের গালাগাল করবে।' ওদের কথা শেষ হতেই বাইরে ধ্বনি উঠল ভেতরে বসে গুজুর, গুজুর করা চলবে না। সরকারের দালালরা বাইরে বেরিয়ে এস।

ছেলে দুজন খুব নার্ভাস হয়ে গেল। ভাবছিল, বাইরে গেলে ওদের পাবলিকের হাতে ধোলাই হতে না হয়। ওদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনলাম। ওরা একটা দাবীনামা পেশ করল। ১, এসডিওকে ডিসমিস করতে হবে। ২, গুলিবিদ্ধ ছেলেটাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ৩, যথাযথ খেসারত দিতে হবে। ৪, ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

এবার দু'ছাত্রের কাঁধে দু'হাত রেখে আমি বারান্দায় বেরুলাম। ভীড় আছে কিন্তু লোকসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কম। সারা রাত ওরা বিনিদ্র কাটিয়েছে। তারপর এখন উঠেছে চড়া রোদ– আর কত?

হৈচৈ চিৎকার চলছিল। আমি বললাম, আপনারা চুপ করুন, শান্ত হোন। চিৎকার করলে, হৈচৈ করলে আমার কথা শুনবেন কি করে? ধীরে ধীরে জনতা শান্ত হল। ঘটনা যা শুনেছি তার কিছু উল্লেখ করে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলাম। এসডিওর নির্দিষ্ট চেয়ারে একজন অধ্যাপকের বসে পড়া যেমন ঠিক হয়নি তেমনি সেই অধ্যাপককে চেয়ার থেকে উঠাতে গিয়ে গুলির আশ্রয় নেওয়াটাও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য কাজ হয়েছে। এই সামান্য, অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা যে এতদূর গড়াবে তা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। এসডিও সাহেব যদি অধ্যাপক সাহেবের কাছে গিয়ে বলতেন আপনি আমার চেয়ারে বসেছেন ঠিক আছে বসুন,– আমি আর একটা চেয়ার এনে আপনার পাশে বসছি। এতে এসডিওর সম্মান খাট হত না এবং আমার বিশ্বাস এতে অধ্যাপক সাহেব লজ্জা পেয়ে উঠে যেতেন এবং ঘটনারও পরিসমাপ্তি ঘটত ওখানেই। এসডিও এসডিও–ই কোন চেয়ার তাঁর মান–মর্যাদা কম–বৃদ্ধি করতে পারে না। যা হোক, আমার সমমর্যাদার একজন অফিসার আজ থেকে পুরো ঘটনার তদন্ত কাজ শুরু করবেন এবং তিন দিনের মধ্যে তিনি আমাকে রিপোর্ট দেবেন। আপনারা বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা বলেছেন, সে ক্ষমতা ডিসির নেই। তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা রাখেন না। ছেলেটির অবস্থা জানার জন্য আমি সিভিল সার্জেনের সঙ্গে আলোচনা করব। যদি রাজশাহী তাকে স্থানান্তর করা যায়, নিশ্চয়ই করা হবে। আর যদি তা না হয়, প্রয়োজনীয় ডাক্তারকে এখানে নিয়ে আসা হবে। মোট কথা, তার সুচিকিৎসার সকল ব্যবস্থা করা হবে। তবুও যদি আপনারা সন্তুষ্ট না হন

www.pathagar.com

তবে আপনাদের কেউ ডাক্তার থাকলে চলুন আমার সাথে হাসপাতালে। আমাকে লিখিত দিন যে রোগীকে স্থানান্তর করাতে তার জীবনের কোন ঝুঁকি নেই। তা হলে এখনি আমি রাজশাহী পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ক্ষতিপূরণের কথা বলেছেন। এটা করা হবে। তবে পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে সরকারের সাথে পরামর্শ করে। এবার এসডিওর প্রসঙ্গে আসছি। তিনি ঘটনার জন্য খুবই দুঃখিত। ঘটনা একের পর এক ঘটে গেছে। আপনারা তাঁকে মারতে উদ্যত হওয়ায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আমরা দু'জন একই চাকরি করি। তাঁকে শাস্তি দেয়ার মালিক আমি নই, সরকার। হ্যাঁ, আমি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সরকারকে জানাব এবং এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করব।

আমার বক্তৃতা শেষ করে জনতাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'আপনাদের আর কোন দাবী আছে?' কয়েকজন চিৎকার করে বলল, 'এসডিওকে বদলি করে দিন।' বললাম, 'হ্যাঁ, এটা শুধু আপনাদের দাবী নয়, এসডিও সাহেবও তাঁর বদলি চেয়েছেন। সুতরাং কোন সমস্যা নেই এ ব্যাপারে। তবে বদলি করার মালিকও আমি নই। রাজশাহী গিয়েই আমি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।'

জনতা আনন্দে উল্লাস করতে লাগল। বললাম, 'আপনারা আর ভীড় করবেন না, এখান থেকে চলে যান। অল্প সময়ের মধ্যে সবাই চলে গেল।

এসডিওর বাসায় গেলাম। ঢাকা থেকে লাট সাহেব কথা বলবেন। এসডিওকে চাচ্ছেন। বলা ভাল, পূর্বতন গভর্নরের জায়গায় নতুন গভর্নর হয়ে এসেছেন জনাব আবদুল মোনেম খান। আমি ফোন ধরলাম। মোনেম খান সাহেবের কণ্ঠ শুনলাম, 'এসডিও কোথায়?' 'আমি ডিসি বলছি' আমি বললাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় আমল না দিয়ে চিৎকার করে জানতে চাইলেন, এসডিও কোথায়? আমি আবারও শান্ত কণ্ঠে বললাম, স্যার, আমি ডিসি নাজির বলছি। আমি ভোর রাতে এসপিসহ এখানে এসেছি। এখানকার প্রশাসনের সকল দায়িত্ব এখন আমি নিজে গ্রহণ করেছি। আপনার যা বলার আছে আমাকে বলুন।' অপরপ্রান্ত থেকে গভর্নর বললেন, 'ও, নাজির বলছেন? ঠিক আছে। ওখানকার অবস্থা কি? সব ঠিক হয়ে গেছে তো?

সংক্ষেপে তাঁকে ঘটনার বিবরণ দিলাম এবং পরবর্তী অবস্থাও জানালাম। বললাম, এসডিও একটি চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তাঁর উপর হামলা হয়েছিল এবং তাঁর জীবন রক্ষার জন্যই গুলি চালাতে হয়েছিল। এ জায়গায় আমি থাকলে হয়তো আরও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হত। মোদ্দাকথা, ঘটনা যেভাবে রূপ নিয়েছিল, গুলি ছাড়া পথ ছিল না।

গভর্নর উত্তাপহীন শান্ত কণ্ঠে বললেন, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে তো? জবাবে বললাম, 'হ্যাঁ, 'আপাতত সব ঠিক আছে। লোকজন যে যার বাড়ী চলে গেছে। তবে

www.pathagar.com

গুলিবিদ্ধ ছেলেটার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক, যে কোন সময় সে মারা যেতে পারে। আর সত্যি সত্যি যদি সে মারা যায় তবে তার লাশ নিয়ে নতুন করে একটা হাঙ্গামা বাধার সম্ভাবনা আছে।' গভর্নর মোনেম খান তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগেই তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'স্যার, অবস্থা যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি এখানে থাকব।' গভর্নর বললেন, 'ঢাকায় ন্যাশনাল এসেমব্লির অধিবেশন বসছে, অপজিশন একটা মোশন আনতে পারে।' আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম, 'স্যার, সরকার তদন্ত দল পাঠাতে পারেন। এতে কোন অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। মনে হল তাঁর মধ্যে যথেষ্ট স্বস্তি ফিরে এসেছে। জানতে চাইলেন, 'লিখিত রিপোর্ট কখন পাব? বললাম, 'রাজশাহী ফিরে গিয়েই কেবল রিপোর্ট দেয়া সম্ভব। কারণ এডিএমের তদন্ত রিপোর্ট আমাকে পেতে হবে এবং তাঁর ভিত্তিতেই আমার রিপোর্ট যাবে।'

গভর্নরের সাথে ফোনে কথা শেষ করে রিসিভার রাখতেই সবাই যেনো হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, আপাতত কিছুটা নিশ্চিত হওয়া গেল। এক কাপ গরম চা খেয়ে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। একটু বোধ হয় তন্দ্রার মত এসিছিল। কিন্তু দরজার বাইরে মানুষের আনাগোনা এবং ফিসফাস শব্দ শুনতে পেলাম। উঠে পড়লাম। দরোজা খুলে দেখি সেই ছেলে দু'টো যারা ডাকবাংলোয় জনতার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ওদের চেহারা দেখেই বুঝলাম, অঘটন কিছু একটা ঘটেছে। যা আশঙ্কা করেছিলাম হল তাই। ওরা বলল, 'স্যার, গুলিবিদ্ধ ছেলেটি মারা গেছে।' একটা তরুণ প্রাণের অকাল মৃত্যুতে খারাপ লাগল, কিন্তু বাইরে অনমনীয় ভাবটা পুরাদস্তুর বজায় রাখলাম।' মনে মনে স্থির করলাম, কঠিন হস্তে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে; এতটুকু দুর্বলতা দেখালে আরো প্রাণহানি ঘটবার সম্ভাবনা আছে।

ছাত্র নেতৃদ্বয় আবদারের ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার আমরা নিহত ছাত্রের লাশ নিয়ে মিছিল করব বলে স্থির করেছি। এখন আপনার অনুমতি চাই।'

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, 'তা কখনই হবে না। লাশ নিয়ে কোন মিছিল করা যাবে না। লাশ পুলিশের হেফাজতে ছেলের বাড়ী পাঠান হবে। তোমরা ইচ্ছে করলে সঙ্গে যেতে পার।'

ছেলে দু'জন আরো বিনীত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, আপনাকে অনুমতি দিতেই হবে। এটা এখানকার জনগণের দাবী, কোন মতেই তা উপেক্ষা করা যাবে না।'

আমি আগের মতই কঠিন কণ্ঠে বললাম, 'বাজে কথা। কোন্ জনগণ এ দাবী করেছে? ওদের নিয়ে এস এখানে। আর তা যদি না পার, চল, আমি যাব ওদের কাছে।'

ওরা বেকায়দায় পড়ে গেল, কি করবে ঠিক করতে পারছে না। ঠিক এসময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে মুশকিল আসান হয়ে গেল। মৃত ছেলের আত্মীয়-স্বজনকে

www.pathagar.com

আমার কাছে আনা হল। আমি ওদের সমবেদনা জানালাম এবং সান্ত্বনা দিলাম। লাশের সাথে সর্বোত্তম আচরণ কি হওয়া উচিৎ, বুঝিয়ে বললাম। সুখের বিষয়, ওরা আমার সাথে এক মত হলেন। ছাত্রনেতৃদ্বয়কে ওরাই জানিয়ে দিলেন,'আমরা আমাদের ছেলের লাশ নিয়ে রাস্তায় নাচানাচি করতে দেব না।'

ইতিমধ্যে রাজশাহী থেকে তদন্তকারী এডিএম এসে গেছেন। তাঁকে পুলিশ দিয়ে লাশের সঙ্গে পাঠালাম সরকারী খরচে লাশ দাফন করার জন্য।

পরদিন তিন জন এমএনএ এলেন ঘটনার তদন্ত করতে। তদন্ত শেষে তারা আমাকে মৌখিকভাবে জানালেন যে, অতি সুন্দর এবং নিখুঁতভাবে পরিস্থিতি হ্যান্ডল করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুলি চালাতে হয়েছে সত্য; তবে তা হয়ত এড়ান যেত। কিন্তু অনভিজ্ঞতা ও কিছু লোকের চক্রান্তের কারণে তা সম্ভব হয়নি।

রাজশাহী ফিরে এলাম। কমিশনার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সবকিছুই জানালাম। অবশ্য আগেই ফোনে তাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছিলাম।

এবার আমার রিপোর্ট দেবার পালা। দু'তিন লাইনে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করলাম ঃ 'দ্যা ফায়ারিং ওয়াজ জাস্টিফাইড।'

কমিশনার সাহেব তাঁর মন্তব্য লিখলেনঃ 'আমি ডিসির রিপোর্ট সমর্থন করি।'

চার-পাঁচ দিন পর স্বরাষ্ট্র দপ্তর লিখল ঃ 'রিপোর্ট আরও বিশদ হওয়া প্রয়োজন।' জবাবে লিখলাম, 'আমার রিপোর্টে আর কিছু যোগ করার নেই'। কমিশনার সাহেব লিখলেন, আমার আগের মন্তব্যকে আমি যথেষ্ট মনে করি।' বিষয়টি এখানেই শেষ।

শিক্ষানবীস সিএসপি অফিসার এইচ টি ইমাম ঘটনার সময় নওগাঁয় উপস্থিত ছিল। এসএন্ডজিএ দপ্তরকে বললাম, নওগাঁর ঘটনা আমরা কিভাবে নিষ্পত্তি করেছি এই তরুণ অফিসার তা প্রত্যক্ষ করেছে সুতরাং তাকেই নওগাঁর এসডিও করা হোক এবং বর্তমান এসডিওকে অন্যত্র বদলি করা হোক। এক সপ্তাহের মধ্যেই এ কাজ করা হল।

মনে আছে, নতুন এসডিওকে নিয়ে নওগাঁ-এ ব্যাপক সফর করেছিলাম। সে আমার অধীন শিক্ষানবিস ছিল আর এখন এসডিও। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই প্রশাসনের নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতাম যাতে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা পায়। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম, আমাদের অর্থাৎ সিএসপি অফিসারদের এমন আচার-আচরণ করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের আস্থা এবং সম্মান দুটোই

www.pathagar.com

নিজেদের অজান্তেই অর্জন করতে পারি। সে জন্য চলাফেরা, উঠাবসা, কথাবার্তা এক কথায় সব বিষয়েই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হঠাৎ সে আমাকে একটা বিব্রতকর প্রশ্ন করে বসল, 'স্যার, আমাদের সার্ভিসে এ অঞ্চলের প্রবীণদের মধ্যে এমন একজনের নাম করুন যাকে আমরা শিক্ষানবীসরা অনুকরণ করতে পারি।' তার কথার জবাব না দিয়ে উল্টো তাকে বললাম, কেন একথা জিজ্ঞেস করছ? সে খোলামেলাই বলে ফেলল, সেদিন ডিনারে দেখলেন না স্যার, প্রেসিডেন্টের সম্মুখে আমাদের প্রদেশের প্রবীণতম অফিসারটি যে বক্তৃতা করলেন তার মর্মার্থ একটাই ঃ তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে আর তিনি চাচ্ছেন একটা এক্সটেনশন। সে মিথ্যে বলেনি এক বর্ণও। আমাদের চরিত্রের এ দিকটা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে একজন প্রবীণ পুলিশ অফিসার আমাকে বলেছিলেন, 'নাজির, তোমাদের সার্ভিসের চেহারা আমাদের দারোগাদের চেয়েও জঘন্য।' তাঁর কাছেও আমি জানতে চেয়েছিলাম তাঁর এই ধারণার কারণ কি? তিনি বললেন, ক'দিন আগে আমার সামনে তোমাদের একজন লাট সাহেবের কাছে তোমাদের আরেক জনের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় কুৎসা গাইছিলেন।

আমাদের মধ্যে ভাল ছিল না– এ কথা হয়ত বলা যাবে না কিন্তু বেশীরভাগের চেহারা যে এরকম, সেটা অস্বীকার করব কি করে? অনুকরণ করার মত লোকের অভাব ছিল বলেই হয়ত তরুণ অফিসারদের আমরা দিক-নির্দেশ করতে পারি না। ফলে অঘটন ঘটেছে অনেক। আমাদের এই তরুণ এসডিও এর ব্যতিক্রম নয়। পরবর্তীকালে বয়স, অভিজ্ঞতা ও সিনিওরিটি সবকিছুর সীমানা পেরিয়ে এই এসডিও চাকরির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। তবে জেল ও চাকরিচ্যুতি কোনটাই সে এড়াতে পারেনি। সে কাকে অনুসরণ করে এত উপরে উঠল এবং ধপাস করে নিচে পড়ে গেল তা অবশ্য আমার জানা নেই। তবে অফিসারটি যে কর্মঠ ও বুদ্ধিমান ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক শাখা থেকে খবর এল, হিন্দুস্তান সরকার আসামের শিলং-এ কর্মরত পাকিস্তানী সহকারী হাইকমিশনারকে অযথা উত্ত্যক্ত করছে– এমনকি বেচারা দোকানে কেরোসিন কিনতে গেলেও তাঁকে ফলো করা হচ্ছে। সুতরাং এ ঘটনার প্রতিবাদ বা প্রতিশোধ হিসেবে রাজশাহীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে হবে।

রাজশাহীতে তখন যিনি ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর আদি বাড়ী ঢাকার মুন্সিগঞ্জে। তাঁর এটাই প্রথম বিদেশ আগমন। ব্যবহার ছিল ভদ্র কিন্তু আচরণে খুব-একটা পটু ছিলেন না। সে জন্য মাঝে-মধ্যে আমাদের খারাপ লাগত।

শিলং-এর ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যবস্থাদি শুরু হল। কখন কখন ফোন করে তিনি জানাতেন যে পুলিশ তাঁকে নাজেহাল করছে। তাঁর এ অভিযোগের জবাবে আসলে

www.pathagar.com

তো বলার কিছু নেই। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল ডিসি মাসে দু'বার এবং এসপি ও কমিশনার মাসে একবারের বেশী ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের সাথে দেখা করতে বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন না এবং প্রতিটি সাক্ষাতের বা যোগাযোগের বিবরণ লিখিতভাবে সরকারকে জানাতে হবে। সুতরাং পারতপক্ষে সকলেই এসব ঝামেলা এড়িয়ে চলত। তবুও তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, 'খুবই অন্যায় কথা, আমি এ ব্যাপারে এসপির সাথে কথা বলব।'

ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন বলে খবর পেলাম। বহু সংখ্যক ছাত্র যুবক নিয়ে তিনি তাঁর অফিসে প্রতি শনি-রবিবার ভরতীয় ছবি দেখে থাকেন। পাশাপাশি তিনি প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় বই নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিলি করে যাচ্ছেন।

একদিন গোয়েন্দা বিভাগের লোক একগাদা বই ধরে আমার কাছে নিয়ে এল। বেশীরভাগ বই-ই পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে নাড়া দেবার মাল-মসলাসম্বলিত। বইগুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

খবর পেলাম, রাজশাহীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে তিনি স্থানীয় হিন্দুদের সেবারের মত দুর্গা পূজা বর্জন করার উস্কানি দিচ্ছেন। খবরটা যাচাই করে দেখা গেল, শুধু রাজশাহী শহর নয়, সারা জেলাতেই তিনি এ মিশন নিয়ে কাজ করছেন।

মনে মনে স্থির করলাম, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের এই চক্রান্ত বানচাল করতে হবে। এসডিওদের প্রযোজনীয় নির্দেশ দিলাম আর পিএন বিশিকে তলব করলাম। বিশি বাবু ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন না। বললেন, আর্থিক অসুবিধা এবং নিরাপত্তার অভাব ঘটতে পারে- এ সব কারণে পূজা-মন্ডপ কিছুটা কম হতে পারে- এইযা।

পিএন বিশির ওপর দায়িত্ব চাপালাম। বললাম, প্রতি বছর যতগুলো পূজা মন্ডপ হয়, এবার তার চেয়ে বেশী করতে হবে। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি নিজে করব।

মহাধূমধাম করে সারা রাজশাহী জেলায় দূর্গা পূজা পালিত হল। রাজশাহী শহরে অন্যান্য বারের চেয়েও বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল। আমি আগে থেকেই এক জন অফিসারকে ক্যামেরাসহ তৈরী রেখেছিলাম। তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার ও তাঁর পরিবারের লোক যে সব পূজা মন্ডপে যাবে, তার ছবি তুলতে হবে। আগেই আশংকা করেছিলাম যে, সহকারী হাইকমিশনার তাঁর সরকারকে

www.pathagar.com

একটা উল্টা পাল্টা রিপোর্ট হয়ত পাঠাবেন। সে কাজটা তিনি যাতে করতে না পারেন, সে জন্যই এ ব্যবস্থা।

পূজা শেষে অনেকগুলো ছবির একটা এ্যালবাম বানিয়ে রাজশাহী প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

তাঁকে জানান হয়েছিল যে, রাজশাহী শহরের বাইরে কোথাও সফরে গেলে তিনি যেন ডিসি বা এসপিকে অবহিত করেন যাতে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়। তিনি কখনও সে কাজটি করতেন না।

একদিনের কথা। বেশ ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত দশটার দিকে হঠাৎ সহকারী হাইকমিশনারের স্ত্রীর ফোন পেলাম। ভদ্রমহিলার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা! বললেন- 'তার স্বামী বিকেল তিনটার দিকে বাইরে বেরিয়েছেন এবং সন্ধ্যার আগেই তাঁর ফিরে আসার কথা। কিন্তু এখনো তিনি আসেননি। ফলে তাঁর বৃদ্ধ পিতা এবং তিনি নিজে খুবই চিন্তিত। আপনি আমাদের কোন সাহায্য করতে পারেন কি না?

জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কোথায় গিয়েছেন বলে আপনার ধারণা?' ভদ্রমহিলা ক'মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, 'সম্ভবত ঈশ্বরদী গিয়ে থাকবেন।' আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।

এসপির সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলাম। আমরা দু'জনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি আঁটলাম। পাবনার ডিসিকে ফোন করলাম। কথায় কথায় জেনে নিলাম ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার পাবনায় আছেন। তিনি এখন খেয়ে দেয়ে সার্কিট হাউজে ঘুমুচ্ছেন। ডিসি আরো জানালেন যে, তাঁর সাথে আরো একজন লোক আছে।

ডিসিকে আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানালাম না। এসপি আর আমি পাবনার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। বৃষ্টি ইতিমধ্যে থেমে গেছে কিন্তু আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ। চারদিক ঘন অন্ধকার; থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

মধ্যরাতের পর পাবনায় পৌছলাম। সোজা সার্কিট হাউজে গিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম। দরোজা খট খটাতেই একটা রুম থেকে একজন লোক বেরিয় এল। সরাসরি তার কাছে জানতে চাইলাম, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার আছেন কিনা। লোকটি তার পাশের কামরা দেখিয়ে দিয়ে বলল, তিনি ভেতরে ঘুমুচ্ছেন। আমাদের পরিচয় দিয়ে তাকে জাগাতে বললাম লোকটাকে।

কিছুক্ষণ পর ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার চোখ কচলাতে কচলাতে তাঁর রুম থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একগাল হেসে বললেন, 'কি ব্যাপার ডিসি সাহেব, এত রাতে এখানে?' আমি সরল কণ্ঠে বললাম, 'না, ব্যাপার তেমন কিছু নয়। আপনি এই

www.pathagar.com

দুর্যোগের রাতে বাড়ী ফিরেননি বলে আপনার বৃদ্ধ পিতা আর আপনার পতিপ্রাণ স্ত্রী ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। আপনার স্ত্রী আমাকে ফোন করে আপনার খোঁজ-খবর করার অনুরোধ করেছেন। আর সে কারণেই এই অসময়ে আপনার নিদ্রাভঙ্গ করতে হল। অবশ্য এসপি সাহেব বা আমার দপ্তরে যদি প্রথামতো আপনার এই সফরের খবর থাকত, তাহলে আমাদের এই অহেতুক বিড়ম্বনা পোহাতে হত না। যাই হোক, আনন্দের ব্যাপার এই যে, রাজশাহী ফিরে আপনার উদ্বেগাকুল পরিবারকে দুশ্চিন্তমুক্ত করতে পারব, এটাই আমাদের সান্ত্বনা।'

ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার ঘটনার আকস্মিকতা ও নাটকীয়তায় কিছুক্ষণ হতবিহ্বল হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ করে বললেন, 'চা খাবেন?' আমি হেসে বললাম, 'চা তো নিশ্চয়ই খাব। তবে আপনার এখানে নয়, ডিসির বাসায়। ডিসি আমার দোস্ত। ওখানে না গেলে ও রাগ করবে। আপনিও আমাদের সঙ্গী হতে পারেন; শুধু ডিসির বাসা পর্যন্ত নয়- রাজশাহীও আমাদের সাথে যেতে পারেন। এতক্ষণে তিনি নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছেন। বললেন, 'না, এত রাতে আর বেরুচ্ছি না। কাল সকালে রাজশাহী রওয়ানা হব।'

রাজশাহী ফিরলাম আমরা রাত চারটার দিকে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফোন করলাম ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসায়। তাঁর স্ত্রীকে তাঁর নিরাপদ অবস্থান- এর খবরটা দিলাম।

আগেই উল্লেখ করেছি মালদহ ও মুর্শিদাবাদের দাঙ্গায় সেখানকার বহু লোক পালিয়ে এসে রাজশাহী শহরে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের থাকার কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। একটা পরিত্যক্ত পাটের গুদাম, যার অবস্থা অতীব শোচনীয়-তাতে এরা কোন মতে মাথা গুঁজে ছিল। সরকারী রিলিফ খেয়ে অতি কষ্টে এদের দিন কাটছিল।

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় খবর পেলাম, ঝড়-বৃষ্টির ফলে গুদামের একটা দেওয়াল ধসে পড়েছে এবং ধসেপড়া দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে একটা শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গুদামে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষের অবস্থা খুবই করুণ। ভেতরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে বৃষ্টির পানি পড়ে না।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভারত থেকে আসা মার খাওয়া মানুষগুলো আমাদের চোখের সামনে মানবেতর জীবন-যাপন করবে এটা কেমন কথা? এদের জন্য কিছু করা দরকার এবং সেটা এখনি। যেই ভাবা সেই কাজ। জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হামিদ সাহেব থাকতেন সার্কিট হাউজের সামনের এক বাসায়। ভদ্রলোক অত্যন্ত মিশুক। টেনিস খেলতেন এবং শিকারও করতেন। পাকিস্তানের লিডার অব দ্যা হাউজের সেজো ভাই।

www.pathagar.com

তাঁকে জিপে তুলে নিয়ে হাজির হলাম ঘটনাস্থলে। যা শুনেছিলাম এদের অবস্থা তার চেয়েও করুণ। এদের অবস্থা দেখলে অতি কঠিন হৃদয়ও গলে যাবে। হামিদ সাহেবকে বললাম, 'কি করা যায় এদের জন্য?' 'কাল সকালে একটা মিটিং ডাকেন– তখন আলাপ–আলোচনা করে দেখা যাবে কিছু করা যায় কিনা', তিনি উত্তর দিলেন। আমি বললাম, 'এ আপনি কি বলছেন? ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে, এটা আর কালকের জন্য রাখা যায় না। আপনি কি এখান থেকে ফিরে গিয়ে রাতে ঘুমাতে পারবেন?' হামিদ সাহেব বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, এদের এভাবে ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে কি করবেন? রাত বাজে সাড়ে দশটা; দোকান–পাট সব বন্ধ। আমরা তো লাচার'। আমি তাঁর কথায় আমল না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা আপনার জানা মতে শহরের কোথাও কোনো খালি জায়গা আছে?' তিনি খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ, ইপসিক শিল্প নগরীর উত্তরে তিন একরের মত একটা খালি জায়গা আছে। পাবলিকের জমি, সরকার রিকুইজিশন করেছিল, কিন্তু কোন কাজে লাগেনি। পড়ে আছে এমনি এমনি।' আমি ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা ঘুরছিল। হামিদ সাহেবকে বললাম, চলুন জায়গাটা দেখে আসি। যাবার সময় ক্যাম্প থেকে চার জন জওয়ান লোক জিপে উঠিয়ে নিলাম।

একদম খোলা জায়গা। হামিদ সাহেবকে বললাম, এখানে চারশ' পরিবারকে একটা করে কামরা করে দেব। চারটা ইটের পিলারের উপর থাকবে টিনের ছাদ আর বাঁশের তরজার হবে বেড়া। পারা যাবে তো? তিনি অন্ধকারে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বললেন, 'পারা যাবে। নিশ্চয়ই পারা যাবে।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম তার কাছেই একটা জায়গায় থরে থরে ইট সাজান ছিল। হামিদ সাহেব জানালেন, এগুলো সম্ভবত ইপসিকের ইট। আমি বললাম যাদেরই হোক, পরোয়া নেই। আমরা গুনে গুনে ব্যবহার করব।

হামিদ সাহেবকে বললাম, আপনি একজন লেবার নিয়ে ক্যাম্পে যান। সে আরো আট–দশ জন জওয়ান লোক সাথে নিয়ে আসবে। আপনি ওকে ক্যাম্পে নামিয়ে চলে যান কোন টিন বিক্রেতার বাড়ীতে। কাল সকালে যাতে এখানে টিন পৌঁছে সে ব্যবস্থা করবেন। আর কিছু কোদালের ব্যবস্থা করতে হবে।

এক ঘন্টার মধ্যে লোকজন ও কোদাল এসে গেল। সকালে টিনও পৌঁছবে। এদিকে বৃষ্টিও অনেকটা কমে এসেছে। কাজ শুরু হয়ে গেল। মোহাজের জওয়ানরা ইট

www.pathagar.com

বয়ে আনছে। ওরা আমাদের বসার জন্য ইট দিয়ে টুল বানিয়ে দিল। আমরা দু'জন বসে বসে ওদের কাজ তদারক করতে লাগলাম।

মোহাজের জওয়ানরা খুব উৎসাহের সাথে কাজ করছিল। তারা মাথা গুঁজার ঠাঁই পেতে যাচ্ছে– এ তো কম কথা নয়। সম্ভবত সে কারণেই ওদের মধ্যে কোনো ক্লান্তি লক্ষ্য করলাম না। আমার জন্যও ছিল এ এক অপার আনন্দের ব্যাপার। তাই সারারাত অনায়াসে ওদের সাথে কাটিয়ে দিলাম। মাঝে–মাঝে শুধু 'প্লেয়ারস থ্রি' ধ্বংস করে যাচ্ছিলাম।

সকাল হল। দু'জন লোককে ঈশ্বরদী পাঠালাম তরজা আনতে। পাশের গ্রাম থেকে বাঁশ আনার ব্যবস্থা করলাম। অন্যান্য কাজও চলছিল বিরামহীনভাবে। মনে হচ্ছিল এরা মানুষ নয়, জ্বীন। না এদের ঘুমের প্রয়োজন আছে, না বিশ্রামের।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর শুনেছি, এক রাতে রমনা রেস্ট হাউজ বানান হয়েছিল সেক্রেটারী সাহেবদের বাসস্থানের জন্য। এই সকালে নিজেরা হাতে–কলমে দেখছি আমরাও তা পারি কিনা। সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে ৪৮ ঘন্টা। এর মধ্যে তৈরী করতে হবে চারশ' লোকের বাসস্থান।

আমাদের সদর এসডিও মধ্য বয়সী ভারিক্কি চেহারার লোক। তিনি তাঁর বিরাট বপু নিয়ে এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে এই ঘরবাড়ী তৈরীর খবরটা শহর ও আশেপাশে রাষ্ট্র হয়ে গেল। বেশ কিছু উৎসুক লোকের আনাগোনাও শুরু হল। কিন্তু প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কাউকে এ এলাকায় দেখলাম না। তাই মেজাজটা একটু চড়েছিল। কড়া কণ্ঠে বললাম, 'শহরে এতো কান্ড হয়ে গেল আর আপনার পাত্তা নেই।' এসডিও সাহেব লজ্জিত হলেন। তাঁকে বললাম, 'আমরা রাতে বৃষ্টিতে ভিজেছি। ভেজা কাপড় গায়েই শুকিয়েছি। নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়েছি এবং এখনও আমাদের পেটে কিছু পড়েনি। সুতরাং হামিদ সাহেব আর আমি যাচ্ছি। গোসল করে কাপড় পাল্টিয়ে এবং নাস্তা সেরে আমরা আবার আসব। ততক্ষণ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখুন।

তখন সকাল প্রায় নয়টা। রোদ উঠেছে চড়া। এরই মধ্যে হামিদ সাহেবের জ্বর এসে গেছে। কিন্তু তিনি এতটুকুও দমে যাননি। দৃঢ়তার সাথে বললেন, নাস্তা সেরেই তিনি আবার চলে আসবেন। কাজের নেশা লেগে গেছে যে! না এসে উপায় নেই। মনে মনে খুশী হলাম।

বাসায় ফিরে একজন এডিএমকে ফোন করে ওখানে যেতে বলে দিলাম। এখনো হাতে সময় আছে। যে গতিতে কাজ এগিয়ে চলছিল তাতে মনে হচ্ছিল আমরা আমাদের কথা রাখতে পারব।

www.pathagar.com

তৃতীয় দিনে কমিশনার সাহেবকে সব কিছু বললাম। তিনি হয়ত বিষয়টি লোক মুখে শুনে থাকবেন, কিন্তু আমি তাঁকে কিছুই জানাইনি এ সম্পর্কে। শেষ মুহূর্তে একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বসতিটি উদ্বোধন করার অনুরোধ করলাম। তিনি রাজি হলেন।

বিকেলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারকেও দাওয়াত করলাম। তিনি এলেনও। সভা শুরু করে সবাইকে তঁদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'এখানে যারা বাস করবে তাঁরা এমন এক এলাকা থেকে উৎখাত হয়ে এখানে এসেছে যে এলাকায় একদিন সতেরো জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে মহাবীর বখতিয়ার খিলজি কদম রেখেছিলেন। এই দেশ তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর এই অমর কীর্তির স্মরণে এই বসতির নাম রাখা হচ্ছে 'বখতিয়ারাবাদ'। মোহাজেরদের প্রায় সবার চোখ দেখলাম অশ্রুসিক্ত। হঠাৎ আমার চোখ গিয়ে পড়ল আমাদের বিশিষ্ট মেহমান ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের ওপর। ভদ্রলোককে কেমন বিবর্ণ আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। এখানে বলা দরকার যে সহকারী ভারতীয় হাইকমিশনার ঘোষ মশাই আর বেশীদিন রাজশাহীতে থাকতে পারেন নি। পাকিস্তান সরকার তাঁকে রাজশাহী থেকে এবং ভারত সরকার পাকিস্তানের সহকারী হাইকমিশনারকে শিলং থেকে বহিষ্কার করেছিল।

রাজশাহীতে ডিসির দায়িত্ব নেবার পর একটা গণসংযোগের ব্যবস্থা করলাম। কোর্ট বিল্ডিং-এর পূর্ব দিকে একটা বড় বট গাছ ছিল। কোর্টের নাজিরকে বললাম, ওখানে বেড়া দিয়ে একটা বসার ব্যবস্থা করতে। প্রতিদিন বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা যে কেউ আমার সাথে সরাসরি দেখা করে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারবে-এ ঘোষণা দিয়ে দিলাম। একথাটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হল যে, কেউ তার সাথে উকিল-মোক্তার বা তদবিরকারী রাখতে পারবে না।

প্রতিদিন এখানে বসতাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্তত পনেরো-বিশ জনকে সাক্ষাৎ দিতে পারতাম। অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে এরা একজন একজন করে এসে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা আমাকে বলত। যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম যাতে তখনই সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হত না তাই সংক্ষিপ্ত নোট নিতাম। পরে তা এসডিও বা সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম এবং এ ব্যাপারে তাঁরা কি করেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে তা আমাকে জনাতে বলতাম। আমার কাছে এ কাজটা ভাল লাগত এবং মনে হত কিছু মানুষের উপকারও এতে হয়েছে। অবশ্য আমার রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বন্ধুদের কাউকে কাউকে মন্তব্য করতে শুনেছি যে, 'আমরা কাজীর বিচারের যুগে আছি'।

www.pathagar.com

জানতে পারলাম, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব রাজশাহী সফরে আসছেন। সমাবর্তন উৎসবে নয়- আসছেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমাবেশে ভাষণ দিতে এবং সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের অনুষ্ঠানে। ছাত্ররা বলতে গেলে স্থানীয় প্রশাসনের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে থাকে। তার ওপর ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা কয়েক মাস স্ট্রাইক চলছে। পরিস্থিতি জটিল।

যাই হোক, প্রেসিডেন্টের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি শুরু হল। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান সাহেব এবং ন্যাপ নেতা আতাউর রহমান সাহেবকে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে বললাম শান্তি-শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে। কামরুজ্জামান সাহেব যত সহজে কথা দিলেন ন্যাপ নেতা কিন্তু তা করলেন না। তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে, তাঁদের কারণে আমি চাকরি খোয়াতে আসিনি। সে রকম কিছু করলে আমি দ্বিধাহীনভাবে দৃঢ় ব্যবস্থা নেব- এতে যেন কারও মনে কোন সংশয় না থাকে।

প্রেসিডেন্টের প্রোগ্রাম ছিল এ রকমঃ ইশ্বরদী পর্যন্ত তিনি বিমানে আসবে এবং সেখান থেকে স্পেশাল ট্রেনে যাবেন সারদা। সারদা রাত্রি যাপন করে পরদিন সড়কপথে রাজশাহী এসে সার্কিট হাউজের সামনে এক সমাবেশে বক্তৃতা করবেন। এরপর তিনি আবার সারদা ফিরে যাবেন। পরদিন ভোরে একইভাবে ঢাকা ফিরবেন।

নির্ধারিত দিনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সারদা এলেন। প্রদেশেরই নয়, কেন্দ্রেরও অনেক হোমরা-চোমরা ব্যক্তি এলেন তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে। সবার সঙ্গে সারদায় আমার জন্যও একটা তাঁবু পড়ল। সারদায় প্রেসিডেন্টকে পৌছে দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর এসপি আর আমি রাজশাহী ফিরলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃংখলার দায়িত্ব নিয়েছেন ডক্টর এ আর মল্লিক, ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর সাথে যোগাযোগ করায় তিনি বললেন, তিনি নিজে সামনের রাস্তায় থাকবেন। কোন অসুবিধা হবে না। এরপর সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে কথা বললাম। তিনিও পূর্ণ আশ্বাস দিলেন। শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের কোন কারণ নেই। এবার কমিশনার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আগেই ফিরে এসেছেন। তিনি জানালেন, ময়মনসিংহ থেকে কয়েকজন ছাত্র এসেছে এখানে। গোলমাল পাকাবে নাতো? তাঁকে বললাম, সে রকম কোন রিপোর্ট এখনও পাইনি আমরা।

মধ্যরাতে এক ম্যাসেজ এল ঢাকা থেকে। একটি লোক সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে এবং তার চেহারার বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। লোকটি মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমাবেশে অবস্থান নেবে এবং সুযোগ পেলে প্রেসিডেন্টের ওপর হামলাও চালাতে পারে। স্থানীয় গোয়েন্দারা বাংলায় ছাপান একটা লিফলেট আমার হাতে দিল। বড় বড় অক্ষরে

www.pathagar.com

এর শিরোনামে লেখা ছিল।' 'শাহ মখদুমের পবিত্র ভূমি ছেড়ে আইয়ুব ফিরে যাও।' ভেতরে অনেক কথা, অভিযোগের ফিরস্তি। এদিকে সরকারী প্রোগ্রাম মোতাবেক সারদা-রাজশাহী রাস্তার দু'ধারে মানুষ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন জানাবে। সাধারণ মানুষের সারির সামনে সাধারণ পোশাকে আনসাররা দু বা তিন লাইনে অবস্থান নিয়ে একইভাবে প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন জানাবে। বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাস্তার মাঝে মাঝে প্রেসিডেন্টের সম্মানে তোরণ বানান হবে।

সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু এই লিফলেটটি যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ত্বরিত পুলিশ ও ইপিয়ার-এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত টহলদারীর ব্যবস্থা করা হল। স্পেশাল ব্রাঞ্চকে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখার জন্য বলা হল। শান্তি-শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য ম্যাজিস্ট্রেটদেরও পথের মাঝে মাঝে নিয়োগ করা হল।

ভোর বেলা এসপি আর আমি সারদা গেলাম প্রেসিডেন্টকে রাজশাহী নিয়ে আসার জন্য। ভেতরে ভেতরে আমি একটা পরিকল্পনা আঁটছিলাম। সারদা পৌঁছেই সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সবার অলক্ষ্যে আমি প্রেসিডেন্টের শোবার কামরায় ঢুকে পড়লাম। ভেতরে ঢুকবার অনুমতি পেতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বললাম, 'স্যার, আপনার অভ্যর্থনার সকল ব্যবস্থাই সাধ্যমত করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সব ঠিকই থাকবে ইনশাল্লাহ্। তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা আমি আমার দায়িত্ব মনে করি?' বললাম 'কাল রাতে রাজশাহী ফিরে গিয়ে আমি এই লিফলেটটি পাই। অনুমতি পেলে আমি এটা পড়ে ইংরেজী শুনাতে পারি। প্রেসিডেন্ট অনুমতি দিলেন। বাংলাটা পড়ে তার ইংরেজী শুনিয়ে দিলাম। বললাম, এটা শোনাবার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, খোদানাখাস্তা হঠাৎ যদি কোন অঘটন ঘটেই যায় আপনি বিস্মিত হবেন না যেন। তবে আমরা সাধ্যমত দেখব যাতে প্রোগ্রামে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

দশ মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবসহ আমরা রাজশাহী রওয়ানা হলাম। পাইলট গাড়ীতে এসপি। পরের গাড়ীতে পেছনের সিটে প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর, সামনের সিটে প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারী এবং আমি। গাড়ী এগিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। মানুষজন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন জানাচ্ছে, জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে। লোকজন উল্লাস-মুখর।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসার পর আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। দূর থেকে দেখলাম ডক্টর এ আর মল্লিক রাস্তার পাশে পায়চারী করছেন আর সিগারেট টানছেন ঘন ঘন। ভালয় ভালয় ইউনিভার্সিটি এলাকা অতিক্রম করলাম। মনে মনে শুকরিয়া আদায়

www.pathagar.com

করলাম আল্লাহ্ পাকের এবং ডঃ মল্লিকের টি কিউ এ তমঘা পাওয়াটাও নিশ্চিত হল।

আমাদের গাড়ী সরকারী কলেজ হোস্টেলের সামনে পৌঁছার পর ছোট্ট একটা অঘটন ঘটল। আমি গাড়ীতে বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম পাশের বাড়ীর ছাদে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা বড় ইট এসে রাস্তার মাঝখানে পড়ল। গাড়ী থামাতে বললাম। লক্ষ্য করলাম, দূর থেকে একটা ছেলে ছুটে আমাদের গাড়ীর দিকে আসছে। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, এই বুঝি সিকিউরিটির দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের গুলি ছেলেটার দেহ ঝাঝরা করে ফেলে। কিন্তু আল্লাহ্র মেহেরবানিতে সে রকম কিছু হল না। ছেলেটি হাফাতে হাফাতে এসে আমাকে বলল, 'স্যার, এই ইট হোস্টেলের ভেতর থেকে ছোঁড়া হয়েছে–এ কথাটাই আমি বলতে এসেছি।' আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, 'ভীষণ বোকামী করেছ। এখনই গুলি খেয়ে মরতে। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছ। ভাগ এখান থেকে।'

দু'পাশের সাধারণ পোশাকের আনসারদের দিকে তাকাতেই তারা তাদের পেছনের জনতাকে আস্তে কিন্তু দৃঢ়ভাবে পেছনে ঠেলে নিয়ে গেল। আমি গাড়ীতে ফিরে এসে ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে বললাম। প্রেসিডেন্ট শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কি চায়? বললাম, 'স্যার, ওরা কি চায় সেটাও আমরা সবাই জানি। তবে এখানে ওদের সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি; আপনাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে আমি সব জানতে পারব।' গভর্নর বললেন, 'এরা এল কোথা থেকে?' জবাবে বললাম, 'সম্ভবত ময়মনসিংহ থেকে।' কথাটা হঠাৎ করেই বলে ফেললাম। তৎক্ষণাত মনে হল কথাটা এভাবে বলা ঠিক হল না।

আর কোন অঘটন ছাড়াই সমাবেশ প্যান্ডেলে পৌঁছা গেল। আমি আমার ব্যস্ততা সেরে এসপিকে খুঁজছিলাম। তাঁকে পেলাম কাহিল অবস্থায়। চিফ সেক্রেটারী এবং পুলিশের আইজি তাঁকে ভীষণভাবে বকাবকি করছিলেন। কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন, এবার যেন প্রেসিডেন্টকে ভিন্ন রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই ভাল ঠেকল না। আমার কাজে সুস্পষ্ট ইন্টারফেয়ার। আইজিকে লক্ষ্য করে বললাম, 'মিস্টার কবির, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি এই জেলার ডিসি। এসপি আমার নির্দেশে কাজ করবেন, আপনার নির্দেশে নয়। আর প্রেসিডেন্ট কোন্ রাস্তায় ফিরবেন সেটা আমি নির্ধারণ করব, আপনি নন।' আইজি সম্ভবত কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। বললেন 'আপনাকে আমরা সাহায্য করতে এসেছি এবং সেটাই করব।' আমি বললাম, 'আপনি আপনার কাজ করুন, তবে জেনে রাখবেন, প্রেসিডেন্ট ঐ একই রাস্তায় ফিরবেন এবং এটাই আমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।' তাদের উপস্থিতিতেই এসপিকে বললাম, 'সিংক উই টুগেদার অর সারভাইভ উই টুগেদার'।

www.pathagar.com

এসপিকে একান্তে নিয়ে বললাম, আধা ঘন্টার মধ্যে সরকারী কলেজ ও তার হোস্টেল খালি করে ফেলুন। আর এজন্য যতটা শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন তা করবেন। এটা আমার নির্দেশ। আর রাস্তার দু'পাশে যে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরা যাতে চলে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

এদিকে ইপিআর কমান্ডার রটাচ্ছিল যে ডিসি-এসপি আগে থেকেই সব কিছু জানত। আর সব জেনে-শুনেও প্রেসিডেন্টকে মারবার ফন্দি করেছিল। এই রটনার সাথে যোগ হল আর্মি গোয়েন্দারা।

এরকম একটা বৈরী অবস্থার মধ্যে মাথা ঠিক রেখে কাজ করার নীতিতে অটল রইলাম। আধা ঘন্টা উতরে যাবার পরও এসপি ফিরে না আসায় দুশ্চিন্তা বাড়ল। এদিকে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শেষ। এবার তিনি মৌলিক গণতন্ত্রীদের সাথে হাত মেলাবেন এবং একত্রে চা খাবেন। হঠাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্ণিত লোকটিকে ভীড়ের মধ্যে আবিষ্কার করলাম। এ আর কেউ নয়, রাজশাহী রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি। লোকটা যাতে কোন উৎপাত করতে না পারে সে জন্য একটা মতলব আঁটলাম। বাবুর্চিখানা থেকে প্যান্ডেল পর্যন্ত খাবার-দাবার বয়ে আনার দায়িত্ব দেয়া হল তাকে। সে যাতে এই নির্ধারিত সীমার বাইরে যেতে না পারে সে জন্য একজন এডিএমকে গোপনে তার উপর নিয়োগ করলাম। সিআইডি পুলিশেরও একটি লোক তার পেছনে লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ইতিমধ্যে এসপি সাহেবও পৌঁছে গেছেন। সব ঠিকঠাক মত সম্পন্ন হয়েছে। তিনি ইউনিভার্সিটি এলাকাও ঘুরে এসেছেন। গোলমালের কিছুমাত্র আশংকা নেই।

এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট গাড়ীতে বসে পড়েছেন সারদা ফিরে যাবার জন্য। ফেরার সময় আমি আর প্রেসিডেন্টের গাড়ীতে বসলাম না। আমি অন্য একটা গাড়ীতে কয়েকজন পুলিশ সাথে নিয়ে বসলাম। সম্পূর্ণ নিরাপদে আমরা সারদা ফিরে এলাম।

নিরাপদে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম বটে কিন্তু প্রেসিডেন্টের গাড়ীর সম্মুখে ইট নিক্ষেপের ঘটনা আমার মনে তখনও তোলপাড় সৃষ্টি করে রেখেছে। এই ব্যর্থতা আমি সহজে মেনে নিতে পারছিলাম না। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার, কিন্তু কিভাবে তা হবে, তাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ প্রেসিডেন্ট আমাকে ইশরায় ডাকলেন। বললেন, নাজির, জুম'আর নামাজ পড়তে যাব। বললাম, স্যার এখনি ব্যবস্থা করছি। এসপিকে পাঠালাম পুলিশ লাইনের বাইরে একটা মসজিদের খোঁজ-খবর নিতে।

ফের প্রেসিডেন্টের কাছে চলে এলাম। ভাবলাম, প্রেসিডেন্টের কাছে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারলে ভাল হত। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। আইয়ুব খান আমাকে বললেন, 'চল

www.pathagar.com

নদীর পাড়টা ঘুরে আসা যাক। ওখানে গিয়ে হিন্দুস্তানের দিকে ইশারা করে বললেন, ১৯৪৮ সালে ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছিল। আমি নদীর এপারে চরের ওপর অনেকগুলো গরুর গাড়ী সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে সিপাইদের হুকুম দিয়েছিলাম গাড়ীগুলোর একপ্রান্তে চাপ দিয়ে ওঠাতে-নামাতে। কিছুক্ষণ এরকম করার পর ভীতু শত্রুরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কথা শেষ করেই আইয়ুব খান অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। আমি তাঁর সাথে হাসিতে যোগ দিলাম। হাসি থামার পর চরে শিকারের কথা বলতে লাগলেন। প্রেসিডেন্টের খোলামেলা ব্যবহার আমার দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর করে দিল।

জুম'আর পর খানাদানা হল, কিন্তু আমার মাথার ব্যথাটা গেল না। কিছুতেই যেন সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আর পরিবেশটাও কেন যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছিল না। আমার বসরা সবাই গম্ভীর। ইট নিক্ষেপের সেই ঘটনার পর থেকে এই অবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

বিকেলে মরিয়া হয়ে উঠলাম। খোলা ময়দানে প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান করছেন আর তাঁকে ঘিরে আছেন সব হোমরা-চোমরারা। আমি এক পা এক পা করে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। একেবারে প্রেসিডেন্টের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। পেছন থেকে চিফ সেক্রেটারী আনওয়ারুল হক কোট ধরে টানছেন আর চাপা গলায় বলছেন, 'এই নাজির', 'এই নাজির।' আর অন্যদিকে স্বরাষ্ট সচিব আলী হাসান সম্মুখ থেকে আমাকে ঠেলছিলেন। আমি এই সব উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্টকে বললাম, 'স্যার। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'হা, নাজির, বলো কিয়া বাত হ্যায়?' আমি প্রেসিডেন্টের সম্মতি পেয়ে দারুণ উৎসাহ বোধ করলাম। বললাম, 'স্যার, সকালের সেই ইট মারার ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আসলে ঐ ইট আমাদের মোটর শোভা যাত্রাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়নি। আমাদের গাড়ী ঐ জায়গায় পৌছার একটু আগে হোস্টেলের প্রাচীরের ভেতরের একটা গাছের ডালে কেউ একটা কাল পতাকা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। এদিকে রাস্তায় দন্ডায়মান হাজার হাজার মানুষ কাল পতাকা দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অনেকেই প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে গাছের ডাল থেকে সেই কাল পতাকা নামিয়ে ফেলে। উপস্থিত ছাত্রদেরও তারা পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ছাত্ররা দূর থেকে দন্ডায়মান জনতার উদ্দেশে ইট নিক্ষেপ করে। ঘটনাক্রমে ঐ সময় আমাদের গাড়ী সেখানে এসে পড়ে।'

প্রেসিডেন্ট সহাস্যে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ঠিক বলেছ নাজির, আমাদের গাড়ীকে লক্ষ্য করে কেউ ইট ছোঁড়েনি। কারণ দীর্ঘ তের মাইল রাস্তার দু'পাশে যেভাবে অসংখ্য মানুষ এসে আমাকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন এটা অন্য কিছু হতে পারে না।' প্রেসিডেন্টের কথায় আমি ভীষণ আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে গেল। আমি আবেগের আতিশয্যে বলে

www.pathagar.com

ফেললাম, 'আমি তো স্যার আপনাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। এ কথাটা না বললেও পারতাম। তবে এর ফলে আমার বসরা একেবারে চুপ মেরে গেলেন।

আইজি সবার আগে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। এরপর ইপিআর প্রধান। সবশেষে একজন ঊর্ধ্বতন মিলিটারী অফিসার উষ্ণ মোবারকবাদ জানালেন। অন্যরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দু-একজন একটু বাড়তি অনুকম্পা দেখালেন- নাজিরের ওপর দারুণ ঝামেলা যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও সবকিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন করে যাচ্ছে-এটাই আনন্দের কথা।

আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'যদি কিছু সাফল্য আমরা অর্জন করে থাকি তবে এটা এসপি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার ও কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টারই ফল।'

সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপালের পরিকল্পনাটা শেষতক ভেস্তে গেল। তিনি জাল দিয়ে কতগুলো পাখী ধরে চরে কিছু ছোট ছোট কাঠি পুঁতে তাতে বেঁধে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্যে ছিল প্রেসিডেন্ট এগুলো শিকার করবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মৃদু হেসে বললেন, 'আইয়ুব খান উড়ন্ত মুক্ত পাখী শিকার করে, জালে-ধরা বন্দী পাখী নয়।'

পরদিন সারদা রেলওয়ে স্টেশনে প্রেসিডেন্টকে যথারীতি বিদায় জানান হল। আমরা সবাই স্টেশনে। গাড়ী ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে। আমি প্লাটফরমে অনেকটা একাই দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ এক অদ্ভূত ঘটনা ঘটল। প্রেসিডেন্ট তাঁর কামরা থেকে নেমে সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর সস্নেহে আমার হাত ধরে বললেন, 'তুমি ঘাবড়ে যাওনি ত নাজির? আমি কলেজের সম্মুখে ইট নিক্ষেপের ঘটনায় মোটেই অবাক হইনি। কারণ তুমি ত আমাকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়েছিলে। আমি আবার তোমার এখানে আসব, সমাবর্তন উৎসবে।' প্রেসিডেন্টের আন্তরিকতায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল।

প্রেসিডেন্টের বিদায়ের পর ঐ ইট নিক্ষেপের প্রকৃত ঘটনা উদ্ধারে সমর্থ হই। আমরা আগের রাতে কলেজের প্রিন্সিপাল আবদুল হাই সাহেবের সাথে কথা বলি। তিনি আমাদের তাঁর পক্ষ থেকে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেন। কিন্তু আমরা চলে আসার পর হোস্টেলের ছাত্ররা প্রিন্সিপালের বাসায় টেলিফোনের তার কেটে দেয় এবং অন্যান্য টেলিফোন-সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মোমেনশাহী থেকে আগত তিন-চারজন ছাত্র হোস্টেলের ছাত্রদের উত্তেজিত করতে সমর্থ হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা কাল প্রেসিডেন্টকে কাল পতাকা দেখাবে। তাদের দাবী আদায়ের জন্যও তারা বিক্ষোভ করবে। তাদের অন্যতম প্রধান দাবী ছিল গভর্নর মোনেম খানের অপসারণ। রাজশাহীস্থ ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন এর পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি

www.pathagar.com

তদন্তে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন থেকে বিক্ষোভকারী ছাত্ররা প্রচুর অর্থের যোগান পেয়েছিল।

প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা থেকে ডিসির বাসার দূরত্ব পাঁচ মিনিটেরও নয়। টেলিফোনের তার কাটার মত গুরুতর ঘটনার পরও প্রিন্সিপাল সাহেব আমাদের কারও সাথে যোগাযোগ করেননি। অথচ তিনি সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাই ঠিক করতে পারেন নি তাঁর কি করা উচিত।

যাই হোক, প্রেসিডেন্টের সাথে আমি বিষয়টি নিয়ে সরাসরি আলাপের ফলে এবং প্রেসিডেন্টের মনে কোন ক্ষোভ না থাকায় বিষয়টির ওখানেই ইতি ঘটে। এ ব্যাপারে পরে আমাকে আর কারও কাছে কোন রকম কৈফিয়ত দিতে হয়নি। কোন লিখিত ব্যাখ্যাও না। যদি প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি কথা না বলতাম তাহলে এ ঘটনা আমার চাকরি জীবনে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাকির হোসেনের সফরের কথা আগেই আমার বলা উচিত ছিল। যদিও সেটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবে সিভিল সার্ভিসের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশী দায়ী তাঁর কিছু উক্তি এখানে উল্লেখ না করলে বেমানান ঠেকবে।

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র চালু হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেজন্য সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন এবং নতুন শাসনতন্ত্রের আইডিয়াগুলো বিভিন্ন এলাকার সরকারী কর্মচারী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে 'সেল' করে যাচ্ছেন। বলে রাখি, সরকারী কর্মকর্তাদের কনফারেন্সে প্রেসিডেন্ট সব সময় আমাদের সম্পর্কে বলেছেন-'ইউ আর দ্য ন্যাচারাল লিভারস অব দ্য পিপল'। সেই সূত্রে আমাদের বিশেষ মর্যাদা দেবার কথা।

জাকির হোসেন সাহেব রাজশাহী এলেন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আর সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হয়ে নতুন শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করলেন। তিনি সবাইকে অনুরোধ করলেন, 'এ কথাগুলো যেন সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়।'

জাকির সাহেবের সফরের সময় তাঁর এবং সরকারের বিরুদ্ধে কিছু হাতে-লেখা পোস্টার শহরের দেয়ালগুলোতে লাগান হয়। ভোর বেলা এসবির লোকেরা কিছু পোস্টার তুলে এনে এসপিকে দেয় এবং পরে এসপি আমাকে দেন। আমি সেগুলো মন্ত্রীকে দেওয়ার জন্য মনস্থির করি, যাতে তিনি বুঝতে পারেন তাঁর সফরের সময় বিরোধীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

জাকির সাহেবের বিদায় বেলা এসপি আর আমি তাঁর ট্রেনের কামরায় কথা বলছি। হঠাৎ তিনি একটা বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করলেন। তিনি জানতেন আমি একজন

www.pathagar.com

সিএসপি অফিসার। কিন্তু আমার সামনেই এসপিকে হেসে হেসে বলতে লাগলেন, সিএসপি ছোকরাদের এবার বারটা বাজিয়ে দিয়েছি। এখন থেকে আর ওরা তোমাদের বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্ট লিখতে পারবে না। এখন আর তোমাদের সেক্রেটারী হতে বাধা নেই। ওই বেটাদের মনপলি আর থাকছে না।

জাকির হোসেন সাহেব যে ভাষা ও ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তা আমার একদম পছন্দ হয়নি। যেই হোন, সৌজন্য বোধ না থাকলে মুশকিল। যাই হোক, আমি কিছু না বলে হাতের পোস্টারগুলো বিদায়ী স্মৃতি হিসেবে তাঁকে প্রেজেন্ট করে চলে এলাম।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম পক্ষে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের কিছু সংখ্যক ছাত্র আমার সাথে দেখা করতে এল। উদ্দেশ্য আসন্ন একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে চাঁদা এবং অন্যান্য সহযোগিতা আদায় করা। এদিকে এ উপলক্ষে আগেই আমার কাছে সরকারী নির্দেশ এসে পৌঁছেছে। সরকার এ বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করতে চান। কিন্তু আমি ওদের সরকারী সিদ্ধান্ত জানান সমীচীন মনে করলাম না।

ছাত্র প্রতিনিধি দলের কাছে জানতে চাইলাম ওদের কলেজে ছাত্র সংসদ আছে কিনা। ওরা বলল, অবশ্যই আছে। দু'জন ছেলে ভিপি ও জিএস হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিল। আমি বললাম, ভিপি ত আছে, ঠিক আছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট কোথায়? ওরা বলল প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে প্রিন্সিপাল সাহেব। তবে কলেজের প্রশাসন চালান এডমিনিসট্রেটর কর্নেল বোরহান উদ্দিন সাহেব। বললাম, তাঁকে নিয়ে তোমরা বিকেলে আমার বাংলোয় এস, ওখানে নিরিবিলি তোমাদের সাথে কথা বলা যাবে। ওরা খুশী মনে চলে গেল।

ওরা চলে যাবার পর ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। সরকারী নির্দেশ ও ছাত্রদের আবেগের দিকে খেয়াল রেখে গ্রহণযোগ্য একটা ফর্মুলা বের করতে হবে। হঠাৎ একটা মশহুর গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। লাহোরে সিভিল্ সার্ভিস একাডেমীতে ট্রেনিং-এর সময় এই মজার গল্পটি শুনি।

গল্পটা আইসিএস অফিসার এন এম খান সম্পর্কে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানেও যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এসডিও, চট্টগ্রামের ডিএম, ঢাকার প্রথম রিলিফ কমিশনার এবং চিফ সেক্রেটারীর দায়িত্ব তিনি আনজাম দেন। তিনি এক সময় পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর জেলার ডিসি ছিলেন। মহররম মাসে তাজিয়া মিছিল নিয়ে সুন্নি ও শিয়া মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ বাধল। সুন্নিরা তাদের মসজিদের কাছের কোন রাস্তা দিয়ে মিছিল যেতে দেবে না। আর শিয়ারা মিছিল বের করবেই এবং প্রধান সড়কও প্রদক্ষিণ করবে।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট দিনে শিয়া মুসলিমদের মিছিল বেরুল। ডিসি সাহেবকে মিছিলের অগ্রভাগে দেখা গেল। স্বাভাবিক কারণেই শিয়ারা ভীষণ খুশী। ডিসি সাহেবকে মিছিলে পেয়ে তাদের উৎসাহও বহুগুণ বেড়ে গেল। বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে মিছিল যখন বিরোধপূর্ণ এলাকায় ঢুকবে তখন ডিসি সাহেব সবাইকে থামতে বললেন। মিছিলের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত লোকদের তিনি শরবত খাওয়াবেন। আগে থেকেই আয়োজন করে রাখা হয়েছিল। সবাই খুশী মনে ডিসি সাহেবের শরবত খেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরবতের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সবাই ল্যাট্রিন খুঁজতে লাগল। ফলে মিছিল জনশূন্য হতে সময় লাগল না। ডিসি সাহেব ও তাঁর লোকরা যারা শরবত পান করেননি, তাজিয়া কাঁধে কারবালায় নিয়ে গেলেন এবং প্রথা অনুসারে যা যা করা দরকার পরম নিষ্ঠার সাথে সে সব করলেন।

জোলাপ মিশ্রিত শরবত পান করিয়ে এন এম খান সাহেব একটা অনিবার্য সংঘর্ষ থেকে শহরের মানুষকে রক্ষা করলেন। এটা আমার কাছে একটা অনুপ্রেরণাদানকারী গল্প। অনেক সময় বুদ্ধি খাটিয়ে রক্তপাত এড়ান যায় কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করনেওয়ালারাতো আর রাতে শরবত খাবে না। তারা তো তুলসী পাতায় ফুল চন্দন দেবে খালি পায়ে আঁধার রাতে নারী-পুরুষ যৌথভাবে।

দুপুরে বাসায় খেতে গিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে একটা পরিকল্পনা করে ফেললাম মনে মনে। এটা এমন এক ফর্মুলা যাতে সরকারও বেজার না হয় আর এদের অনুভূতিতে আঘাতও না লাগে।

নির্ধারিত সময়ে ছাত্রদের নিয়ে কর্নেল বোরহানউদ্দিন সাহেব আমার বাংলোয় এলেন। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে আমাদের কি করা উচিত? তিনি বিনীতভাবে জবাব দিলেন, আপনি যা নির্ধারণ করবেন আমরা সেই মত করতে চেষ্টা করব। এবার ভিপি-জিএসকে বললাম, 'তোমাদের কি মত? তোমরা কিভাবে দিনটি উদ্‌যাপন করতে চাও?' ওরা একটি মুদ্রিত কর্মসূচী আমার হাতে দিয়ে বলল, 'স্যার, আমাদের প্রোগ্রাম আগেই তৈরী হয়ে আছে।' দেখলাম খুবই মূল্যবান কাগজে সুন্দর ডিজাইন করে কর্মসূচী ছাপান হয়েছে। আমি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললাম, 'যদি সব আগেই তৈরী হয়ে থাকে তবে আমরা অহেতুক এখানে সময় নষ্ট করছি। ভিপি-জিএসকে বললাম, 'যে সূত্র থেকে তোমরা এত ব্যয়বহুল কর্মসূচী ছেপেছ সেই সূত্র থেকেই বাকী কাজটাও সেরে ফেল। আমার বা কর্নেল সাহেবের এ ক্ষেত্রে কি করার আছে?'

ছেলেরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেল। আমি বললাম, 'এত সুন্দর প্রোগ্রামটা নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে ছাপিয়ে এনেছ তোমরা। রাজশাহীতে এত উন্নতমানের প্রেস আছে বলে তো আমার জানা নেই।' এতে ওদের টেনশন আরো বেড়ে গেল। ওদের একজন

www.pathagar.com

মরিয়া হয়ে বলল, 'স্যার, আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তোমরা বলতে পার '৫২ সালে যাঁরা শহীদ হয়েছিল তাদের নাম কি?' ওরা অবাক হয়ে বলল, 'কেন, সালাম, বরকত, জব্বার। আমি বললাম, ঠিক বলেছ। এরা কোন্ ধর্মের লোক ছিল? উত্তর এল, 'মুসলমান।' বললাম 'আমরা কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী।? ইসলামে নয়কি?' একজন উত্তর দিল, 'না স্যার, দু'চারজন অন্য ধর্মের লোকও আছে।' বললাম, মেজরিটি কি ইসলামে বিশ্বাসী নয়?' ওরা মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক জবাব দিল। বললাম, 'যারা শহীদ হয়েছে তারা মুসলমান এবং যারা তাদের স্মরণে দিনটি উদ্‌যাপন করছে তাদেরও অধিকাংশ মুসলমান; অনুষ্ঠানাদি তবে অমুসলমানি কায়দায় হয় কিভাবে, সেটা আমি বুঝতে পারি না। আমি তো ভাই মুসলমানের সন্তান। আমার বৃদ্ধ আব্বাজানও আমার সাথে থাকেন। তিনি যদি অমুসলিমদের মত কোন কাজ আমাকে করতে দেখেন তবে সোজা আমার বাড়ী থেকে চলে যাবেন। তাঁর আরও ছেলে আছে তাদের কাছে গিয়ে ওঠবেন। অথচ আমি তাঁর ছোট ছেলে বলে তিনি নিতান্ত অনুগ্রহ করেই আমার কাছে থাকেন। এখন তোমাদের কথা মত প্রোগ্রাম করতে গেলে পিতার ক্রোধের শিকার হব। এটা কি আমার পক্ষে শোভনীয় হবে? তাছাড়া আমার বিশ্বাস্, আমার আব্বার মত তোমাদের পিতা–মাতারাও বিধর্মীদের অনুকরণে কোন কিছু করলে তা পছন্দ করবেন না, করতে পারেন না।'

ছেলেরা সব চুপ। কেউ কিছু বলছে না। কর্নেল সাহেব এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ডিসি সাহেব, দয়া করে আপনি একটি অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করে দিন–ছেলেরা সেটা ফলো করবে এবং সেই সাথে আমিও।' আমি বললাম, 'ভাল কথা। আমি নিজে কিছু কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ঐ দিন নফল রোজা রাখব। ফজরের পর কোরআন তেলাওয়াত করব। আসরের পর হবে মিলাদ মাহফিল এবং মাগরেবের পর তবারুক বিতরণ করব। দেখুন আপনারা এই প্রোগ্রামের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন কিনা।' ছেলেরা ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। কর্নেল সাহেব জোশের সাথে বলে উঠলেন, 'ফার্স্ট ক্লাস। এর চেয়ে সুন্দর প্রোগ্রাম আর কি হতে পারে। তা হলে এই হবে আমাদের প্রোগ্রাম।' আমি বললাম, 'আমার মনে হয়, আপনার চূড়ান্ত কিছু বলার আগে আপনার ক্যাবিনেটের সাথে আপনার পরামর্শ দরকার। আমি আধা ঘন্টার জন্য আমার চেম্বারে যাচ্ছি। আপনারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সেরে নিন। আমার কথায় ছেলেরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কর্নেল সাহেবের ত্বরিত সিদ্ধান্ত ঘোষণায় ওরা একটু বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল।

আধা ঘন্টা পর আমি ফিরে আসলাম। কর্নেল সাহেবকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বুঝলাম, যত সহজে তিনি আমার প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছিলেন তত সহজে তিনি তা

www.pathagar.com

ছেলেদের মানাতে পারেন নি। যাই হোক, আমি আসন গ্রহণের পর কর্নেল সাহেব বললেন, 'একটা সমস্যার কথা ছেলেরা বলছে এবং সমস্যাটা রিয়ালি জেনুইন আর তা হল অমুসলিম ছেলেরা কিভাবে এই প্রোগ্রামে শামিল হবে?

আমি বললাম 'এটা মোটেই কোন সমস্যা নয়। আমরা যেমন আমাদের ধর্ম বিশ্বাস মতে মৃতদের আত্মার শান্তির জন্য কাজ করব তারাও তাদের ধর্ম বিশ্বাস মোতাবেক কাজ করবে। আমরা সে জন্য ওদের আলাদা রুমের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু অমুসলিমদের বাহানা করে আমরা আমাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে পৌত্তলিক পন্থায় এই দিনটি উদ্‌যাপন করতে পারি না। যদি আমরা এ রকম হঠকারি কিছু করি তাতে আমাদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সর্বোপরি যাদের জন্য এত কিছু করা তাদের আত্মা কষ্ট পাবে। হঠাৎ একটি ছেলে সলজ্জভাবে জানতে চাইল, 'যারা কোরআন পড়তে পারে না তারা কি করবে? আমি নরম কণ্ঠে বললাম, 'এটাও কোন সমস্যা নয়। যে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে না সে সুরা এখলাস বা কোরআনের যে কোন আয়াত বা সুরা মুখস্ত আছে, তাই পড়বে।'

আল্লাহ্‌তালাকে শুকরিয়া, শেষ পর্যন্ত ছেলেরা আমার প্রোগ্রামই গ্রহণ করল। নির্দিষ্ট দিনে মাত্র বিশ-পঁচিশ জন মুসলমান ছাত্র কিতাব নিয়ে হাজির হল। আর অমুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল তিন। বেলা এগারটার দিকে দেখা গেল কোরআন তেলাওয়াতকারী ছাত্রের সংখ্যা কমতে কমতে পাঁচ-ছ'জনে এসে ঠেকেছে। আর অমুসলিম তিন ছাত্র অনেক আগেই পাশের রুম থেকে উধাও হয়ে গেছে।

যথা সময়ে মিলাদ হল। মিলাদে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। কলেজ এডমিনিসট্রেটর, প্রিন্সিপাল এবং আমি ছেলেদের নিয়ে ইফতার করলাম। এরপর গরিব-মিসকিনদের মধ্যে তবারুক বিতরণ করা হল। খিচুড়ি আর খাসির গোশ্‌ত। গরিব--মিসকিনদের বিদায় করে আমরা নিজেরা খেতে বসলাম।

এরপর রাজশাহী, মোমেনশাহী ও ঢাকা জেলার ডিসি ছিলাম পাঁচ বছরেরও বেশী সময়। কিন্তু এ সময়ে আর কেউ কখন একুশে ফেব্রুয়ারী পালন উপলক্ষে আমার কাছে আসেনি।

আগেই পুলিশ বাহিনীর কথা কিছু বলেছি-বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাকির হোসেন সাহেবের সফর এবং তাঁর মন্তব্য ডিসি আর এসপি সম্পর্কে। বলে রাখি, ডিসি জেলার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজকর্মের ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্ট সরকারকে পাঠাতেন। সুতরাং জেলার প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর অবস্থান ছিল সবার উপর। এই ব্যবস্থা বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর চাকরি-বাকরিসহ সকল ক্ষেত্রে দেশের লোকজন ভর্তি হবার সুযোগ

www.pathagar.com

পেয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে 'ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন'। বার্ষিক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এবং প্রাদেশিক চাকরির ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে 'প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন'। মেধা অনুসারে সফলকাম প্রার্থীদের প্রথম ক'জনকে নেয়া হত সিভিল সার্ভিসে, তার পরের ক'জনকে ফরেন সার্ভিসে এবং এভাবে পুলিশ সার্ভিসে, কাস্টম সার্ভিসে, রেলওয়ে ও পোস্টাল অডিট সার্ভিসে। অবশ্য সব সময় প্রার্থীদের বলে দেয়া হত তাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাতে। প্রদেশের প্রার্থীরা সবাই কৃতী ছাত্র, এতে সন্দেহ নেই। পরিক্ষার ফলাফলে যখন চাকরি নির্ধারণ হয়ে যেত-যারা প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস এবং ফরেন সার্ভিসে চাকরি পেত তাঁরা অন্যদের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হত, এটা ধরেই নেয়া যায়। তাছাড়া তাঁদের দেশ-বিদেশের ট্রেনিং এবং ট্রেনিং পদ্ধতি ইত্যাদিও অন্যদের চেয়ে উন্নততর ছিল, এটাও বাস্তব সত্য।

ষাটের দশকের দিকে শোনা গেল যে ডিসিরা পুলিশের সিসিআর লিখবেন কেন? পুলিশ বিভাগীয় ডিআইজিরা এ কাজটি করবেন। আমি ১৯৬১ সালে যখন প্রাদেশিক সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলাম তখন চিফ সেক্রেটারী হলেন পুলিশ সার্ভিসের লোক। সেক্রেটারী কাউন্সিলের এক সাপ্তাহিক মিটিং-এ তখনকার ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এক প্রস্তাব আনলেন যে প্রত্যেক জেলার এসপিদেরকে ১৪৪ ধারা জারি করার ক্ষমতা দেয়া হক। আলোচনাকালে সেক্রেটারীদের তরফ থেকে যুক্তি দেওয়া হল যে, আইজি সাহেবেরো সে ক্ষমতা ফৌজদারী আইন বিধিতে দেয়া আছে বহু যুগ থেকে। আইজি সাহেবরা কোন দিন সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন কিনা সেটা দেখা যাক। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কোন দিন সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে এ ক্ষমতাটি ব্যবহার না করার পেছনে। ধরা যাক, এসপিরা কোন স্থানে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারি করলেন। যে মুহূর্তে তিনি এ কাজটি করলেন সেই মুহূর্তে তিনি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে চলে এলেন। কারণ মহকুমা অফিসার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটও বটে। এবং ঐ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারী বিধির অধীন কার্যকলাপের খবরদারী করা দায়িত্ব পেয়ে গেলেন। এসপি জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, তিনি কি করে মহকুমা হাকিমের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন- এতে তো ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়ে যেতে পারে। ধরুন কোন জায়গায় পরিস্থিতি বিবেচনা করে এসপি সাহেব দিলেন ১৪৪ ধারা জারি করে, অন্যদিকে মহকুমা হাকিম তাঁর ক্ষমতা জাহির করে দিলেন সেই ১৪৪ ধারা উঠিয়ে, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? ঐ মহকুমা বা জেলার শাসনযন্ত্রের আবহাওয়াটা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে? যাই হোক, চিফ সেক্রেটারী সাহেব প্রস্তাবটি সে মিটিং থেকে সরিয়ে

www.pathagar.com

রাখলেন এই বলে যে পরে এটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। আমার জানা মতে সেই প্রস্তাব আর কোন দিন বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু অন্যদিকে ডিসি আর এসপির সিসি লিখছেন না। ফলে এসপি নিজেকে ডিসির আওতামুক্ত মনে করতে পারেন খুব ন্যায়সঙ্গত কারণে। লাখ কথার এক কথা হল, একটা জেলায় ডিসি ও এসপির মধ্যে পরিপূর্ণ সমঝোতা না থাকলে জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ব্যাহত হতে বাধ্য। পুলিশ প্রশাসনের বাইবেল হচ্ছে পিআরবি অর্থাৎ পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল। ডিসিরা সেটাকে খুব-একটা রপ্ত করতেন বলে মনে হয় না। তবে ডিসিরা এসপিদের যথাযথ সম্মান এবং মর্যাদা দেননি-এমন কথা শুনিনি। ব্যতিক্রম যে একেবারেই নেই, তা নয়। একবার একটা ঘটনার কথা কানে এসেছিল।

কুষ্টিয়ায় ডিসির বেডরুমে একবার চুরি হয়। চোর যাবার সময় টেবিলে একটা ছোরা গেঁথে রেখে যায়। লোকজন এ ঘটনাকে সন্দেহের চোখে দেখে। গুজব রটে যে এটা কোন পেশাদার চোরের কাজ নয়। পুলিশের লোকরা ডিসিকে সতর্ক করে দেবার জন্য এই কান্ডটি করেছিল। এব্যাপারে আমার পক্ষে কোন মন্তব্য করা কঠিন। আল্লাহ্ বেহেতর জানেন প্রকৃত ঘটনা কি?

তবে আমার কর্মজীবনে কখনও এসপি বা পুলিশের সাথে আমার সম্পর্ক তিক্ত হয়নি-একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারব। রাজশাহীতে পর পর দু'জন এসপির সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তৃতীয় জনের সঙ্গেও কয়েক মাস কাজ করেছি। তাঁদের কাছ থেকে সব সময় ভাল আচরণই পেয়েছি এবং আমি নিজেও সব সময় সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থেকেছি।

সরকার থেকে প্রাপ্ত কোড মেসেজ (অতি গোপনীয় বার্তা) অনেক ডিসি নিজেরা ডিকোড না করে এসপি সাহেবদের দিয়েই তা ডিকোড করিয়ে নিতেন। এই বার্তার ভেদ ডিসি আর এসপি ছাড়া জেলার আর কেউ জানত না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ডিসিরা এসপিদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল থাকতেন। অন্যদিকে ডিসির ওপর এসপির বার্ষিক সিসি লেখার দায়িত্ব থাকায় উভয়ের সম্পর্কে একটা ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু ডিসির সেই ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় এসপির মানসিক পরিবর্তন ঘটলে, তাঁকে দোষ দেয়া যাবে না।

আমি ছিলাম নানা সমস্যা নিয়ে। সব কিছু ঠিকঠাক পরিচালনার জন্য পুলিশের সহযোগিতা ছিল একান্ত প্রয়োজন। তাই আমি বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে মনযোগী হলাম। পিআরবির ধারা-উপধারাগুলো নতুন করে আর একবার ঝালাই করে নিলাম।

'কোড মেসেজ' আমি নিজেই হ্যান্ডল করতাম। কমিশনার সাহেব এ বিষয়ে আমার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। একদিন অনেক ভেবে-চিন্তে এসপিকে বললাম, 'প্রতি

www.pathagar.com

মঙ্গলবার যে সাপ্তাহিক প্যারেড হয় পুলিশ লাইনে আমি সেখানে হাজির থাকতে চাই।' এসপি বললেন, 'খুব ভাল কথা। তবে প্যারেড হয় ভোর পাঁচটায়, আপনার অসুবিধা হবে না তো?' বললাম, 'একদম না। আমাকে ঠিক সময় মত উপস্থিত দেখতে পাবেন।'

মঙ্গলবার ভোরে যথা সময়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে হাজির হলাম। প্যারেড এটেনশনে এল। ডায়াসে আমি দাঁড়িয়েছি, এসপিও পাশে আছেন। সালামীর আগেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসপির কাছ থেকে কতগুলো তথ্য জানতে চাইলাম। যেমন প্যারেডে হাজিরার সংখ্যা কত, রুগ্ন ক'জন, গার্ড ডিউটিতে এখন যারা আছে তাদের সংখ্যা কত ইত্যাদি। এসপি সাহেব অবাক হলেন, কিঞ্চিত বিব্রত বোধ করলেন এবং অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এসব তিনি লিখিতভাবে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। বললাম, 'এসব তথ্য আমার এ জন্য দরকার যে, আমি জেলা সদরে আমার ফোর্সের শক্তি যাচাই করতে চাই। এসপি সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, এখন থেকে তিনি নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে আমাকে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দেবেন।'

প্যারেডকে সম্বোধন করলাম এভাবে– 'আমার এসপি এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ...।' অন্যদিকে এসপি সাহেব মাসে একবার মহকুমা পুলিশ অফিসার ও এসডিওদের নিয়ে কনফারেন্স করেন এবং তাতে ডিসি উপস্থিত থাকেন, সভাপতিত্ব করেন। এ সব কনফারেন্সে জেলার সার্বিক আইন–শৃংখলা পরিস্থিতি, কোর্টে কেসের হালহকিকত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত।

এমনি এক কনফারেন্সে একদিন সভাপতির ভাষণে বললাম, উপস্থিত সকল পুলিশ অফিসার কাল বিকেলে আমার বাংলোয় চা খাবেন। লক্ষ্য করলাম, উপস্থিত সবাই যেন চমকে উঠলেন আমার এ প্রস্তাবে। ডিসি নাকি পুলিশ অফিসারদের নিজ বাংলোয় টি পার্টি দেবেন!

নিজের অফিসে ফিরে একজন সিএ (গোপনবিষয়ক সহকারী) কে ডেকে বললাম বাজার থেকে সাদা কার্ড কিনে তাতে আমার পক্ষ থেকে কাল বিকেলে আমার বাংলোয় অনুষ্ঠিতব্য টি পার্টির দাওয়াত প্রত্যেক ওসি, এসডিও এবং এসপি সাহেবকে দিতে। সেই সাথে এসপি সাহেবকে অনুরোধ করা হোক যে, চা পানের সময় পুলিশ ব্যান্ড যেন বাদ্য পরিবেশন করে। এ সময় এডিসি (সাধারণ) এসে বললেন, 'স্যার, ওসিদের কার্ড পাঠানর দরকার নেই। এমনিতেই ওরা দারুণ খুশী।' আমি বললাম, 'না, কার্ড পাঠাতে হবে। আমি চাই, এই দাওয়াতের একটা লিখিত রেকর্ড থাক। ওরা কার্ড পেলে বন্ধু–বান্ধব ও ছেলে–মেয়েদের দেখিয়ে কিছুটা আনন্দ পাবে, গৌরব করবে।"

এই টি পার্টি আসলেই খুব মামুলি ঘটনা। কিন্তু এই সামান্য কাজও যে কত বড় ফায়দা দিতে পারে, আমি আমার কার্যকালে তা উপলব্ধি করেছি।

www.pathagar.com

এরপর চালু করলাম ডিসির পুরস্কার। সবচেয়ে ভাল ওসিকে এ পুরস্কার দেয়া হত। বিভিন্ন সময়ে থানা পরিদর্শনে যেতাম, ওসির রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম এবং এদের মধ্যে যার পারফরমেন্স সবচেয়ে ভাল তার পক্ষে সুপারিশ করতাম পুরস্কার দেয়ার জন্য। পুরস্কার ছিল নগদ টাকা এবং সে টাকার পরিমাণও খুব বেশী ছিল না। তবে পুরস্কার পুরস্কারই।

এর সুফল যেটা ছিল তা এই যে পুরস্কারপ্রাপ্তি প্রমোশনের সহায়ক বলে বিবেচিত হত। সুতরাং পুরস্কার লাভের জন্য সবাই তৎপর থাকত এবং ভাল পারফরমেন্সের প্রতিযোগিতা চলত। পুরস্কার লাভ যেহেতু ডিসির ওপর নির্ভরশীর ছিল, তাই ওসিরা ডিসির নেক-নজর কাড়বার চেষ্টা করত। ফলে কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে এসপির আগে আমি খবর পেয়ে যেতাম। এসপি সাহেব ব্যাপারটা বুঝতেন এবং মাঝে-মধ্যে বিব্রতও বোধ করতেন। কিন্তু তাঁর কিছুই করার ছিল না। এ সবই ছিল ঐ পিআরবি অর্থাৎ পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল-এর মাহাত্ম্য। তবে আমি সব সময় খেয়াল রাখতাম যাতে এসপি মনে দুঃখ না পান।

শুধু ওসিদেরই আমি কাছে টানিনি, সাধারণ পুলিশদের এরকম একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করলাম যে, আমি তাদের পর নই, আপন লোক। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে সব সময় একজন কনস্টেবলকে নিজের সহকারী হিসাবে কাছে রাখতাম। পুলিশের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক আমাদের এসডিওদেরও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমার চেষ্টা ছিল সার্বিকভাবে জেলা প্রশাসনের একটা একক চিত্র তুলে ধরা। সে জন্য অন্যান্য দপ্তরের জেলা প্রধানদের সঙ্গে গড়ে তুলেছিলাম আন্তরিক একটা সম্পর্ক। এ সম্পর্কটা কৃত্রিম ছিল না বলে আমার চাকরি জীবনের বিশ বছরের দিকে তাকালে আত্মতৃপ্তিতে মন ভরে উঠে।

আমার ধারণা এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বুরোক্রেসি ছাড়া কোন শাসনযন্ত্র চলতে পারে না -কোন সিস্টেমই সচল থাকতে পারে না। এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তাই বুরোক্রেসিকে যত মজবুত, পরিচ্ছন্ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করা যাবে, দেশের সার্বিক অবস্থার ততই উন্নতি হবে। আজ অনেককেই দেখছি বুরোক্রেসির বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচনায় লিপ্ত। এটা এক ধরনের হঠকারিতা। ফল যা হবার তাই হচ্ছে। চারদিকে অব্যবস্থা। আসল কথা হল, যার যে কাজ তাকে সে কাজ করতে দিতে হবে এবং যথাযোগ্য মর্যাদাও তাকে দিতে হবে। কিন্তু জোর করে বা ক্ষমতার দাপটে কাউকে এমন জায়গায় বসিয়ে দিলে যার সে উপযুক্ত নয়, ফল কি দাঁড়াবে? সে লোকটা কি মর্যাদা পাবে?

সেক্রেটারিয়েটে কাজ-কর্মের একটা রুলস অব প্রসিডিওর বা কার্য পরিচালনার বিধিমালা আছে। তাতে কোন ফাইলে লেখার উপর লেখা বা ওভার রাইটিং কিংবা

www.pathagar.com

লেখার ওপর কাগজ পেস্ট করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু ভিন্ন পথে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদে বসে ফাইলে কাগজ সেঁটে লিখতেও দেখেছি। আর সেই ফাইল নিয়ে অধস্তন দপ্তরে ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেবদের বিব্রতকর অবস্থায়ও পড়তে দেখেছি।

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৪১ সালে নাটোরে কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র আগমনের কথা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাবের পরপরই নাটোরে একটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মুসলিম আসন শূন্য হয়। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পাকিস্তান ইস্যুর ওপর এই বাই ইলেকশনে লড়বে ঠিক করল। কংগ্রেসও তাদের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্লোগান দিয়ে এই ভোটযুদ্ধে নামল। উভয় দলের মহারথীরা বলতে গেলে সবাই এলেন এই ক্ষুদ্র শহর নাটোরে।

মুসলিম লীগের জনসভায় এলেন স্বয়ং কায়েদে আজম। বিশাল এক জনসভায় তিনি ভাষণ দিলেন এবং জনতার উদ্দেশে একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন, আপনারা পাকিস্তান চান? আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে উত্তর এল- 'চাই, চাই।' জনতা শান্ত হলে তিনি বললেন, 'তবে মুসলিম লীগের বাক্সে আপনাদের ভোটটা দেবেন।'

মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট পড়েছিল শতকরা সাতানব্বই ভাগেরও বেশী। সারা উপমহাদেশের মধ্যে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নাটোরেই প্রথম জনমত যাচাই হয়। সুতরাং এ নির্বাচন গুরুত্ব পেয়েছিল অনেক। কেবল নেতারাই নয়, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা এসে এখানে ক্যাম্প করেছিল। প্রায় এক মাস ছিল তারা এখানে। ভলেনটিয়ারী করেছে। এর অধিনায়ক ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাই এই স্থানটির একটা গুরুত্ব রয়েছে।

নাটোর স্টেশনের প্ল্যাট ফরমের বাইরে ত্রিমুখী এক স্তম্ভ নির্মাণ করা হল রাজশাহী জেলা কাউন্সিল-এর সৌজন্যে। কারিগরি তত্ত্বাবধানে থাকলেন সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর সহকারী। স্তম্ভের শীর্ষে ক্ষোদিত হলঃ ঈমান, একতা, শৃংখলা; আর সেই সাথে জনতার উদ্দেশে কায়েদে আজম যে প্রশ্ন রেখেছিলেন তা স্তম্ভের ভিতের উপর উৎকীর্ণ হল। প্রথমে স্থির হয়েছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এর উন্মোচন করবেন। কিন্তু তাঁর ব্যস্ততার কারণে প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার মরহুম আব্দুল হামিদ চৌধুরী আইয়ুব খানের একটি বাণী পাঠ করার মাধ্যমে মিনারটি উন্মোচন করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, এটি লাহোরের মিনারে পাকিস্তান-এর আগেই নির্মিত হয়। এই তথ্যের সন্ধান পাই আমি যখন রাজশাহী এবং নাটোরে সিপাহী বিপ্লবের শহীদানদের ওপর অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম (তাঁদের কতজনকে এবং কোন্ জেলে ফাঁসি দেয়া হয়েছে) তখন। আমাদের নবীন বংশধরদের জন্য এসব ঐতিহাসিক ঘটনা জানা যে কত প্রয়োজন, সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

www.pathagar.com

একটা মজার ঘটনা বলে রাজশাহীর স্মৃতির পাতা শেষ করব। আগেই বলেছি কলকাতা যেতে হত মাঝে-মধ্যে বর্ডার কনফারেন্সে। রাজশাহীর সঙ্গে হিন্দুস্তানের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া এবং পশ্চিম দিনাজপুরের সীমান্ত। এসপি, ইপিআর কমান্ডার আর আমি চাপলাম ট্রেনে কলকাতার উদ্দেশে। রানাঘাটে ট্রেন থামলে দেখলাম স্টেশনে বেশ ভীড়। খবর নিয়ে জানলাম, রাজশাহীর জেলা অফিসারদের দেখার জন্য এই ভীড়। বুঝতে অসুবিধা হল না যে, রাজশাহীর 'দাঙ্গা'র খবর এখানে যে ভাবে অপপ্রচারের মাধ্যমে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে বলা হয়েছে, এটা তারই নতিজা।

হঠাৎ আমাদের কামরা লক্ষ্য করে ইটের টুকরো নিক্ষেপ শুরু হল। এরই একটা জানালা দিয়ে এসে আমার কামরায় পড়ল। আমি সেটি কুড়িয়ে সযত্নে পকেটে রাখলাম। এরই মধ্যে এসপি তাঁর কামরা থেকে ছুটে এলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এটা কি কান্ড, ওরা আমাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই করেনি?' আমি তাঁর এ কথার কোন জবাব না দিয়ে তাঁকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে এলাম। আমাদের দেখে ভীড় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমি পাশে দাঁড়ান একটা ছেলের সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। হঠাৎ রানাঘাটের এসডিও আর্বিভূত হলেন। ভীড় তিনিই সরালেন। আমি হেসে বললাম, 'ওত ব্যস্ত হবেন না। ভিন দেশের জেলা অফিসাররা কেমন, তাই সম্ভবত দেখতে এসেছে বেচারারা। থাক না ওরা।'

রানাঘাটের এসডিও যেন বিনয়ের অবতার। তিনি আতিথেয়তারও কোন ত্রুটি রাখেননি। সাথে করে চা-নাস্তা নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য! আমার কামরায় বসে সেগুলোর সৎকার করলাম। চা খেতে একটু সময় নিলাম। এদিকে গাড়ী ছেড়ে দিল। এসডিও সাহেব একজন আর্দালী আমাদের সেবায় রাখলেন। আমাদের চা খাওয়া শেষ হলে পরবর্তী স্টেশনে সে সামানসহ নেমে যাবে। এসডিওকে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম।

আর্দালীটি ছিল মুসলমান। ট্রেন ছাড়বার পর থেকেই সে বক বক করতে লাগল। তার মনের যত দুঃখ আর ক্ষোভ আমাদের কাছে বলতে পারলেই যেন মুহূর্তে সব সুরাহা হয়ে যাবে। এসপি সাহেব দু'-একটি কথা ওকে জিজ্ঞেস করলেন।

এই যে এত ঘটনা ঘটে গেল, এর মধ্যে ইপিআর কমান্ডারকে দেখা গেল না। পশ্চিম পাকিস্তানী ভদ্রলোক। সেই যে নিজের কামরার দরজা-জানালা বন্ধ করে তিনি নিজেকে আলাদা করে নিলেন, শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন না থামা পর্যন্ত তা অব্যাহত রইল।

শিয়ালদহ স্টেশনে নদীয়ার ডিএম এসেছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। ভদ্রলোক বয়স্ক এবং রসিক। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বেগবাগানস্থ নিজামস্ প্যালেসে। সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলে চলে যাবার পর আমরা

www.pathagar.com

ড্রাইভারদের কিছু বকশিস দিয়ে ছেড়ে দিলাম। কারণ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ওরা গোয়েন্দা বিভাগের লোক।

টিকটিকিদের বিদায় দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করলাম। সময়টা ছিল রমজান মাস। তাই খুব হিসাব করে সব করতে হল।

পরদিন সকাল ন'টায় কনফারেন্স। কামরা থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি বারান্দায় এক ভদ্রলোক আমাদের জুতা পালিশ করছে খুব মনোযোগ সহকারে। ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরী লাগল না। রস করে বললাম, 'কিহে চাকরির জন্য শেষ পর্যন্ত মুসলমানের জুতা পালিশ করতে হল।' সে বুঝতে পারল যে সে ধরা পড়ে গেছে। তাই সরল কণ্ঠে বলল, 'কি করব স্যার, চাকরি ছাড়া তো বাঁচার উপায় নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন... চাকরির মায়া বড় মায়া।' সে কথা বলছিল আর সমানে জুতা পালিশ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'থাক থাক আর দরকার নেই। আপনি পিয়নও না মুচিও না–এ কাজ আপনাকে মানায় না। টিকটিকির কাজ করতে এসে মুসলমানের জুতা পালিশ করে শেষ পর্যন্ত জাত হারাবেন। আপনি বরং একটা চেয়ার টেনে আমার কামরার বাইরে বসে আপনার কাজ করুন। আপনাকে কেউ কিছু বলবে না।

যা হোক, নির্দিষ্ট সময়ে নিচ তলার হল ঘরে পৌছলাম। চার জেলার ডিসি, এসপি আর বিএসএফ–এর কমান্ডারদের সাথে পরিচয়ের পালা। পরস্পর আমরা পরিচিত হলাম, কুশল বিনিময় করলাম। সভার কাজ শুরুর আগে মুর্শিদাবাদ জেলার ডিএমকে বললাম, 'আপনি তো আমাদের মানুষ। চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়া থেকে এসেছেন। আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ জানাব। ভদ্রলোক সাগ্রহে জানতে চাইলেন। বললাম, 'আমি এখানে আসার আগে তিন জন ভদ্রমহিলা আমার বাংলোয় এসে ভীষণ কান্নাকাটি করেন। এঁদের একজন এক উকিলের স্ত্রী আর দু'জন দু'সীমান্ত রক্ষীর স্ত্রী। তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের স্বামীরা চার মাসেরও বেশী সময় ধরে আপনাদের জেলে আটক আছেন। তাঁরা জানতে পেরেছেন যে তাঁদের স্বামীরা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। উকিল সাহেব চরে শিকার করতে গেলে বিএসএফ–এর লোকজন তাঁকে ধরে নিয়ে চলে যায়। দয়া করে অন্তত মানবিক কারণে হলেও ওদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন যাতে কাল দেশে ফিরে গিয়ে ওঁদের উৎকণ্ঠিতা স্ত্রীদের কিছু বলতে পারি। ভদ্রলোক খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'ঠিক আছে, বিকেলের মিটিং–এ ওঁদের সম্বন্ধে আপনাকে জানাব।'

আনুষ্ঠানিকভাবে সভা শুরু হল। রানাঘাট স্টেশনে আমার কামরায় নিক্ষেপিত যে ইটের টুকরোটা যত্ন করে কুড়িয়ে রেখেছিলাম তা পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখলাম। আমার এই কাণ্ড দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমি হেসে

www.pathagar.com

বললাম, 'আপনাদের দেশে প্রবেশের পর রানাঘাট রেলওয়ে স্টেশনে এধরনের জিনিস দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানান হয়।' সবাই এতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তবে ভারতীয় কর্মকর্তারা এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে ভুললেন না।

যথারীতি সভার কাজ চলতে লাগল। সব মুখস্ত কথা। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ। সমস্যা সমাধানে আরও তদন্ত প্রয়োজন ইত্যাদি।

বিকেলের সভায় আমরা একটু আগেই হাজির হলাম। ডিএম মুর্শিদাবাদ এলেন। ভদ্রলোককে অতি গম্ভীর এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বললাম, আমার লোকদের খবর কি? তিনি কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'কি খবর দেব ওঁদের সম্বন্ধে? ওরাতো দু'সপ্তাহ আগে জেল থেকে পালিয়ে দেশে চলে গেছে। এখন আমি আপনাকে অনুরোধ করব ওঁদের যেন ধরে অবিলম্বে এখানে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওঁরা প্রত্যেকেই ক্রিমিনাল এবং জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে মারাত্মক অপরাধ করেছে। এর শাস্তি ওঁদের পেতেই হবে।'

ইপিআর কমান্ডার দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'ওঁরা কেউ দেশে ফেরৎ যায়নি। ওঁরা নিশ্চয়ই এখানে আছেন।' এসপিও অবাক কণ্ঠে বললেন, 'এটা হতেই পারে না ওঁরা কেউ দেশে যাননি। আর আটক লোকেরা কি করেই বা যেতে পারেন। ' আমি বললাম, 'আপনার কথা এজন্য মানতে কষ্ট হচ্ছে, সকালে যখন এঁদের সবার লিস্ট দিয়ে এঁদের স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইলাম আপনি বললেন বিকেলের মিটিং-এ জানাবেন। আর এখন বলছেন, ওঁরা দু'সপ্তাহ আগে জেল থেকে পালিয়ে গেছেন। এই অদ্ভুত গল্প আমরা কি করে সত্য বলে মানতে পারি, আপনারাই বলুন? এটা কি সম্ভব এবং বিশ্বাসযোগ্য? দু'সপ্তাহ আগে ওঁরা জেল থেকে পালিয়ে গেলেন আর এই চাঞ্চল্যকর খবরটা আপনি জানালেন না? যাই হোক, আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না যে আপনারা একটা সহজ-সরল ব্যাপারকে অহেতুকই জটিল করতে চাচ্ছেন। তবে একটা কথা বলি, আমি লোকগুলোর স্বাস্থ্যের খবর জানতে চেয়েছি, এখনও ফেরত চাইনি।'

ডিএম মুর্শিদাবাদ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। অসহায়ের মত বললেন, "দেখুন,সবাই যখন ঘুমাচ্ছিল তখন ওরা কাঠ দিয়ে চাবি বানিয়ে পালিয়ে গেছে।' আমি রসিকতা করে বললাম, 'আপনি যা বলছেন তাতো আয়ারল্যান্ডের ডিভেলেরা গল্পের মত শোনাচ্ছে। তবে এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, ওঁদের সম্পর্কে আপনারা কিছু জানাতে নারাজ। ঠিক আছে, এখন আমরা অন্য আলোচ্য সূচীতে যেতে পারি।'

এরপর আর মিটিং জমল না। ডিএম মুর্শিদাবাদের মুড অফ হয়েই রইল। তিনি মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ফলে কোন বিষয়ে আর ফয়সালাও হল না।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে কলকাতার পত্রপত্রিকাগুলোতে ফলাও করে খবর বেরুল, 'বহরমপুর জেল ভেঙ্গে পাকিস্তানীদের পলায়ন।' খবরে এ কথারও উল্লেখ ছিল যে ডিএম মুর্শিদাবাদ এ ঘটনার কিছুই জানেন না। নানা রং চড়িয়ে খবর পরিবেশন করেছে পত্রিকাগুলো। কোন কোন পত্রিকা লিখেছে, ডিসি রাজশাহী এই পলাতকদের সাদর অভ্যর্থনা দিয়েছেন তাঁর রাজশাহীর বাংলোতে। আর এখন তিনি ডিএম বহরমপুরের কাছ থেকে পলাতকদের ফেরত চাচ্ছেন। পরদিন সকালে যথারীতি মিটিং শুরু হল। মামুলি কথাবার্তা হল কিছুক্ষণ। আমি কলকাতার কাগজগুলো সংগ্রহ করে রাখলাম।

রাজশাহী ফিরে এলাম। সব অফিসারকে নিয়ে বসলাম গল্প করতে। তাঁদের ভারতীয় কাগজগুলো দেখালাম। আমরা সবাই একমত হলাম যে, ডিএম মুর্শিদাবাদ খুব কঠিন সংকটে পড়েছেন।

এটা তাঁর সরকারকে বুঝান কঠিন হবে যে কেন তিনি দু'সপ্তাহ আগে সংঘটিত এত বড় একটা ঘটনা সম্পর্কে বেখবর রইলেন। বেচারা।

আমরা সবিস্তারে আমাদের সরকারকে এ ঘটনা জানালাম। রিপোর্টের সাথে হিন্দুস্থানী কাগজগুলোও পাঠিয়ে দিলাম।

তিন বছরের বেশী হয়ে গেছে। এবার রাজশাহী থেকে বদলির পালা। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গেছে এখানে। এখানকার পানিতে প্রচুর চুন। বলতে গেলে কিছুদিন যাবত কোন কিছুই খেয়ে হজম করা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

সকাল হলেই বুঝবে

বদলির হুকুম হল দেশের সর্ববৃহৎ জেলা মোমেনশাহীতে। নির্ধারিত দিনে রাজশাহী ছাড়লাম। সরকারী অফিসার, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর লোক এবং শহরবাসী রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হয়ে জমকালভাবে বিদায় জানাল।

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে এসপি বললেন, 'ঢাকা থেকে নির্দেশ এসেছে আপনার সঙ্গে যেন যথেষ্ট সংখ্যক সশস্ত্র দেহরক্ষী পাঠান হয়। কারণ কিছুই বলা হয়নি।' মনে হল মোমেনশাহীতে গোলমাল আছে। তবে কি সেজন্যই আমাকে সেখানে পাঠান হচ্ছে? মনে পড়ল রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য হ্যাচ বার্ণওয়েলের কথা– 'নাজির, ইউ আর এ ট্রাবল শুটার, তুমি ঝড়ঝাপটার আগে দৌড়াও।'

মনের মধ্যে এই চিন্তাটা ঢুকে রইল সারাটা রাস্তায়। রাত দু'টায় ট্রেন এসে পৌঁছল মোমেনশাহী রেলওয়ে স্টেশনে। চারদিকে অন্ধকার। অনুভব করলাম বেশ শীত পড়েছে। বিদায়ী ডিসি তাঁর তিন জন এডিসি এবং কয়েকজন এসডিওকে নিয়ে স্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। রেলওয়ে স্টেশন থেকে সার্কিট হাউজ পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন দেখলাম। ডিসির মার্সিডিজ কারটি রাতের নির্জন রাস্তায় যদিও দ্রুত চলছিল কিন্তু ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়াল না। জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি?' বিদায়ী ডিসি রসিকতা করে বলল, 'সকাল হলেই বুঝতে পারবে।' 'এখানেও রায়ট চলছে নাকি?' সিরিয়াস কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম। উত্তর এল, 'তেমন কোন চিন্তার কারণ নেই তোমার। সরকার মনে করে নাজির হচ্ছে গোলমালের দাওয়াই। কাজেই কিছু থাকলেও ওসব তোমার জন্য কিছু নয়। এখন তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। আমি ভোরে ঢাকা যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমাকে চার্জ দিয়ে আমি আমার গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে যাব।

সার্কিট হাউজের পরিবেশ দেখে মনে হল সিগারেট কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় সদাশয় ডিসি সাহেব তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সন্ধ্যা থেকেই মশগুল ছিলেন। আমাকেও সেই গভীর রাতে তাসের মজলিশে আমন্ত্রণ জানান হল। বললাম, 'তুমি হয় তো জান না নাজির এ রস থেকে বঞ্চিত।'

সকাল হল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ পাহারার ভেদ তখনো উদ্ধার করতে পারিনি। ডিসির বাংলোয় গেলাম। ডিসিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সবাইকে দেখছি কিন্তু জামালপুরের এসডিওকে দেখছি না যে?' এবার থলের বিড়াল বেরিয়ে এল। ডিসি

www.pathagar.com

বলল, 'জামালপুরে টেনশন চলছে, তাই তাঁকে আসতে নিষেধ করেছি।' মনে মনে ভাবলাম এক রাজশাহীর ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আর এক নতুন ঝামেলা। বললাম, 'জামালপুরে ফোন করতে পারি?' ডিসি বলল, 'নিশ্চয়ই পার। যে মুহূর্তে তুমি এ জেলায় পা দিয়েছ– সব দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে বর্তেছে।'

টেলিফোনে এসডিও নূরুল ইসলাম খানকে পেলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে অবস্থা জানতে চাইলাম। তিনি মোটামুটি অবস্থার একটা বয়ান দিয়ে বললেন, 'এখনো বেশ টেনশন আছে। তবে সব স্বাভাবিক করবার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে একজন বিডি চেয়ারম্যানকে শারীরিক দন্ড দিয়ে হাজতে ঢোকান হয়েছে।'

দৃঢ় কণ্ঠে এসডিওকে জানিয়ে দিলাম, 'আর কোন গোলমালের খবর আমি শুনতে রাজি নই। আজ সারাদিনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে দুষ্কৃতকারীদের উপর গুলি চালাতে হবে। আর কাল সকাল দশটার মধ্যে এখানে নিজে এসে সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ দিয়ে যাবেন। মনে রাখবেন, অবস্থার উন্নতি না হলে আমি নিজেই মহকুমার দায়িত্বভার গ্রহণ করব।'

এসডিওর কথা থেকে বুঝলাম তিনি আমার কথার মর্মবাণী ঠিকই বুঝেছেন। বিদায়ী ডিসি অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিদায়ী ডিসির কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিয়ে জানতে চাইলাম 'কান কথা' কিছু আছে নাকি? বলল, 'সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে ফিরে এসে বলব।' বললাম, 'তথাস্তু, আমার কোন তাড়া নেই।'

এখানে বলে রাখি, এই 'কান কথাটা'র মানে বিদায়ী ব্যক্তি নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মৌখিক কিছু তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আসলে হ্যান্ডিংওভার নোট রেখে যাওয়ার রেওয়াজ বৃটিশ রাজত্বের শুরু থেকেই চালু আছে। কিন্তু অনেকেই সেটা কষ্ট করে আজকাল আর লেখেন না। এই বিদায়ী ডিসি যে সে কাজ করবে না– সে আমি আগে থেকেই জানতাম। আর হলও তাই। সে বলল, 'দেখ, 'হ্যান্ডিংওভার' নোটটা লেখার সময় করে উঠতে পারিনি। তুমি একটু এদিক-ওদিক তাকালেই সব বুঝতে পারবে। তা ছাড়া আগে একবার বিলেত থেকে ট্রেনিং শেষ করে এসে তুমি এখানে ক মাস ছিলে। তবে কান কথাটা তোমাকে এখনই বলে দেই, এ জেলায় যত পলেটিশিয়ান আছে তাঁরা সবাই থানা লেভেলের রাজনীতিবিদ। সুতরাং তোমার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।' বললাম, 'এটা তো স্বয়ং লাট সাহেবের জেলা– সেদিক থেকে কোন কিছু?' ডিসি বলল, 'তিনিই তোমাকে পছন্দ করে এখানে এনেছেন। সুতরাং তোমার কোন অসুবিধা হবে না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'বর্ডারের অবস্থা?' বিদায়ী ডিসি বলল, 'ওদিক গেলেই বুঝতে পারবে।'

www.pathagar.com

ঠিক দশটায় জেলা টেজারীতে ঢুকলাম। এই টেজারী ভেরিফিকেশন অন্তত চার-পাঁচ ঘন্টার ব্যাপার। নতুন স্টেশনে দায়িত্ব নেবার পর এটাই আমাদের সর্ব প্রথম কাজ। ভেরিফিকেশনের কাজ শুরু করেছি মাত্র- এমন সময় এসপি আবদুল খালেক এসে টেজারী দরজায় এক স্যালিউট মেরে বললেন, 'ডিসি সাহেব, এখনি আপনাকে আমার সঙ্গে বর্ডারে যেতে হবে। সীমান্তের অবস্থা অশান্ত। কয়েকদিন যাবত উপজাতীয় গারোরা সীমান্তের ওপারে দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে। ওদের বাড়িঘর অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকছে। ওখানকার ল এন্ড অর্ডার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। আপনাকে এখনি যেতে হবে। ঢাকা থেকে মেসেজ এসেছে আপনাকে নিয়ে বর্ডার সফরের।' বললাম, 'এভাবে টেজারী রেখে যাব কিভাবে?' এসপি বললেন, 'স্যার, এটার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করুন। বর্ডারের অবস্থা সত্যি সত্যি খারাপ।'

আমাকে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হল। তিন জন এডিসি এবং দু'জন সদর এসডিওর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করলাম। তবে এডিসি জেনারেলকে দিলাম সর্বোচ্চ দায়িত্ব। তারপর এসপিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কোর্ট বিল্ডিং থেকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের দিকে যেতেই দেখি প্রায় চার হাজার পরিবার নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশুসহ খোলা মাঠে ও বারান্দায় অবস্থান করছে। এসপিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা সীমান্তের ওপার থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। জামালপুর ও নেত্রকোনায়ও একই অবস্থা। সেখানেও সীমান্তের ওপার থেকে বিতাড়িত লোকজন এসে এভাবে দিন কাটাচ্ছে। এক মাস যাবত এ অবস্থা চলছে।' এসপি সাহেব একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'আমি মাত্র সাত দিন আগে চট্টগ্রাম থেকে এখানে বদলি হয়ে এসে এই অবস্থা দেখছি। এখানে বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে মানুষ মরছে এবং প্রায় প্রতি দিনই নতুন নতুন চলে এসে এদের দল ভারি করছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জেলা প্রশাসন কি করছে?' এসপি বললেন, 'আমি জানি না। আমি কেবল নিরাপত্তার দিকে নজর রাখছি।'

সারাদিন পুলিশের জিপে আমরা দু'জন হালুয়াঘাট বর্ডার হয়ে একটা ব্যাপক এলাকা সফর করলাম। দেখলাম প্রায় প্রতিটি এলাকা ফাঁকা হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও কিছু মানুষ আছে। তাদের সাথে কথা বললে তারা শুধু মাথা নাড়ে, মুখে কিছু বলতে চায় না। একটা ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হলাম, এদের প্রায় সকলেরই আত্মীয়-স্বজন সীমান্তের ওপারে আছে। দু'দেশের সীমারেখা মাঝে-মধ্যে শুধু পিলারেই সীমাবদ্ধ। এরা সব সময় সীমান্তের এপার-ওপার যাতায়াত করে থাকে। কোন দেশের প্রতিই এদের কোন আনুগত্য নেই। এসব গারো বা হাজংদের আনুগত্য এদের নিজস্ব উপজাতির প্রতি। তবে এদের আনুগত্য আরো একটি জায়গায় আছে আর সেটা হল সীমান্তের উভয় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত খৃস্টান মিশনগুলোর প্রতি। এসব মিশনকে তারা

www.pathagar.com

প্রায় দেবদূতের মত মনে করে আর মিশনগুলো এদের ধর্মান্তরিত করে গির্জা-মুখী করে রেখেছে। এসব উপজাতিদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে এবং সব কিছুই গির্জার সঙ্গে যুক্ত। ফলে ফাদার যা বলবেন এরা তাই করবে। সমতল ভূমির গরীব মুসলমানদের সাথে এ সব উপজাতির ব্যবধান এই মিশনগুলো সযত্নে লালন করে চলেছে। খৃস্টান না হলে কেউ এদের স্কুল বা হাসপাতালের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল যে, ফাদার পোপ নামের এক পাদ্রি প্রতিদিন একটি দল নিয়ে ভারত যান। সীমান্তের ওপারেও তাদের স্কুল, হাসপাতাল ও গির্জা রয়েছে। আরো চকমপ্রদ তথ্য পেলাম, এমন মিশনও আছে যাদের গির্জা সীমান্তের একধারে আর হাসপাতাল, স্কুল সীমান্তের অন্যধারে। এর সহজ অর্থ আন্তর্জাতিক সীমান্তকে এসব মিশনারী কিছু মাত্র তোয়াক্কা করে না।

এদের মধ্যে আছে একটি ফরাসী মিশন। এই মিশনের এক মহিলা কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারীর নাকি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মহিলা তাঁর এই সম্পর্কের কথা উচ্চ কণ্ঠে বলে থাকেন এবং মাঝে-মধ্যে স্থানীয় অফিসারদের ধমক-টমকও দিয়ে থাকেন।

জামালপুর-নেত্রকোনার আশি মাইল সীমান্ত এলাকা চক্কর দিয়ে সন্ধ্যায় মোমেনশাহী শহরে ফিরলাম। মাথায় নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। উপজাতি সমস্যা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সর্বোপরি সীমান্তের ওপার থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা ছিন্নমূল মানুষদের মানবেতর জীবন-যাপন, এসব কিছুই আমার আশু বিবেচনার বিষয় ছিল। কিন্তু এসব সমস্যার ত্বরিত সমাধান নজরে আসছিল না। উদ্বাস্তুদের কথাই ধরা যাক। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। এসব দাঙ্গার মূল লক্ষ্য মুসলমান নির্মূল করা। ফলে দলে দলে মার খাওয়া লোকরা সীমান্ত পার হয়ে আসছিল। এরা ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পথে মোমেনশাহী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এখানে এদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কথা।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ী ডিসির যাবার পালা। বিদায়কালে সে বলল, 'রাজশাহী থেকে এখানে আসার পথে তোমাকে পুলিশ প্রহরা কেন দেয়া হয়েছিল, আশাকরি তা বুঝতে পেরেছ ইতিমধ্যে?' জবাবে বললাম, 'বুঝেছি। তবে এত কিছু না করে সামগ্রিক পরিস্থিতির একটা মুখতাসার রিপোর্ট আমাকে দিলেই কি ভাল হত না? আমি অন্তত মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারতাম নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলার।'

অবস্থাটা আরো ভাল করে বুঝবার জন্য তিন জন এডিসি ও দু'জন এসডিওকে নিয়ে বসলাম। কিন্তু তাঁরা খুব- একটা মুখ খুললেন না। আমি এখানে নতুন এসিছি

www.pathagar.com

এবং আমার সম্পর্কে এঁরা নানা কথা শুনে থাকবেন–এ জন্যই হয়ত কেউ মুখ খুলতে চাইছিলেন না।

রাতে গভর্নর মোনেম খানের ফোন এল। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, তিনি জেলার সীমান্ত সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার আশু সমাধান চান এবং সর্বোপরি জেলায় একটা সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন প্রশাসন চান– এ লক্ষ্যেই তিনি নিজে পছন্দ করে আমাকে ও এসপিকে এখানে এনেছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কখনই প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন না, তাঁর তরফ থেকে অন্যায় অনুরোধ করা হবে না এবং কেউ যদি এ রকম করে তবে আমি নির্ভয়ে, শক্ত হাতে তার মোকাবিলা করতে পারব। এসব বিষয়ে আমি তাঁর সহযোগিতা পাব এবং তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারব।

ফোন ছেড়ে আমার মোটমুটি ভাল লাগল। গভর্নরের নিজের জেলায় আসার পর মনে কিছু দ্বিধা ছিল, কথা বলার পর তা কেটে গেল। গভর্নর সাহেবের ছেলেদের এবং আত্মীয় বন্ধু–বান্ধবদের সম্পর্কে দূর থেকে মাঝে–মধ্যে কিছু কিছু কথা শুনেছি যা প্রীতিপ্রদ নয়। সে সম্পর্কেও তিনি পরিষ্কার তাঁর মতামত জানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে টেজারী ভেরিফিকেশন রিপোর্ট আনা হল আমার সই নেবার জন্য। নিজে কাজটি না করেও সই নথিভুক্ত করে মোমেনশাহীর দায়িত্বের প্রথম কাজটি সারলাম।

পরদিন জামালপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, সদর উত্তর এবং সদর দক্ষিণ–এর এসডিও এবং তিন জন এডিসিকে নিয়ে এক বৈঠকে বসলাম। বিস্তারিত আলোচনা হল জেলার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে। বিকেলে এসপিকে ডাকা হল। আমাদের প্রধান কাজ শান্তি–শৃংখলা ফিরিয়ে আনা। জামালপুরের এসডিও বললেন যে, তাঁর মহকুমায় আর কোন সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হবে না। কারণ তিনি শক্ত হাতে অবস্থার মোকাবিলা করে সুফল পেয়েছেন। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জেলে ভরা হয়েছে এবং দু'একজন চেয়ারম্যানকে শায়েস্তা করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, একজন বিডি চেয়ারম্যানকে কি গাছে লটকিয়ে পিটান হয়েছে? বেচারা এসডিও খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন আমার এই আকস্মিক প্রশ্নে। কি বললে কি হবে সেটা ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি থ হয়ে বসে রইলেন। বললাম, 'আকাশে মেঘ যতটা ডাকে ততটা কিন্তু বর্ষে না। আমাদেরও এই নীতি গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। কেবল ক্রিমিনালদেরই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। বিডি চেয়ারম্যানসহ এ–জাতীয় লোকদের শারীরিক শাস্তি নয়, তাঁদের মান–সম্মানে আঘাত আসছে এই ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করতে হবে।

নেত্রকোনার এসডিও সিএসপি রফিকুল্লাহ্ চৌধুরী বৈঠকে তাঁর মহকুমার অবস্থার একটা চমৎকার বর্ণনা দিলেন। অন্য চার জন এসডিও তাঁদের নিজ নিজ মহকুমার চিত্র

www.pathagar.com

তুলে ধরলেন। এসপি সাহেব সীমান্তের অবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করলেন। বললেন, মিশনারীদের কারণে এই সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে।

মজার কথা, সীমান্তের ওপার থেকে বিতাড়িত অসহায় মানুষদের সম্বন্ধে কেউ একটা কথাও বললেন না। অথচ এই মানুষগুলো একদিন আসামে গিয়ে জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদ করে সেখানে বস্তি স্থাপন করেছিল। আসামে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন সেই বরদোলই সরকারের সময় থেকেই বলতে গেলে চলে আসছে। নানা অজুহাতে এসব মানুষকে বিতাড়িত করাই তাদের এক মাত্র লক্ষ্য। সেই যে কবে শুরু হয়েছে 'বাঙ্গাল খেদাও' আজও তা শেষ হয়নি।

সীমান্তের অবস্থা শত চেষ্টাতেও উন্নত হচ্ছে না। উপজাতিদের সীমান্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে বোঝানর চেষ্টা হচ্ছে তারা যেন অহেতুক নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে না যায়। তারা কোন সমস্যার কথা বললে তাও সাথে সাথে সমাধান করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমরা গেলে হাত জোড় করে বলে ঠিক আছে আমরা যাব না, যারা গেছে তাদের ফিরিয়ে আনব। কিন্তু পরদিন গিয়ে দেখি গোটা পাড়াটাই ফাঁকা।

মুশকিল হল এদের ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ী কে পাহারা দেবে? এত বড় বিস্তীর্ণ এলাকায় নজরদারী করা রীতিমত দুষ্কর। দীর্ঘদিন এসব এভাবে পড়ে থাকলে সমতল এলাকার দরিদ্র মানুষদের লোভ থেকে বাঁচানো কঠিন হবে।

এ সমস্যার মূলে রয়েছে পাদ্রিরা। এদের ইশারায় উপজাতিরা সীমান্তের ওপারে যাচ্ছে, অথচ এসব নাটের গুরু পাদ্রিদের কেউ কিছু বলতে পারবে না। এটা অসহনীয়। সরকারকে জানালাম, পাদ্রিদের সংযত করা প্রয়োজন। তবেই সীমান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা যে ব্যাপারটা বোঝেন না তা নয়। কিন্তু কেউই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে চান না। তাঁরা মনে করেন এটা একটা সেনসেটিভ ইস্যু– এতে না জড়ানই ভাল। এর কারণও আছে। উপজাতিরা যেহেতু খৃষ্টান তাই পোপ রোম থেকে মাঝে–মাঝে বিবৃতি ছাড়ছেন আর সেই বিবৃতির ধাক্কায় আমাদের বিদেশ মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো অস্থির হয়ে সকাল–বিকাল গভর্নর সাহেবকে ব্যস্ত করে রাখছেন।

জেলার আভ্যন্তরীণ আইন–শৃংখলার অবস্থা দু'দিনেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। প্রত্যেক মহকুমা হেড কোয়ার্টারে জনসভা করে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হল। তা ছাড়া এসডিও ও এসডিপিওদের ওপর বিভিন্ন এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হল। বলা হল, কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সেই এলাকার দায়িত্বশীলকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। প্রত্যেক থানায় ক্রিমিনালদের যে তালিকা থাকে, তাদের প্রত্যেককে হাজতে ঢোকাবার হুকুম দেওয়া হল। এ কথাও জোরে–শোরে প্রচার করে দেওয়া হল

www.pathagar.com

যে, কোথাও কোন অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীকে জন সমক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। গুজব রটনাকারীদের উদ্দেশে বলা হল যে, তারা যারাই হোক না, তাদের হাজতে পাঠান হবে।

কিন্তু সীমান্তে পাদ্রিরা তাদের 'দুষ্টামি' চালিয়ে যেতে লাগল। বলে রাখি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের আগেই এই সব উস্কানিমূলক কাজ সীমান্তের ওপার থেকে করা হচ্ছিল; যাকে বলে দেশের মানুষকে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করার জন্য। উপরন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকা পাকিস্তানকে তার সাহায্য স্থগিত ঘোষণা করল- ভারতকে ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে তার সৈন্য চলাচল করার অনুমতি না দেবার কারণে। চীন আমেরিকার দুশমন। ভারত চীনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। নেহেরু পাকিস্তানের দোস্ত আমেরিকাকে ধরেছে যাতে আইয়ুব খান রাজি হয়ে যান যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে তাদের সৈন্যদের চীন সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। পাকিস্তান এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। সুতরাং পশ্চিমা দুনিয়া বিশেষ করে আমেরিকা পাকিস্তানের ওপর চটে গেল। পাকিস্তানকে বেকায়দায় ফেলবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র চলতে লাগল দেশে-বিদেশে। দেশের মানুষ অবশ্য মার্কিনিদের ধমককে কোন পাত্তাই দেয়নি। ভয় ছিল সরকারকে নিয়ে। কিন্তু সরকার জনগণের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে জানিয়ে দিল যে- তারা চায় 'ফ্রেন্ডস, নট মাস্টারস।'

পরবর্তী দু'বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সনের পর ১৯৬৩, '৬৪ সালে অবস্থা সৃষ্টি করে ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে ভারত লাহোর আক্রমণ করে বসে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে ভারত অবশ্য কিছুই বাকি রাখেনি। সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে চাকরি করে এই সত্যটি খুব ভাল করেই বুঝেছিলাম।

এক সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল ডাকবাংলোয় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এখানে এসেছিলাম বাৎসরিক অবশ্য করণীয় মহকুমা টেজারী ভেরিফিকেশন করতে। হঠাৎ ফোন এল। হালুয়াঘাট বর্ডার দিয়ে পাদ্রি ফাদার পোপ উপজাতিদের একটা বড় দল নিয়ে ভারত যাচ্ছিলেন। ইপিআর জওয়ানরা তাদের বাধা দিলে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রথমে হাতাহাতি। এক পর্যায়ে ফাদার পোপ বেয়নেটের আঘাতে জখম হন। ইপিআর জওয়ানরা তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে। উপজাতিরা সীমান্তের ওপারে পালিয়ে গেছে।

ফোন পেলাম রাত সাড়ে দশটায়। এসপির কাছে জানতে চাইলাম তিনি আরো আগে আমাকে জানালেন না কেন? এসপি বললেন, ঘটনা ঘটেছে সন্ধ্যায় এবং খবর আসতে আসতে দেরী হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

সেই রাতের বেলা ছুটলাম টাঙ্গাইল থেকে মোমেনশাহী আর সেখান থেকে এসপিকে নিয়ে হালুয়াঘাট। থানায় বসে ঘটনা বিস্তারিত সব জানলাম। ইপিআর কমান্ডারকে তলব করা হল। তিনি সব দোষ পাদ্রির ওপর চাপালেন। বললেন, বেয়নেট দিয়ে এ জন্য জখম করা হয়েছে যে, তাদের ওপর গুলি করার হুকুম ছিল না।

পাদ্রি তখনো হাজতে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর কিছু বলার আছে কি না। তিনি বললেন, 'আমি আমার গির্জার অনুসারীদের তাদের ইচ্ছা অনুসারে সুশৃংখলভাবে সীমান্তের ওপারে আমাদের আর একটি বড় গির্জা পরিচালিত ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ইপিআর জওয়ানরা আমাদের বাধা দেয়। আমার ওপর বেয়নেট চার্জ করে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি জানেন কি যে, ঐ সীমান্তটি দুই দেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমান্ত?' পাদ্রি বললেন, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু আমার গির্জার অনুসারীরা কোন দিনই ওটা মানেনি। আমি তাদের ইচ্ছা অনুসারেই তাদের ওপারে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

আমি বললাম, 'আপনি কি মনে করেন যে, আপনি একটা বেআইনী কাজ করেছেন এবং ওদেরকে সেই আইন বিরোধী কাজে প্ররোচিত করেছেন?' পাদ্রি উত্তর দিলেন, 'না। আমি আমার গির্জার আদেশ ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনা।'

বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি আপনার ধারণা নিয়ে রাতের মত এই হাজতে থাকুন। মশারা আপনার সাথে একটু-আধটু বেআদবী করলেও করতে পারে; এ্যাডভাঞ্চারে যখন নেমেছেন তখন এ রকম অবস্থায় পড়তেই হবে।'

দারোগা জানাল, মিশন হাসপাতালে নিয়ে পাদ্রির ক্ষতের পরিচর্যা করা হয়েছে। আঘাত গুরুতর নয়। বললাম, 'ওকে থানা ডিসপেনসারীতে নেওয়া উচিৎ ছিল! কারণ ওরা ওদের হাসপাতালের রেকর্ড বদলিয়ে ফেলতে পারে।'

ওখানে বসেই একটা হুকুম জারি করলাম যে, জেলার আশি মাইল সীমান্তজুড়ে যেখানে যত বিদেশী পাদ্রি আছেন তাদেরকে কাল সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে মোমেনশাহী শহরে পৌঁছতে হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন কারণেই তাঁরা সীমান্ত এলাকায় যেতে পারবেন না।

শেষ রাতে নিজের বাংলোয় ফিরে শুনলাম লাট সাহেব দুবার ফোন করেছিলেন। সাথে সাথে ঢাকায় ফোন লাগান হল। গভর্নর সাহেব ঘটনা জানতে চাইলেন এবং তাঁর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করলেন। বললেন, 'ভুট্টো সাহেব সকালেই চিৎকার শুরু করবেন। কারণ পাদ্রির ঘটনা ইতিমধ্যেই পিন্ডি পৌঁছে গেছে।'

www.pathagar.com

মোমেনশাহী শহরে সকল পাদ্রিকে জড়ো করার ব্যাপারে গভর্নর সাহেবকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। তবে বুঝলাম আমার প্রতি তাঁর আস্থা আছে যে, আমি সাফল্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারব।

সকালে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠালাম সরকারের কাছে। এদিকে ঐ যে এক ফরাসী মহিলার কথা বলেছিলাম, তিনি এসে হাজির। আমাকে চড়া সুরে বললেন, 'আপনি অন্যায়ভাবে আমাদের ওপর এক অমানবিক আদেশ জারি করেছেন। আমরা আমাদের মিশন ছেড়ে থাকতে পারি না। আপনি জানেন 'চিফ সেক্রেটারী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনার বিরুদ্ধে তাঁর কাছে আমি অভিযোগ দায়ের করব।'

মহিলাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'সীমান্ত এলাকায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেতে পারবেন না। তবে আপনার ঢাকা যেতে বাধা নেই। আপনি ঢাকা গিয়ে সানন্দে আমার বিরুদ্ধে যত ইচ্ছে চিফ সেক্রেটারীর কাছে অভিযোগ করতে পারেন। সুতরাং এখানে বসে আমার সময় নষ্ট করবেন না।'

পরদিন ঢাকা থেকে একজন বড়সড় পাদ্রি ওয়ারনার সোজা হালুয়াঘাট চলে গেলেন। ফেরার পথে তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। আমি রাজি হলাম না। স্থানীয় এসডিও'র সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলাম। তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল যে, বিনা অনুমতিতে হালুয়াঘাট সফর করার জন্য তাঁকে যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার করা যেতে পারে। গ্রেফতারের কথা শুনে পাদ্রিটি মুহূর্তের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেলেন।

এদিকে আমি লাগাতার সীমান্ত এলাকা সফর করছি। গারোরা সবাই সীমান্তের ওপারে চলে যায়নি। এখনও কিছু কিছু গারো এদিক-ওদিক রয়েছে। তা ছাড়া হাজং এবং আরও দু-একটা উপজাতির লোকজন নিজেদের ঘর-বাড়ীতেই বসবাস করছে।

গারো ভাষায় প্রচারপত্র ছেপে বিলির ব্যবস্থা করা হল। যারা সীমান্তের ওপারে চলে গেছে তাদের উদ্দেশে বলা হল, তারা যেন নির্ভয়ে নিজ নিজ বাড়ী-ঘরে ফিরে আসে আর যারা এখনো যায়নি তাদের নিজ নিজ ভিটেমাটিতে থাকার আহবান জানান হল। তাদের সতর্ক করে দেয়া হল তারা যেন পাদ্রিদের ষড়যন্ত্রে পা না দেয়। ভারতীয় চক্রান্ত সম্পর্কেও প্রচারপত্রে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হল।

সামনে ঈদুল আজহা। মোমেনশাহী শহরে মোনেম খান সাহেব একটা বড়সড় ঈদগাহ তৈরী করিয়েছেন; পুকুর ও সারি সারি নারিকেল গাছ জায়গাটাকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ঈদগাহ কমিটির তিনি সেক্রেটারী আর ডিসি পদাধিকার বলে সভাপতি। তিনি গভর্নর হবার পরও এতে কোন হেরফের হয়নি।

বছরে দু'টো ঈদের অন্তত একটাতে তিনি শরীক হন। এবার তিনি আসতে পারছেন না বলে তাঁর বক্তৃতা ছাপিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ঈদের জামাতে সেটা পড়ে

www.pathagar.com

শোনাবারও অনুরোধ করলেন। ঈদের দিন ঈদগাহে আমি তাঁর মুদ্রিত ভাষণটি উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করে দিলাম।

আমি নিজে ছোটখাট একটা বক্তৃতা করলাম। বললাম, 'কোর্ট বিল্ডিং-এর ছিন্নমূল ভাইদের যেন আজকের এই আনন্দের দিনে আমরা ভুলে না যাই। নিজেরা কোরবানীর গোশ্‌ত খাবার আগে এই হতভাগ্যদের যেন আমরা তার অংশ দেই।'

আমার এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। ট্রাকভর্তি গোশ্‌ত পৌঁছল ভারত থেকে বিতাড়িত মোহাজেরদের কাছে। শুধু তাই নয়, নগদ টাকা-পয়সাও তাদের দেওয়া হল যাতে তারা চাল-আটা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনতে পারে; সবার সাথে তারাও ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে।

আমি আমার বক্তৃতায় এদের সম্পর্কে বললাম যে, আগামী পনের দিনের মধ্যেই এরা নতুন ঘর-বাড়ীতে যাবে, ইনশাল্লাহ। পরদিন থেকে আমার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হল। বাস, ট্রাক, বেবী ট্যাক্সীবোঝাই মোহাজেররা চলল সীমান্তের দিকে। তাদের বলা হল, সরকারী রিলিফের টাকা দিয়ে তাদের ঢেউ টিন কিনে দেওয়া হবে। উপজাতিদের ফেলে যাওয়া ধান-চাল এসডিও সাহেবরা তাদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। তবে তাদের জমি চাষ করতে হবে এবং উপজাতিদের কোন জিনিসে তারা হাত দিতে পারবে না। যদি এই নির্দেশ ভঙ্গ করে কেউ এমন কিছু করে তবে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

এই পরিকল্পনাটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মোহাজেরদের উপজাতীয় এলাকায় পুনর্বাসন করতে দেখে যে অল্প সংখ্যক উপজাতি তখনো ছিল, তারাও পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমি ছিলাম আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্ণ আশাবাদী। আমি মনে করতাম, যারা যাবার তাদের আমরা কোন মতেই ঠেকাতে পারছি না। সুতরাং একটা ঝুঁকি নিতে দোষ কি। আমার বিশ্বাস ছিল, মোহাজেররা যখন উপজাতীয় এলাকায় বসবাস করতে শুরু করবে তখন নিজেদের জমি বেহাত হয়ে যাবার ভয়ে উপজাতিরা ফিরে আসবে। বাস্তবে তাই হল। তবে এক সপ্তাহ সরকারের দারুণ চাপ সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানিতে আমি ধৈর্যচ্যুত হইনি।

যাদের সীমান্ত এলাকায় বসান হল, তাদের প্রতি খুব কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ডিসি, এসপি, এসিডিও, সার্কেল অফিসার এবং অন্য আরো ছোটবড় অফিসাররা নিয়মিত সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যেতে লাগলেন। সুতরাং কারো অপকর্মের সুযোগ নেই। তাছাড়া সীমান্ত পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আরো দু'জন এডিসির ব্যবস্থা করলাম।

www.pathagar.com

একদিনের কথা। ঝিনাইগাতি এলাকায় উপজাতীয়দের এক সমাবেশে বক্তৃতা করছি। নতুন আসা লোকেরা অভিযোগ করল যে, তাদের যেভাবে থাকতে বলা হয়েছে তারা সেভাবেই থাকছে এবং উপজাতীয়দের সাথেও তাদের সদ্ভাব রয়েছে কিন্তু বন বিভাগের লোকজন তাদের ওপর ক্রমাগত জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে।

অভিযোগকারীদের কাছে জানতে চাইলাম কেন বন বিভাগের লোকজন তাদের ওপর জুলুম করে? তারা বলল, 'হুজুর, ঘর তৈরীর জন্য একটা-আধটা বাঁশ বা কড়ই গাছ কাটলে সোজা জেলে ঢুকিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন বাঁশ বা গাছ কাট?' বলল, 'হুজুর, দিনের বেলাই কাটি।' বললাম, 'এখন থেকে তোমরা রাতে কাটবে। ফলে প্রমাণ করার আগে আর তোমাদের জেলে দিতে পারবে না'।

গরু ছাড়াই এরা গারোদের ফেলে যাওয়া জমি চাষ করছে। দেখে ভাল লাগল। এদের বললাম, যেখানে যেখানে গির্জা আছে তার কাছাকাছি একটা করে মসজিদ তৈরী করবে। এসডিও সাহেবদের ডেকে বললাম মসজিদ তৈরীর কাজে এদের সহযোগিতা করতে হবে এবং একটা করে মাইক্রোফোন কিনে দিতে হবে প্রতি ওয়াক্তে আযান নিশ্চিত করতে।

কয়েকদিন পর গভর্নর মোনেম খান সফরে এলেন। পুরো সীমান্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। পালিয়ে গিয়েছিল যে সব উপজাতি, তাদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে তাদেরও দেখলেন। তিনি খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। বললাম, 'স্যার, সরকার মোড়লি না করায় এত তাড়াতাড়ি এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।' খুশী মনেই তিনি বিভিন্ন জায়গার ফটো তুলে পাঠাতে বললেন। কারণ ভুট্টো সাহেব রোমে মহামান্য পোপকে সেসব ছবি দেখাবেন। তিনি আরো জানালেন যে, শিগগিরই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব স্বয়ং এই এলাকা সফর করবেন।

আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা পাল্টে গেল। পাদ্রিদের ও ভারতীয়দের অপপ্রচার সত্ত্বেও উপজাতিরা নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে আসতে শুরু করল। আর মোহাজেররাও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। যে সব মোহাজের উপজাতিদের জমি ইতিমধ্যে চাষ করেছে তারা জমির মালিককে অর্ধেক ফসল দেয়ার অঙ্গীকার করল। এতে দু'পক্ষই লাভবান হল। এদের মধ্যে বাড়ল বিশ্বাস ও সম্প্রীতি।

আমাদের সাফল্য দেখে এই এলাকার ওপর ঢাকার কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি পড়ল। তাঁরা বলতে লাগলেন, আসলেই এটা খুব উর্বর এলাকা। সুতরাং এখানে একটা কিছু করা দরকার। বিএডিসির চেয়ারম্যান হ্যাচ বার্নওয়েল একদিন সফরে এলেন। এ সব দেখে-শুনে বললেন, তিনি এ এলাকায় ট্রাকটর এনে চাষ করাতে চান। আমি বললাম,

www.pathagar.com

খুব ভাল কথা। তবে তাঁর রিপোর্টে যেন এ প্রস্তাবের প্রতি আমার ঘোরতর আপত্তির কথাটা উল্লেখ করা হয়। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? কালেকটিভ কালটিভেশন খুব ভাল জিনিস, ফসল বাড়বে কয়েক গুণ।' বললাম, 'সবই হবে বুঝলাম। কিন্তু এতে জমির সীমানা মুছে যাবে। মোহাজের আর উপজাতিদের মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস বাড়বে। আবার সীমান্ত এলাকা হয়ে উঠবে অশান্ত। এ বিলাসিতা করার সুযোগ আমাদের নেই।

মিঃ বার্নওয়েল তাঁর রিপোর্টে আমার আপত্তি এবং যুক্তি ভাল করেই তুলে ধরলেন। ফলে এলাকায় বিএডিসি নামক শ্বেত হস্তির জমিদারী আর কোন দিনই প্রসার লাভ করতে পারেনি।

এরই মধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেল। মোমেনশাহী শহরে গভর্নর মোনেম খানের একটা বাড়ী ছিল। সেখান থেকে ফোন করে বলা হল, গভর্মেন্ট হাউজ থেকে বলছি। এতে প্রশাসনিক কাজে অসুবিধা হত। এখানে আসার আগেই অবশ্য শুনেছিলাম যে লাট সাহেবের আত্মীয়-স্বজনরা স্থানীয় সরকারী অফিসারদের বিরক্ত করতেন, সরকারী কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। কিন্তু এখানে আসা অবধি আমার সাথে এরকম কিছু হয়নি। প্রতি সন্ধ্যায় গভর্নর সাহেবের সাথে ফোনে কথা হত। তিন কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন, ধান-চালের দাম, জেলার শান্তি-শৃংখলার অবস্থা জানতে চাইতেন। বিব্রতকর কোন অনুরোধ করতেন না। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাও আমার সাথে ভদ্র আচরণ করতেন, বিনয় দেখাতেন। এসব দেখে-শুনে ভাবলাম, মানুষ ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে নানা কথা রটায়।

একদিন আমার বাংলোর অফিস চেম্বারে বসে কাজ করছি। ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই অপরপ্রান্ত থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলা হল, 'আমি গভর্মেন্ট হাউজ থেকে অমুক বলছি। আপনি বেছে বেছে সীমান্ত এলাকা থেকে আমাদের লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। এসব চলবে না। আপনার অর্ডার এখনি উইথড্র না করলে আপনি কি করে এ জেলায় থাকেন দেখে নেব।' আমি তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। রাগও হল খুব। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, 'আপনি সত্যি যদি লাট সাহেবের আত্মীয় হয়ে থাকেন তবে তাঁকে বলুন তিনি নিজে অথবা তাঁর কোন সহকারীর মাধ্যমে আমার সাথে কথা বলতে। মনে রাখবেন, এ জাতীয় কথা শুনতে আমি রাজিও নই, অভ্যস্তও নই।' অপর প্রান্ত থেকে বলা হল, 'তা হলে আমার কথা আপনি শুনবেন না? ঠিক আছে দেখে নেব।'

ফোনটা আমিই রেখে দিলাম। নয়তো আরো তিক্ততা সৃষ্টি হত। আমার সারা শরীর ঝিমঝিম করছে। নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্য কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। ভাবছিলাম, এর একটা বিহিত করতে না পারলে চাকরি করা যাবে না। মনে মনে

www.pathagar.com

কর্মপন্থা স্থির করে ফেললাম। কাগজ-কলম টেনে নিলাম। সরাসরি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে একটা চিঠি লিখলাম। ফোনে গভর্নর সাহেবের আত্মীয়ের সাথে যে কথা হয়েছিল তা হুবহু উল্লেখ করে প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরোধ জানালাম, আমাকে যেন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। চিঠির একটা অনুলিপি ঢাকায় চিফ সেক্রেটারীর নামে পাঠালাম।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিজের দস্তখত করা একটি অতি গোপনীয় সার্কুলার ছিল। তাতে বলা হয়েছিল গভর্নর, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা তাঁদের পরিবারের কেউ যদি কমিশনার, ডিসি বা তাঁদের অধীনস্ত কর্মচারীদের কাজে অন্যায়ভাবে বাধা দেয় বা কোন অন্যায় অনুরোধ করেন তা হলে ঐ অফিসাররা সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে ডেমি অফিসিয়াল লেটার লিখতে পারবেন। চিঠির একটা কপি প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারীকেও দিতে হবে।

চিঠি পাঠাবার তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে ফোন এল। ফোন করল আমার বন্ধু ও ব্যাচমেট, গভর্নরের সেক্রেটারী। বলল, নাজির তুমি ঢাকা চলে এস। লাট সাহেব তোমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন। অবশ্য তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগে আমার সাথে দেখা করবে এবং রাতে আমার সাথে খানা খাবে।

বুঝলাম, চিঠির এ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর চিফ সেক্রেটারী ফোন করলেন। বললেন, 'নাজির কিয়া হুয়া? জানতে চাইলাম কি বিষয়ে স্যার?' তিনি বললেন, 'তুমি যে প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছিলে, তার কি হল।?' বললাম, 'স্যার, এখানে যা ঘটেছিল তার সবই আমি চিঠিতে লিখে দিয়েছিলাম। এরপর আর কিছুই জানি না। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আজ রাতে তুমি লাট সাহেবের সাথে দেখা কর। উনি মনে বড্ড কষ্ট পেয়েছেন।' জানতে চাইলাম তাঁর সাথেও দেখা করতে হবে কি না। তিনি বললেন, 'না, তার প্রয়োজন নেই।'

ঢাকা পৌছলাম রাত নয়টার দিকে। গভর্নরের সেক্রেটারীর সাথে দেখা করলাম। গভর্নর নাকি ওকে বলেছেন, নাজির ঘটনাটা আমাকে জানালেই পারত। এদিকে ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিটিকে তথাকথিত 'গভর্মেন্ট হাউজ' থেকে বের করে দিয়েছেন গভর্নর সাহেব। সে গিয়ে উঠেছে তার বোনের বাসায়। তাকে বলা হয়েছে সে যেন ডিসি সাহেবের কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চায় এবং ডিসি সাহেব যে তাকে ক্ষমা করেছেন তা তাঁকে ডিসি সাহেবের কাছ থেকে লিখিত নিতে হবে। এসব শুনে আমার খারাপই লাগল। ভাবলাম, মাত্রাটা বোধ হয় একটু বেশী হয়ে গেছে।

যা হোক, গভর্নর সাহেবের অফিস রুমে ঢুকলাম। সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বসতে বললেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনার সাথে

www.pathagar.com

এরকম একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। ওকে আমি বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছি। আপনাকে বলে দিচ্ছি কখনো যদি আমার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ আপনার সঙ্গে বেআদবী করে আপনি সরাসরি তা আমাকে অবিহিত করবেন, আমি তৎক্ষণাত তার বিহিত করব। আপনি কখনো কারও কথা শুনবেন না। আমিও আপনাকে কখনো কোন অন্যায় অনুরোধ করব না। আপনি আপনার বিবেক মত যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।' একটানা কথাগুলো বলে গভর্নর থামলেন। বুঝলাম, তাঁর কণ্ঠে একটা চাপা ক্ষোভ লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি কোন আলোচনায় না গিয়ে 'জ্বি স্যার' বলে তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। সেক্রেটারী বন্ধু বলল, 'বুড়া শক্‌ড হয়েছে, প্রেসিডেন্ট নিজে তাঁকে ফোন করেছিলেন।'

পরদিন সন্ধ্যায় মোমেনশাহীতে আমার সরকারী বাংলোয় টেলিফোনকারী সেই ব্যক্তিটি হাজির হল। চেহারা ছবি দেখে বুঝা যায়, একটা প্রবল ঝড়-ঝাপটা গেছে তার উপর দিয়ে। সরাসরি মাফ চাইল আমার কাছে। কাতর কণ্ঠে বলল, 'আমার অন্যায় হয়েছে, আগামীতে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি হবে না- ওয়াদা করছি।'

আমি ঘটনাটার এখানেই ইতি চাইছিলাম। বললাম, 'তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত। তাই তোমাকে বলছি, তুমি তোমার অস্থানীয় বন্ধুটি মারফত সীমান্ত এলাকায় ধান-চাল কেনার যে কারবার শুরু করেছ তা বন্ধ কর। লোকটা খুবই খারাপ। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, ও উপজাতীয়দের ভয় দেখিয়ে অল্প দামে ধান-চাল কিনে তা বেআইনীভাবে অন্যত্র নিয়ে যায়। তাই ওকে জেলা থেকে বের করে দিয়েছি। এটা আসলেই খুব লঘু শাস্তি। ওকে কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার ছিল।' একটু থেমে চাপা কণ্ঠে বললাম, 'লাট সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে একটা কুখ্যাত লোকের সাথে মিলে ধান-চালের স্মাগলিং কি তোমার পক্ষে শোভা পায়?' সে যে মাথা নিচু করেছিল তা আর তুলছিল না। আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'চা খাবে?' সে বলল, 'না স্যার। তার চেয়ে স্যার ঢাকায় একটা ফোন করে দিন যাতে আমি বাসায় উঠতে পারি।' বললাম, 'ঠিক আছে, আমি এখনি ফোন করে দিচ্ছি।' ঢাকায় ফোন করলাম। গভর্নর সাহেবকে বললাম, 'অনুতপ্ত বক্তিটি আমার কাছেই আছে। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। আমার কাছে অঙ্গীকার করেছে আগামীতে এমনটি আর হবে না। এরপর আর তাঁকে কোন শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে না। সে আপনার কাছেও তাঁর ভুলের মাফ চেয়ে নেবে।

গভর্নর সাহেব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

এরপর আমি যতদিন মোমেনশাহী ছিলাম ঐ ব্যক্তি বা গভর্নর সাহেবের অন্য কোন আত্মীয় আর কোন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেনি। তবে গভর্নর সাহেব সুযোগ পেলেই সবার সামনে বলতেন আপনারা তো আমাদের বিরুদ্ধে কনফিডেনসিয়াল

www.pathagar.com

রিপোর্ট লিখে থাকেন। আমি বুঝতাম তিনি কার দিকে ইঙ্গিত করছেন। তবে এ কথা সত্য যে, আমি ওটুকু না করলে মোমেনশাহীতে স্বাধীনভাবে আমার সরকারী দায়িত্ব পালন কঠিন হত এবং জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত।

একথা আমি নিঃসংকোচে বলব যে, প্রশাসক হিসাবে মোনেম খান সাহেব যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। গভর্নর আজম খান ও গোলাম ফারুক সাহেবের অধীনেও চাকরি করেছি। আমি মনে করি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের চেয়ে মোনেম খান অনেক বেশী সফল ছিলেন।

গভর্নর মোনেম খান তাঁর একজন সহকারীর মাধ্যমে প্রদেশের নানা জরুরী খবরা-খবর সংগ্রহ করতেন। এই সহকারী বিভিন্ন ডিসি, এসডিও, সার্কেল অফিসার ও ওসির কাছে ফোন করে জানতে চাইতেন ধান, চাল, নুন, কেরোসিন ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কত, ফসলের অবস্থা কি এবং কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। বছরের প্রতিটি দিন এ কাজ রুটিন মাফিক চলত। কখনো এর কোন ব্যত্যয় দেখিনি।

সেক্রেটারীদের মিটিং-এ দেখেছি বাঘা বাঘা অফিসাররা বেকায়দায় পড়ে গেছেন, নাজেহাল হয়েছেন চরমভাবে। কারণ সেক্রেটারী সাহেবদের পক্ষে অত বিস্তারিত ও তাজা খবর সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারা যে সব তথ্য পেতেন তা নানা হাত ঘুরে তাঁদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে পনের দিন লেগে যেত। অথচ গভর্নর সাহেবের কাছে থাকত একেবারে লেটেস্ট ইনফরমেশন। টেলিফোনের মাধ্যমে দেশের অবস্থা জানার এই সামান্য ব্যবস্থা তাঁকে অসামান্য প্রশাসক করে তুলেছিল।

একদিন রাত সাড়ে বারোটায় ফোন এল। গভর্নর মোনেম খানের কণ্ঠ ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে- 'ডিসি সাহেব কি করছেন?' বললাম, 'স্যার, ঘুমানর চেষ্টা করছি।' তিনি আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করে বললেন, 'আপনার ষ্টেশন থেকে মানে মোমেনশাহী শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কোন একস্থানে একটি গুরুতর চুরি সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কি?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। এটা পুলিশের ব্যাপার। তারা এ রকম কিছু এখনো পর্যন্ত আমাকে জানায়নি।' তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শুনুন, বিষয়টি আন্তর্জাতিক রূপ নিতে পারে। সুতরাং আপনি খোঁজ-খবর নিন। তবে খুব দ্রুততার সাথে সব করতে হবে এবং ভোর হবার আগেই আমাকে জানাতে হবে। কারণ সকালে এ বিষয়ে আমাকে পিন্ডিতে কথা বলতে হবে। পারবেন তো?' বললাম, 'ইনশাল্লাহ আমার

www.pathagar.com

চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।' মনে হল আমার কথায় তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পেরেছেন। বললেন, 'আপানি মিশন শেষে ফিরেই আমাকে ঘটনা জানাবেন। ঘুমিয়ে থাকলেও জাগিয়ে খবরটা দেবেন।'

এসপি সাহেবকে ফোনে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললাম, 'চার জন সিপাই নিয়ে রেডি থাকুন, অভিযানে বেরুতে হবে।' সদ্য ঘুম ভাঙ্গা এসপি বললেন, 'স্যার বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে যে।' তরল কণ্ঠে বললাম, 'উপায় নেই গোলাম হোসেন, উপায় নেই। বৃষ্টি কেন বাজ পড়লেও যেতে হবে।'

এসপির বাসায় পৌঁছে বললাম, 'বেগম সাহেবাকে উঠিয়ে দিন জনসেবার জন্য। এক পেয়ালা চা না হলেই নয়। আর জেলার ম্যাপটা বের করুন।'

ম্যাপের উপর স্কেল ধরে শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে কি আছে খুঁজছি। মধুপুর জঙ্গলের ভেতর একটা জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। এখানে আছে একটা কুষ্ঠ হাসপাতাল ও একটা গির্জা। নিশ্চিতভাবে বুঝলাম, এটাই সেই জায়গা।

এসপি সাহেব এতক্ষণ অবাক হয়ে আমার কান্ড দেখছিলেন। তাঁকে কিছুই বলিনি। ফলে বিষয়টি জানার ঔৎসুক্য তাঁকে পেয়ে বসল। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাঁকে সব খুলে বললাম।

আমরা আর দেরী করলাম না। মধুপুরের উদ্দেশে দলবল নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম। রাত তখন সোয়া একটা-দেড়টা হবে। মধুপুর থানার বাইরে বড় রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে ডাকাডাকি শুরু করাতে হল। কারণ গাড়ী নিয়ে সরাসরি থানায় ঢুকলে অন্ধকারে সেন্ট্রিরা ডাকাত ভেবে আমাদের উপর গুলি চালাতে পারে।

সেন্ট্রিরা আমাদের ডাকে সাড়া দিল। তাদের বলা হল মোমেনশাহী থেকে ডিসি ও এসপি সাহেব এসেছেন। ডিউটির ওসি সাহেব যেন এক্ষুণি বাতিসহ গাড়ীর কাছে চলে আসেন।

তিন জন লোক এল খুব সতর্কতার সাথে। এরা তিন জনই সিপাই। এসপি জানতে চাইলেন, 'ওসি কোথায়?' একজন কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দিল, 'স্যার উনি বাসায় ঘুমুচ্ছেন।' এসপি বললেন, 'এখনি তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ওসি ছুটে এলেন। তাঁর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, 'কাল আপনার এলাকায় কোন চুরি-ডাকাতি হয়েছে নাকি?' ওসির জবাব, 'না স্যার, এ রকম তো কিছু হয়নি। জানতে চাইলাম, 'এখানকার গির্জাটা কত দূর?' ওসি জানালেন, 'খুব কাছেই।' বললাম, 'চলুন, আমরা ওখানে যাব।'

www.pathagar.com

যেতে যেতে ওসি বললেন, 'শুনেছি কাল রাতে গির্জার ভেতর থেকে নাকি কি একটা চুরি হয়েছে। তবে গির্জা কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে কোন অভিযোগ করেনি। আমরা যা শুনেছি তা সবই লোক মুখে।' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল দিনের বেলায় ঢাকা থেকে কেউ গির্জায় এসেছিলেন? ওসি অবাক হয়ে বললেন, 'জি স্যার, এসেছিলেন। তবে কাল নয় পরশু আর্চ বিশপ ওয়ারনার নামে এক ফরেনার এসেছিলেন। শুনেছি তিনি এই প্রদেশে খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নেতা।' 'পরশু কখন এসেছিলেন তিনি?' আমি জানতে চাইলাম। ওসি বললেন, 'বিকেলে এসে সন্ধ্যায় চলে গেছেন। খুব অল্প সময় ছিলেন এখানে।'

কথা বলতে বলতে আমরা গির্জায় পৌঁছে গেলাম। আমি জানতে চাইলাম, 'এখানকার দায়িত্বে কে আছেন? ওসি জানালেন, 'ওদের মেইন ইনচার্জই এখানে আছেন।' ওসিকে বললাম, 'তাঁকে খবর দিন।'

আমি দু'জন সিপাই নিয়ে গির্জার উত্তর দিকে গারোদের এক বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলাম। একটা লোক বেরিয়ে এল। মনে হল সেই গৃহকর্তা। চেহারায় বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট। এই গভীর রাতে যারা তার সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করেছে তাদের প্রতি তার সদয় হবার কারণ নেই। তবে পুলিশ দেখে একটু বোধ হয় ভড়কে গেল। আমি নিজের পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় পেয়েই ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেল।

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বললাম, 'তোমাদের বড় সাহেবের কাছে এসেছিলাম দেখা করতে। কিন্তু পথে দেরী হয়ে গেল।' তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা! তোমাদের বড় বিশপ নাকি এসেছিলেন পরশু? লোকটা বলল, 'হ্যাঁ হুজুর, তিনি এসেছিলেন।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি বলতে পার তিনি কতক্ষণ ছিলেন?' সে বলল, 'তিন-চার ঘন্টা হবে হুজুর।' 'কোন প্রার্থনা সভা হয়েছিল নাকি'- প্রশ্ন করলাম। সে জবাব দিল, 'হয়েছিল হুজুর।' বললাম, 'যখন সবাই গির্জা থেকে প্রার্থনা শেষে বের হয়ে গেল তখন দরজা-জানালা কে বন্ধ করল?' সে জবাবে বলল, 'সে জন্য আলাদা লোকই আছে। তবে এখানকার ফাদার নিজেই দরজায় চাবি দেন। সেদিনও তিনি নিজেই চাবি দিয়েছিলেন।' বললাম, 'শুনেছি সে দিন নাকি কি একটা গির্জা থেকে চুরি গেছে?' লোকটা একটু দ্বিধা করে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ হুজুর, ঐ রকমই শুনেছি। ফাদার বলেছেন 'টেবারনেকল' বলে একটা বাটি চুরি হয়েছে। কমুনিয়নের সময় ওতেই সবাইকে পবিত্র মদ খাওয়ান হয়।' 'কোন দরজা-জানালা ভেঙ্গে কেউ ভিতরে ঢুকেছিল নাকি?' আমি জানতে চাইলাম। সে বলল, 'এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি।' বললাম, 'আশেপাশে কোন মুসলমান বসতি আছে নাকি?' সে বলল, 'না নেই। এখানে সব গারোদেরই বসবাস।'

www.pathagar.com

আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, উপজাতিরা পারত পক্ষে মিথ্যা বলে না। বিশেষ করে সরকারী লোকের কাছে তো নয়ই। সুতরাং এই লোকটির সঙ্গে কথা বলে কতগুলো বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল।

এদিকে এসপি সাহেব স্থানীয় পাদ্রিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। দরজা-জানালা সব অটুট আছে। দরজার তালায়ও কেউ হাত দেয়নি। অথচ ভেতর থেকে একটা বাটি গায়েব। ভূতটুত ছাড়া ওটা কারো পক্ষে হাতিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

পাদ্রিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওয়ারনার সাহেব কেন এসেছিলেন?' বললেন, 'আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এসেছিলেন।' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম 'তিনি রোমে যে ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন?' পাদ্রি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কঠোর কণ্ঠেই আরো কটা কথা যোগ করলামঃ 'মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না আশা করি। কারণ আমাদের কাছে ঘটনার তথ্য এসে গেছে।' পাদ্রি কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, 'আমি এর কিছুই জানি না। ফাদার ওয়ারনার আমাকে শুধু এতটুকু বলে গেছেন আমি যেন স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের না করি।' বললাম, 'বলুন তো চুরি হল কি করে? ঘটনা গত রাতের না পরশুর?' পাদ্রি কাঁপা কণ্ঠে বললেন, 'গত রাতে চুরি হয়েছে।' বললাম, 'ওয়ারনার সাহেব এসেছিলেন পরশু, ঠিক নয়?' পাদ্রি বললেন, না, গতকাল বিকেলে।' এবার একটু ধমকের সুরে বললাম, 'ঠিক মত মনে করুন, তারপর জবাব দিন। আমি ঢাকায় ফোনে ওয়ারনার সাহেবের সাথে এ সম্বন্ধে কথা বলেছি। তাঁর কথার সাথে আপনার কথার মিল পাচ্ছি না। মনে রাখবেন, মিথ্যা তথ্য দিলে আপনাকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।' আমি একটু থেমে দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, 'টেবারনেকল' আপনার বাসায় রাখা আছে, অন্য কোথাও নয়। ভোর বেলা আমরা আপনার বাসা তল্লাশি করতে পারি।'

পাদ্রি নিজেকে সামলে নিয়ে জোরের সাথে বললেন, 'না, আমার বাসায় 'টেবারনেকল' নেই। আপনি মিছেমিছি আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করছেন।' বললাম, 'মিছেমিছি কিছুই করছি না। যদি চোরই চুরি করবে তবে ওয়ারনার সাহেব আপনাকে থানায় এজাহার দিতে মানা করলেন কেন?' পাদ্রি আর একটা কথাও বললেন না, স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

হাতে সময় খুবই কম। তাই আর দেরী না করে দ্রুত মোমেনশাহী শহরে প্রত্যাবর্তন করলাম। প্রথম কাজ হল ঢাকায় ফোন লাগান। গভর্নর মোনেম খান নিজে ফোন উঠালেন। মনে হল এতক্ষণ তিনি অধীর আগ্রহে আমার ফোনের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁর আঞ্চলিক ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিসি সাব, পাইছেন নি?' বললাম, 'হ্যা স্যার, পেয়েছি।' আমাদের অভিযানের বর্ণনা দিয়ে বললাম 'এটা

www.pathagar.com

ওয়ারনারের একটা চক্রান্ত। চুরিটুরি কিছুই হয়নি। হালুয়াঘাটে ফাদার পোপের দুষ্টমি আর মধুপুরে ওয়ারনারের চক্রান্ত একই সূত্রে গাঁথা। আমি আর এসপি মিলে এক্ষুণি রিপোর্ট লিখে মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে পিন্ডিতে জানান যেতে পারে যে, চুরির ঘটনা সত্য নয়, পাকিস্তানের দুর্নাম করার জন্য এটা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মাত্র।'

গভর্নর সাহেবকে বেশ আশ্বস্ত মনে হল। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'জায়গাটা বের করলেন কিভাবে? বললাম, 'জেলার ম্যাপ দেখে কিছুটা স্যার, আর বাকীটা ইনটিউশনে।

বিশদভাবে ঘটনার বিবরণ ঢাকায় পাঠান হল। সীমান্ত এলাকায় সুবিধা করতে না পেরে মিশনারীরা একটা ধর্মীয় স্থানে চুরির গল্প সাজিয়ে প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলবার বন্দোবস্ত করেছিল। সরকারকে অনুরোধ করলাম এ নাটের গুরু আর্চবিশপ ওয়ারনার যেন আর মোমেনশাহী জেলায় প্রবেশ না করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে। অন্যদিকে পুলিশকে দিয়ে একটা কেস দায়ের করে ওয়ারনারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হল। তবে বিষয়টি আর এগোয়নি। বোধগম্য কারণেই খৃস্টান মিশনারীরা এ বিষয়ে আর অগ্রসর হয়নি।

বলাই বাহুল্য, মোমেনশাহী জেলা এক বিশাল ভূখন্ড। জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে ভৈরব টেনে পৌঁছাতে প্রায় সারাটা দিন চলে যায়। জেলার প্রশাসনিক কাজ, সীমান্তের বিশেষ অবস্থা, জেলা কাউন্সিলের দায়িত্ব সর্বোপরি গভর্নর মোনেম খাঁর নিজ জেলা; বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান– এ সব মিলিয়ে একজন জেলা প্রশাসকের অবস্থা যে কি হতে পারে তা কেবল ভুক্তভুগিরাই জানে।

একদিন খবর এল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মোমেনশাহী সফরে আসবেন। সীমান্ত পরিদর্শনও করবেন। তা ছাড়া তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন মুসলিম লীগের দু'আনার একটা টিকিট কিনে এই মোনেশাহীতেই।

নির্দিষ্ট দিনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এলেন। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য কাওরাইদ থেকে মোমেনশাহী রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে শুধু মানুষ আর মানুষ। সার্কিট হাউজ ময়দান জনসমাগমে উপচে পড়েছে– কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই।

রেলওয়ে স্টেশনের অভ্যর্থনার কথা এখানে একটু উল্লেখ করতে হয়। স্থির হয়ে ছিল যে, প্ল্যাটফরমের ভেতরে কোন অভ্যর্থনাকারী থাকবে না। বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি এবং এসপি গাড়ীর কামরায় প্রবেশ করে প্রেসিডেন্টকে সাদরে নামিয়ে নিয়ে আসবেন। গভর্নর সাহেব ঢাকা থেকেই হবেন প্রেসিডেন্টের সফর সঙ্গী। প্ল্যাটফরমের বাইরে পুলিশের সালামী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের পরিচয়ের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল অভ্যর্থনাকারীদের সকলেই প্রেসিডেন্টের সাথে করমর্দন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি দেখলাম প্রেসিডেন্ট এভাবে সবার সাথে হাত মেলাতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে এবং এতে অন্য প্রোগ্রাম বিঘ্নিত হবে। কথাটা প্রেসিডেন্টকে নিচু স্বরে বললাম। সম্ভবত পরামর্শটা তাঁর মনঃপূত হল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিলেন। গভর্নর সাহেবের ভাইও হাত বাড়িয়ে আর হাত মিলাতে পারলেন না। এটা একজন সামরিক নেতার পক্ষেই সম্ভব।

এবার রেলওয়ে স্টেশন থেকে সার্কিট হাউজ যাবার পালা। প্রেসিডেন্টের মটর এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু'পাশে, ছাদে হাজার হাজার মানুষ। প্রেসিডেন্ট হাত নেড়ে নেড়ে জনতার অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন।

ডিসির বাংলোর গেটের সামনে আমার চার বাচ্চা আর এক ভাইপো দাঁড়িয়েছিল প্রেসিডেন্টকে দেখার জন্য। হঠাৎ প্রেসিডেন্টের নজর পড়ল ওদের ওপর। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাজির, ইয়ে তোমহারা বাচ্চা হোগা?' আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বললাম, 'জি স্যার।' তিনি একটু অনুযোগের সাথেই বললেন, 'ইন লোগকো রাস্তামে কেউ খাড়া কর দিয়?' ত্বরিত জবাব দিলাম, 'স্যার, হাজারো লোগ রাস্তামে খাড়া হ্যায়, হাম আপনা বাচ্চোকো লিয়ে দুসরা এন্তেজাম কেয়সে করে?

ভেবেছিলাম এই সামান্য ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটবে। কিন্তু না তা হল না। প্রেসিডেন্ট তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীকে বললেন, বিকেলের দুটো প্রোগ্রামের মাঝখানে একটু সময় করে বাচ্চাদের যেন সার্কিট হাউজে আনার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি ওদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন। আর এটা সম্ভব না হলে তিনি নিজে ডিসির বাংলোয় গিয়ে ওদের সাথে মোলাকাত করবেন। আমি প্রেসিডেন্টের এই মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে গেলাম। অধীনস্তদের কাছ থেকে কি করে আনুগত্য আদায় করতে হয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তা ভাল করেই জানতেন।

বিকেলে জনসভার পর পার্টি মিটিং-এ যাবার আগে প্রেসিডেন্ট আমার বাচ্চাদের নিয়ে প্রায় আধঘন্টা কাটালেন। আদর ও স্নেহ দিয়ে তিনি ওদের মন কেড়ে নিলেন।

প্রেসিডেন্ট সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন। সীমান্ত এলাকা স্বাভাবিক দেখে তিনি খুশী হলেন। এ সময় সীমান্তের ওপার থেকে বিতাড়িত বহু নারী-পুরুষ বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় নিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অর্থাৎ মুসলিম নিধন চলছে। ঢাকার স্টেডিয়ামের বারান্দা ভরে গেছে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা মানুষদের ভীড়ে। ওদিকে যশোরেরও একই অবস্থা। ওপার থেকে আগত মানুষের প্রচন্ড চাপ। সরকার করার মধ্যে শুধু কিছু খয়রাতি সাহায্য দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন। ডিসিরা হলেন এ সভায় যোগদানকারী সবচেয়ে ছোট অফিসার। তাও আবার ঢাকা ও মোমেনশাহীর ডিসি ছাড়া অন্য কোন ডিসিকে ডাকা হয়নি। কমিশনারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ও খুলনার কমিশনারদ্বয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক সেক্রেটারী, উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসার, পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর প্রধানরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এটা হল ১৯৬৪ সালের কথা।

দেশের আইন-শৃংখলা নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই প্রসঙ্গক্রমে এসে গেল মোহাজেরদের কথা। প্রস্তাব এল প্রত্যেক ইউনিয়নে তিন বা চারটি পরিবারকে ঝোঁপড়া বানিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এরপর তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে। ঝোঁপড়াগুলো সরকারী খাস জমিতে বসাতে হবে এবং টিনের দাম সরকার দিবে।

ঢাকার ডিসি আবুল খায়ের সাহেব অনুমতি নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, 'ওদের আমরা স্থায়ীভাবে কোথাও বসাতে পারব না। তা হলে জাতিসংঘে আমাদের অবস্থান দূর্বল হয়ে যাবে, কারণ আমরা বলছি মোহাজেররা ভারতীয় আর ভারতকে আমরা বলছি তাদের ফেরত নিতে। তিনি মোহাজেরদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, এরা স্টেডিয়াম ভীষণ নোংরা করে ফেলেছে, ওদিকে যাওয়া যায় না নাকে রুমাল না দিয়ে। খেলাধুলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।'

তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পর আমি অনুমতি চাইলাম কিছু বলার জন্য। বললাম, 'আমার বন্ধু ও সহকর্মী ঢাকার ডিসি যাদের অবাঞ্ছিত ও নোংরা বলছেন তারাই পাকিস্তানের জন্য ১৯৪৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মান-ইজ্জত-জীবন সবই কোরবান করে যাচ্ছে। আমরা যদি ক'দিন নাকে রুমাল দিয়ে হাঁটি তাতে এমন কি আকাশ ভেঙ্গে পড়বে! যাদের আজ আমরা তাচ্ছিল্য করছি তাদের সবাইকে যদি পথের ফকির মনে করি তবে মস্ত ভুল করা হবে। পকিস্তানে যারা আসছে, আমরা ভুলে গেলেও তারা এখনো ভুলেনি যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট প্রতিষ্ঠার জন্যই সারা ভারতবর্ষের মুসলমানরা সর্বোচ্চ কোরবানী দিয়েছিল। আমার জেলায় কিছু ছাত্র তাদের পরিবারের সাথে এসেছে। ওরা কলকাতায় মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ছিল। কিন্তু এখানে ওরা ভর্তি হতে পারছে না। কর্তৃপক্ষ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট চাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ভর্তির জন্য ডমিসাইল সার্টিফিকেটও চাওয়া হচ্ছে। যারা ভারত থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসে ঢাকার ডিসি সাহেবের নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে স্টেডিয়ামের বারান্দায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে তাদের কাছে মাইগ্রেশন ও ডমিসাইল সার্টিফিকেট চাওয়া কতটা মানবিক বা কতটা সুস্থ চিন্তার প্রকাশ, ভেবে দেখা দরকার।' তারপর আমি একটু থেমে প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে বললাম, 'স্যার, আমি আপনার কাছে আবেদন করব যে, আজই এবং এখান থেকেই এই সব ছাত্রকে

www.pathagar.com

বিনা মাইগ্রেশন ও ডমিসাইল সার্টিফিকেটে ভর্তি করার ঘোষণা দেওয়া হোক।।' অন্যদিকে ইউনিয়নে ইউনিয়নে খাস জমিতে মোহাজেরদের বসানর আগে এই সব খাস জমি সরকারের দখলে আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হোক।। নতুবা গ্রামে গ্রামে হাঙ্গামা বাধার সম্ভাবনা আছে এবং যারা ভারতীয় ছুরির মুখ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে তারাই পাকিস্তানের ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের লাঠির আঘাতে হয়ত প্রাণ হারাবে।'

খুলনার কমিশনার আবুল এহসান সাহেব তাঁর বক্তৃতায় আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে অনেক কথা বললেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার আগেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'আমি এখান থেকেই ঘোষণা করছি যে, সকল ছাত্রছাত্রী যারা রায়টের কারণে ভারত থেকে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছে তাদের বিনা মাইগ্রেশন ও ডমিসাইল সার্টিফিকেটে ভর্তি হবার সুযোগ দেওয়া হবে। আর ডিসিরা সরকারী দখলে আছে এমন সব খাস জমিতে অন্তত পাঁচটি করে পরিবারকে বসবাস করবার মত ব্যবস্থা করে দেবেন।'

সভাশেষে গভর্নর সাহেব, লাল মিয়া, সবুর খান এবং আরো অনেকে মোবারকবাদ দিলেন আমাকে আমার বক্তৃতার জন্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'নাজির, আমি তোমার অনুভূতির অংশীদার।' বুঝতে পারলাম প্রেসিডেন্ট চমৎকার মুডে আছেন। আমার আরেকটি প্রস্তাব যা আমি আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিনি, এই সুযোগে প্রেসিডেন্টের সমীপে পেশ করে দিলাম। বললাম, 'স্যার, ছেলেদের তো ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেশের নাগরিকত্ব না পেলে ওদের মনের শূন্যতা দূর হবে না। ওদের জীবনের অনিশ্চয়তা দূর না হলে লেখা-পড়ায়ও মন বসাতে পারবে না। সুতরাং ওদের এদেশের নাগরিত্ব দিয়ে দিলে স্থায়ীভাবে ঝামেলা মিটে যায়।' প্রেসিডেন্ট স্মিত হেসে বললেন, 'কাল জর্দানের প্রিন্সকে নিয়ে যশোর যাচ্ছি ওখানকার মোহাজের ক্যাম্প দেখতে। সেখানে গিয়ে এই ঘোষণা দেব। ঠিক হ্যায়?' আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে উচ্চারণ করলাম, 'বিলকুল ঠিক হ্যায় স্যার।'

প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা রাখলেন। পরদিন যশোরে ঘোষণা দিলেন, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যারা জীবন ভয়ে ভারত থেকে এ দেশে পালিয়ে এসেছে, তাদের এখন থেকে পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে।

আমি জানি, আমার সেদিনের বক্তব্যে ঢাকার ডিসি ছাড়াও আরো কেউ কেউ হয়তো বিরক্তি বোধ করেছিলেন। তাঁদের এই আচরণ আমাকে মর্মাহত করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস এত তাড়াতাড়ি কি করে তাঁরা ভুলে গেলেন, ভাবতেও

www.pathagar.com

আমার কষ্ট হয়। যাদের অশেষ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ পেয়েছিলাম, তাদের সবচেয়ে কষ্টের দিনে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কোন্ নৈতিকতায় পড়ে? যার যা পাওনা তা দিতে আমাদের এত অনীহা কেন? এটা তো পাপ। জানি না, আমরা আজো সেই পাপের খেসারত দিয়ে যাচ্ছি কি না?

আর এক ভিআইপির মোমেনশাহী সফরের কথা মনে পড়ছে। ঢাকা থেকে খবর এল প্রিন্স করিম আগা খান এক দিনের জন্য মোমেনশাহী তশরিফ আনবেন। তাঁর জন্য একটা হ্যালিপ্যাড বানাতে হবে এবং তাঁকে সিনিয়র গভর্নরের মর্যাদা দিতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে প্রিন্স হেলিকপ্টারযোগে শহরে পৌঁছলেন। তাঁকে যথাযথ অভ্যর্থনা করা হল। হেলিকপ্টার থেকে তাঁকে সোজা সার্কিট হাউজে নিয়ে আসা হল। তাঁর সফর সঙ্গী হয়ে এসেছেন তাঁর অনুসারীদের দু'জন ও এক মহিলা সেক্রেটারী। দেখলাম, খাবার পানি ঢাকা থেকে সাথে এনেছেন।

আগা খান কলোনিতে সমাবেশ। প্রিন্সের কাছে বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলাম, আমি ও এসপি সাহেব তাঁর সাথে যাব কিনা। কারণ, আমি বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে এটা একান্তই আপনাদের 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান।' প্রিন্স হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'মিস্টার ডিসি, আপনি নিশ্চয় আমাদের সম্বন্ধে মজার-মজার কথা শুনেছেন। শুনেছেন যে, আমি সফরে এলে আমার গোষ্ঠীর মেয়েরা তাদের লম্বা চুল আমার চলার পথে বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। আর আমি সেই তরুণীদের চুল বিছান পথ দিয়ে হেঁটে যাই। আরো হয়ত শুনেছেন যে, আমার অনুসারীরা আমার সামনে ছেজদায় পড়ে। এগুলো সবই বাজে কথা, স্রেফ অপপ্রচার। আপনারা নিশ্চিয়ই আমার সাথে থাকবেন এবং কি ঘটে নিজ চোখে দেখবেন।'

আসলে আগাখানিদের সম্বন্ধে ঐ রকম নানা কথা লোক-মুখে প্রচলিত ছিল, আজো হয়ত আছে। আমিও এধরনের কথা শুনেছি। কিন্তু প্রিন্সের এই সফরের সময় এরকম কিছু আমার নজরে পড়েনি।

প্রিন্সের সঙ্গে আগা খান কলোনিতে গেলাম। সুন্দর ছিমছাম এক প্যান্ডেলে একটি ডায়াস করা হয়েছে। তাতে একটি মাত্র চেয়ার রাখা আছে। প্রিন্স ইশারা করলেন তাঁর লোকদের ডায়াসে আরো দুটো চেয়ার দিতে। কিন্তু চেয়ার ডায়াসে পৌঁছার আগেই আমি আর এসপি দর্শক-শ্রোতাদের প্রথম সারিতে বসে গেছি। আমি দাঁড়িয়ে প্রিন্সকে লক্ষ্য করে সবিনয়ে বললাম, 'আমরা এখানেই বেশ আরামে বসেছি।'

প্রিন্সকে তাঁর লোকরা একটা মানপত্র পড়ে শোনালেন। গতানুগতিক ব্যাপার। কোন নতুন কিছু নেই এতে। মোমেনশাহীতে আগাখানিদের জন্য একটা পাকা কলোনি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি ও দোয়া চাওয়া হয়েছে মানপত্রে। প্রস্তাবিত কলোনির জন্য

www.pathagar.com

তৈরী ডিজাইন অনুমোদনের জন্য পেশ করারও অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রিন্স ডিজাইন-এ একটা নজর বুলিয়েই আমাকে ডায়াসে যাবার অনুরোধ করলেন। তাঁর কাছে যেতেই একটু ঝালের সাথে বললেন, 'মিঃ ডিসি, একটা মুসলিম দেশের বিল্ডিংগুলোতে যদি মুসলিম স্থাপত্যের প্রতিফলন না থাকে তবে কোথায় থাকবে, বলুন?' এরপর যাঁরা ডিজাইনটি পেশ করেছিলেন তাঁদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে তাঁকে দেখাতে বললেন। আজকের মোমেনশাহী শহরের আগাখান কলোনির বাড়ীগুলো সেই দিনের সংশোধিত ডিজাইনে তৈরী। প্রিন্স আগা খানের স্থাপত্য ডিজাইন সম্বন্ধে মন্তব্য আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এবার বলি প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের কথা। দেশে প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হবে। জনাব আইয়ুব খান একদিকে আর কপের মনোনীত প্রার্থী মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ অন্যদিকে। সারাদেশে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা। মৌলিক গণতন্ত্রীরা ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন। ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মোমেনশাহী যেহেতু গভর্নর মোনেম খানের নিজ জেলা তাই উভয় পক্ষেরই চাপ এই জেলার ওপর। যদি মিস জিন্নাহ এখানে বেশী ভোট পান তা হলে গভর্নর মোনেম খানকে অপদস্থ করা যায়। অন্যদিকে যদি আইয়ুব খান বেশী ভোট পান তবে মোনেম খান আরো শক্তভাবে তাঁর অবস্থানে টিকে যান। এটা হল স্থানীয় পলেটিকস মানে পূর্ব পাকিস্তানের পলেটিকস। সর্ব পাকিস্তানী পলেটিকস হল ভিন্ন রকম ঃ আইয়ুব খান গদিতে থাকলে সামরিক বাহিনী বহাল তবিয়তে দৃঢ় অবস্থানে থাকবে দেশের শাসন ব্যবস্থায় আর মৌলিক গণতন্ত্রও টিকে যাবে; অন্যদিকে ফাতেমা জিন্নাহ জিতলে দেশে মুক্ত গণতন্ত্র আসবে।

আমাদের ওপর অর্থাৎ প্রশাসন যন্ত্রের ওপর ইলেকশন কমিশনারের কড়া নির্দেশ এল, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে। সরকারী নির্দেশ- মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহর প্রতি পরম সম্মান দেখাতে হবে। তাঁর প্রতি সামান্যতম অসৌজন্য বা অসম্মান কেউ যাতে না দেখায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আর যে সব জায়গায় তিনি সফরে যাবেন সে সব জায়গায় তাঁকে সিনিয়র গভর্নরের মর্যাদা দিতে হবে। কারণ তিনি জাতির পিতা কায়েদে আজমের বোন।

ইলেকশন কমিশনারের নির্দেশের চেয়ে সরকারী নির্দেশগুলো ছিল অধিকতর কঠোর ও জোরাল। বিরোধী পক্ষ মুখে না বললেও তারা এটা চাইত যে, কায়েদে আজমের বোন ও সারাদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রী মোহতারিমা ফতেমা জিন্নাহ সম্পর্কে সরকারী দল এমন কিছু বলুক যা তাঁর সম্মানের জন্য হানিকর। তা হলে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণা বা আক্রমণ সহজতর হয়।

www.pathagar.com

ভোটের আগে প্রজেকশন মিটিং আছে। কিন্তু তার আগে প্রচারণা। মোমেনশাহীতে আছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ নূরুল আমীন ছাড়াও বেশ কয়েক জন। তাঁরা প্রায় গোটা জেলা চষে ফেলেছেন। এসডিওরা বেশ পেরেশান। যদিও কোথাও তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। মোনেম খান সাহেব প্রচুর সফর করছেন। জনসভা হচ্ছে সকাল থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে। আমাকেও ছুটতে হচ্ছে।

মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ মোমেনশাহী সফরের আসছেন। সরকারের কঠোর নির্দেশ ঃ মিস জিন্নাহ যেন কোনভাবেই অসন্তুষ্ট না হন। তাঁর প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তা ছাড়া তাঁর সফরকালে তাঁকে প্রোটকল মোতাবেক সিনিয়র গভর্নরের মর্যাদা দিতে হবে। তিনি ঢাকা থেকে ট্রেনে আসবেন। কপের নেতৃবৃন্দ তাঁর কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন। জেলা প্রশাসনকে অবশ্য তাঁরা কোন কিছু জানালেন না। আমরা সফরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখলাম। স্থানীয় নেতাদের অযাচিতভাবে জানালাম যে, 'স্টেশনের প্লাট ফরমের বাইরে আমরা প্রেসিডেন্টকে অভর্থনা দিয়েছি তাতে সুশৃংখলভাবে সব সম্পন্ন করা গেছে। আপনারা যদি মোহতারিমাকে প্লাটফরমের ভেতরে অভ্যর্থনা দেন, তবে জনতার ভীড় সামলান মুশকিল হতে পারে এবং তিনিও বিরক্তি বোধ করতে পারেন।' আরো বললাম, 'প্রস্তাবটিকে একটা পরামর্শ মনে করেই বিবেচনা করতে পারেন। কারণ আমি জানি, আমরা যত দূরেই থাকি না কেন গোলমাল লাগলে সম্পূর্ণ দোষটা এবং ব্যর্থতার সকল দায়–দায়িত্ব আসবে জেলা প্রশাসকের ওপর।

পুরো সার্কিট হাউজ মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহর জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। টেলিফোন লাগান হল এবং ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হল।

আমার বাংলো সার্কিট হাউজের খুব কাছে। সব ব্যবস্থা নিজে একবার দেখে এলাম। বাংলোয় আমার অফিস কক্ষে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এসপি সাহেব স্টেশনের কাছে একটা পুলিশ আউট পোস্টে উপস্থিত থাকবেন, ঠিক হল। আমাদের দু'জনের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেসের ব্যবস্থা করা হল।

নির্দিষ্ট দিনে মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহকে বহন করে গাড়ী রেলওয়ে স্টেশনে থামল। কায়েদে আজমের বোন– জনতার জমায়েত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। প্রচন্ড ভীড় হল সমস্ত স্টেশন এলাকায় তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। আমার আর এসপির প্রোগ্রাম ছিল সুযোগ পেলে তাঁকে একটা সালাম করব। অবস্থা দেখে আমরা সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে যে যার অবস্থানে চলে গেলাম। এসপিকে অবশ্য কঠোরভাবে নজর রাখতে বলে এলাম, যেন কোন গোলমাল না হয় এবং পুলিশের আচরণ যেন খুবই সংযত থাকে।

www.pathagar.com

ট্রেন আসার প্রায় আধ ঘন্টা পর কপের একজন স্থানীয় নেতা আমার কাছে এসে বললেন, 'ডিসি সাহেব, একটু স্টেশনে চলুন। মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ তাঁর কামরা থেকে নামতে কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। কারণ প্লাটফরমে প্রচন্ড ভীড় ও বিশৃংখলা দেখে তিনি বিরক্তি বোধ করছেন। নুরুল আমীন সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন স্টেশনের ভীড়টা সরিয়ে দিতে। আমি বললাম, 'ভীড় সরান মুশকিল হবে। তাঁদের সরে যেতে বললে তাঁরা শুনবে না এবং কোন ব্যবস্থা নিতে গেলে ক্ষেপে গিয়ে গোলমাল বাধাবে।'

যা হোক, গেলাম স্টেশনে। রাস্তা থেকে এসপি সাহেবকে সাথে নিলাম। আমরা দু'জনে জনতার কাছে হাত জোড় করে আবেদন করলাম আমাদের জন্য একটু পথ করে দিতে। সাড়া পেলাম। প্লাটফরমে ঢুকে হ্যান্ড মাইকের সাহায্যে লোকদের বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আপনাদের আচরণে মোহতারিমা বিরক্তি বোধ করছেন। তিনি ক্লান্ত। এই প্রচন্ড ভীড় ঠেলে একজন বৃদ্ধা মহিলার পক্ষে কি প্লাটফরম ত্যাগ করা সম্ভব? আপনারা নিশ্চয়ই তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন। আর এখানে এসছেন সেই শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতেই। যদি তাই হয় তবে আপনারা সরে গিয়ে রাস্তা করে দিন, তিনি হেঁটে গিয়ে বাইরে গাড়ীতে উঠবেন। আর যদি আপনারা ভীড় করে হৈ চৈ করতে থাকেন তবে তিনি এই গাড়ীতেই ঢাকা ফিরে যাবেন।

বরফ গলল। জনতার একটা বিরাট অংশ সরে গেল। অনুমতি নিয়ে মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহর কামরায় প্রবেশ করলাম। তাঁর কষ্টের জন্য মাফ চেয়ে নিয়ে তাঁকে নেমে আসার অনুরোধ করলাম। মোহতারিমা জিজ্ঞেস করলেন, জনতাকে প্লাটফরমের ভেতর ঢুকবার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে? আমি লা-জবাব। নুরুল আমীন সাহেব জবাব দিলেন। বললেন, 'মোহতারিমা, আপনার প্রতি মানুষের আন্তরিক ও অগাধ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আমাদের বাধ্য করেছে এ ব্যবস্থা নিতে।'

কপের নেতারা মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহকে নিয়ে গেলেন সার্কিট হাউজে। বিশ্রামের পর তিনি বিশাল জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন সার্কিট হাউজ ময়দানে নির্মিত মঞ্চ থেকে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট তিনি বললেন। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে যিনি এর আগে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন, মোহতারিমা তাকে তিন-চার মিনিট বলার পর থামিয়ে দিলেন।

নির্বাচনকে সামনে রেখে যা বলা দরকার মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ প্রায় সেই রকম বক্তৃতাই করলেন। শ্রোতারা উর্দু বক্তৃতা কি বুঝল জানি না, তবে মুহুর্মুহুঃ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

মোনেম খান সাহেবের কাছে একবার একটা গল্প শুনেছিলাম। পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে একবার কায়েদে আজম মোমেনশাহী এসেছিলেন। গফরগাঁ রেলওয়ে স্টেশন জনতা তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছিল 'জিনু মিয়া জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে। এবারে সেরকম কিছু শুনিনি সত্য কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, কায়েদে আজমের বোনকে দেখার আকাংক্ষা হাজার হাজার মানুষকে এখানে একত্রিত করেছে– তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য নয়।

প্রতি পাঁচ–সাত মিনিট পর ঢাকাকে জানিয়ে যাচ্ছি মোমেনশাহীর পরিস্থিতি। রাজধানীর কর্তা ব্যক্তিরা মনে হল বেশ উদ্বিগ্ন। বুঝতে বাকী রইল না যে, মোহতারিমার সফরের স্পর্শকাতরতা নিয়ে খোদ পিন্ডিই উদ্বিগ্ন রয়েছে।

সন্ধ্যার আগেই সভা শেষ হল। ভালয় ভালয়। মোহতারিমা তাঁর বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে ভাল মত ধোলাই দিলেন। তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন আইয়ুব শাসনামলকে। বক্তৃতা শেষে তিনি গাড়ীতে উঠে সোজা স্টেশনে গেলেন। এরই মধ্যে নূরুল আমীন সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

মোহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহর সফরের সময় আমরা অবস্থা বিচার করে প্রশাসনকে পর্দার আড়ালে রেখেছি। মানুষের কাছে এই সম্মানিতা মহিলার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি দেখাবার আবেদন করা ছাড়া কারও কিছুই করার ছিল না। তা ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনে জাতির পিতার পাশাপাশি তাঁর বোনের ভূমিকা দেশের মানুষের মনে গভীর ছাপ রেখেছে। গ্রাম–গঞ্জের মানুষ তাঁকে এক নজর দেখে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছে। এরকম একটা অবস্থায় প্রশাসনের কিইবা করার ছিল। এ রকম স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে প্রশাসন একটু বেখেয়াল হলেই ঘটে যায় বিপত্তি। মানুষের অনুভূতি ও পরিবেশের বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করে কর্ম পন্থা ঠিক করতে না পারলেই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যেখানেই প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের বিরোধ ঘটেছে দেখা গেছে, স্থানীয় প্রশাসন জনতার অনুভূতি ও পরিস্থিতির বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। রেলওয়ে স্টেশনে জনতার সম্মুখে আমি আর এসপি সাহেব হাত জোড় করে অনুরোধ জানিয়ে তাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি। তবে এ ক্ষেত্রে লাঠি চার্জ করেও জনতাকে হটান যেত। কিন্তু তার পরিণাম কি হত? বহু মানুষ আহত হত, জনতার সাথে প্রশাসনের দূরত্ব বাড়ত।

মহকুমা ও জেলা প্রশাসনে আরও একটা দূর্বলতা প্রায়ই দেখা যায়। সেটা হল, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের উপস্থিতি উৎকটভাবে জাহির করতে চান। ফলে অন্যদের চোখে এটা দৃষ্টিকটু ঠেকে। গন্ডগোলের সূত্রপাত হয় এভাবেই। যে সব জেলা বা মহকুমা প্রশাসকরা এই মনোভাব বা রুচি পরিহার করতে পেরেছেন, তাদের সমস্যাও হয়েছে অনেক কম। অন্যদিকে এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করব যে, ইংরেজ

www.pathagar.com

আমল থেকে যে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে জেলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিজেদেরকে সবার আগে জাহির করার প্রবণতা খুব-একটা অস্বাভাবিক নয়। তার ওপর আবার আইয়ুব খান সাহেবের আমলে আমাদের প্রায়ই বলা হত, 'ইউ আর দ্যা ন্যাচারাল লিডারস অব দ্যা পিপল।' বিশেষ করে '৫৮ সালের মার্শাল 'ল এবং পরে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আমলে এই উক্তি বেশ খাপ খেয়ে যেত বৈকি। পরবর্তীকালে অবশ্য চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে কিছুটা ধীর গতিতে এবং প্রায় ভিন্ন খাতে। সেটা জাতির জন্য সুখের হয়নি।

মোমেনশাহীর মত বিরাট জেলার প্রশাসনযন্ত্রও ছিল বিরাট। সমস্যাগুলোও কোনটাই সাধারণত ছোট আকারে আসত না। আমাদের শাসনযন্ত্রটি ছিল বৃটিশ প্রভুদের তৈরী কাঠামো-নির্ভর। তাই আমরা এক একটা অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসন চালিয়েছি; মানুষের সংখ্যা-নির্ভর ছিল না এই প্রশাসনযন্ত্র। অথচ এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। ধরুন বগুড়াও একটা জেলা মোমেনশাহীও একটা জেলা। এই দু' জেলাকে একই পর্যায়ে রেখে বিচার করলে নিশ্চয়ই ভুল হবে।

আমি মোমেনশাহী বদলি হয়ে আসার সময় এ জেলার সাধারণ আইন-শৃংখলার বিষয় নিয়ে রাজশাহীতে এসপির সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। কারণ সে সময় টাঙ্গাইল এবং ভৈরব ক্রিমিনাল এরিয়া হিসেবে পরিচিত ছিল। এসপি সাহেব প্রমোশন পাবার আগে টাঙ্গাইলের এসডিপিও বা মহকুমা পুলিশ অফিসার ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন জমিদার শ্রেণীর লোকের নাম করলেন। বললেন, 'বড় বড় ডাকাতির কেসে ঐ লোক তাঁকে বেশ সাহায্য করতেন। লোকটি এলাকায় ধনবান বলেই পরিচিত। টাঙ্গাইল শহরের এক প্রান্তে এক বিরাট এলাকাজুড়ে তাঁর বাংলো টাইপের বাড়ী। জনসমক্ষে কমই বের হন। সৌখিন লোক। বাড়ীর ভেতর পুকুর আছে। ময়ূর পোষেণ। সংস্কৃতিসেবী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। রাজ কর্মচারীদেরও আদর-আপ্যায়ন করে থাকেন সুযোগ পেলেই।'

কথাটা মনে ছিল। মোমেনশাহীতে কাজে যোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে সব মহকুমাতেই পরিচিতি সফর করলাম। টাঙ্গাইল গিয়ে ওখানকার মধ্যবয়সী এসডিও কাদরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'শহরের ঐ লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কিনা।' এসডিও জানালেন, 'এ ধরনের কোন লোকের সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় হয়নি।' তাঁকে বললাম, 'আমি চলে যাবার পর আপনি ঐ লোকের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করবেন। তাঁকে বলবেন, 'আমি মোমেনশাহীতে দায়িত্বে থাকাকালে কোন ডাকাতি বা রাহাজানি ঘটুক এটা আমি মোটেই চাই না। ব্যাস, এতটুকুই-এর চেয়ে বেশী কিছু বলার দরকার নেই।' এসডিও যে আমার কথা শুনে বেশ অবাক হয়েছেন, তাঁর চেহারায় পরিবর্তন দেখেই তা বুঝলাম। বললেন, 'স্যার, আপনি কি ঐ লোককে চিনেন?' বললাম, 'নাম শুনেছি

www.pathagar.com

মাত্র, কখনো দেখা হয়নি। তবে আপনি তাঁর বাড়ীতে দ্বিতীয়বার যান এটা আমি চাই না। আপনি শুধু মেসেঞ্জার হয়ে তাঁর বাড়ীতে একবার যাবেন এবং আমার কথাটি তাঁকে পৌঁছে দেবেন।'

সদর দপ্তরে ফিরে আসার একদিন পর টাঙ্গাইলের এসডিওর ফোন পেলাম। তিনি বললেন, 'স্যার, আমি আপনার নির্দেশ মত ঐ লোকের বাড়ী গিয়ে আপনার মেসেজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছি। ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন। তাঁকে ভীষণ চিন্তিতও দেখাচ্ছিল। বার বার আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন যে, ডিসি সাহেব আমার নাম জানলেন কি করে। তা ছাড়া জেলায় তিনি চুরি, ডাকাতি চান না– এ কথা আমাকে বলার অর্থ কি?'

এসডিওকে সাবাসি দিয়ে বললাম, 'খুব ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন –সে জন্য ধন্যবাদ। আমি খুব খুশী হয়েছি। তবে আপনি আর তাঁর সাথে কোন যোগাযোগ করবেন না। আর তিনি যদি কোন প্রয়োজনে আপনার কাছে আসেন তবে আর দশ জনের সাথে যে আচরণ করেন তাঁর সাথেও তাই করবেন। কোন বিশেষ সুযোগ যেন তিনি না পান।'

বিষয়টি এখানেই শেষ। তবে দু'বছর মোমেনশাহী জেলায় দায়িত্ব পালনকালে জেলার কোথাও কোন বড় ধরনের ডাকাতি বা রাহাজানির ঘটনা ঘটেছে বলে শুনিনি। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জানি না, ঐ লোকটিকে আমার মেসেজ পৌঁছানোর ফলেই এমনটি হয়েছিল কিনা। কিন্তু এত বছর পরও আজ মনে হয় হয়ত বা কোথাও এর একটা যোগসূত্র ছিল। কারণ এ কথা সত্য যে, কোথাও কোথাও পুরানো জমিদার বা হাফ জমিদার অথবা সমাজের তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বা পরিবার অপরাধ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। আমরা ক্ষমতাবান সরকারী কর্মচারীরা চোরাই মাল বহনকারী কুলিকে শাস্তি দিতেই সদা প্রস্তুত, কিন্তু প্রকৃত দোষীকে ধরতে বা শাস্তি দিতে উৎসাহবোধ করি না। ফলে মূল অপরাধীরা সব সময় লোক চোখের আড়ালেই থেকে যায় এবং সমাজ থেকে অপরাধ তো নির্মূল হয়ই না বরং তা উত্তর উত্তর আরো বৃদ্ধি পায়।

আগেই বলেছি চীন–ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারতীয় সৈন্য চলাচল করতে দিতে রাজি না হওয়ায় ভারত যেমন পাকিস্তানের ওপর চটে গেল তেমনি তাদের উকিল বা মুরুব্বি মার্কিনীরাও ভীষণভাবে নাখোশ হল। সাময়িকভাবে হলেও মার্কিনীরা পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করে দিল। আইয়ুব খান এই সংকটকালে ঘোষণা দিলেন– 'আমরা বন্ধু চাই–প্রভু চাই না।' 'প্রভু নয়, বন্ধু' শিরোনামে বইও লিখে ফেললেন একটা তিনি। বইটা দেশে–বিদেশে বেশ সাড়া জাগাল।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টের মোমেনশাহী সফরকালে তাঁর জনসভা থেকে ট্রেনে জামালপুর ফেরার পথে মার্কিনীদের নিয়োজিত দু'জন পিস-কোর ইঞ্জিনিয়ার সহযাত্রীদের বলেছেন, 'তোমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট তোমাদের ভাষায় কথা বলেন না-কথা বলেন ভিন্ন ভাষায়; অথচ তিনি তোমাদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছেন-এ এক অদ্ভুত ব্যাপার বটে।' আরও নানা রকম উস্কানিমূলক কথা তাঁরা বলেছেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট এল আমার কাছে। তাঁদের অবস্থান জেলার শান্তি-শৃংখলার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। আমি কালবিলম্ব না করে এই দুই ব্যক্তিকে জেলা থেকে বের করে দিলাম।

এরই মধ্যে একদিন পাকিস্তানে নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলেন মোমেনশাহী সফরে। সরকার থেকে আমাকে জানান হল যে, তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেখবেন এবং ডিসির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হবেন। রাষ্ট্রদূত সাহেব তিন-চার জন সহকারীসহ এলেন আমার বাসায়। কুশলাদি বিনিময়ের পর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার ডিসি, আপনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি রাজশাহী থেকে ভারতীয় সহকারী রাষ্ট্রদূতকে বের করে দিয়েছিলেন?' বললাম, 'আমন্ত্রণ করা, রাখা বা বের করে দেওয়া ডিসির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। বিষয়টি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত। সুতরাং প্রশ্নটি আমাকে নয়, সঠিক জায়গায় করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।' রাষ্ট্রদূত ত্বরিত বললেন, ' না না আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে ঐ ঘটনা যখন ঘটে তখন আপনি রাজশাহীতে ডিসির দায়িত্বে ছিলেন কিনা?' বললাম, 'জ্বি হ্যাঁ, আমি তখন রাজশাহীতে ডিসি ছিলাম।' হঠাৎ মার্কিন রাষ্ট্রদূত এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন, 'আমি কি আপনার নামটা লিখে নিতে পারি?' আমি হেসে বললাম 'আলবত পারেন। এ জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।'

রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আর লম্বা-চওড়া কোন কথা হল না। তিনি আবহাওয়া নিয়ে দু-চারটে মামুলি কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বিদায় নিলেন। বুঝতে পারলাম, সম্মুখে বিপদ আছে। ওদের নজরে পড়ে গেছি।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকায়। এ সময় একদিন বিকেলে গভর্নর মোনেম খান ফোন করলেন। বললেন, 'নাজির, আপনার নামে কিছু লোক প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ করেছেন। আপনি তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছেন।' জানতে চাইলাম, 'এরা কারা?' গভর্নর বললেন, 'মোমেনশাহীর কয়েকজন ব্যবসায়ী।' বললাম, 'স্যার, ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু মারাত্মক অনিয়ম দূর করার জন্য আমি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। এতে কিছু লোকের ব্যবসা বন্ধ হলেও বন্ধ হতে পারে। জেলার পাঁচশ'রও বেশী ব্যবসায়ী নারিকেল তেল আমদানীর লাইসেন্স পেয়ে থাকে। নথিপত্রে দেখা যায় যে, একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকজনই কেবল বছরের পর বছর ধরে এই সুবিধা পেয়ে আসছে। জেলায় হাজারেরও

www.pathagar.com

বেশী সোনার দোকান আছে। কিন্তু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া অন্য কেউই এ ব্যবসার অনুমতি পায় না। জেলার অর্ধসহস্র টেন্ডু পাতা আমদানীর লাইসেন্সও ঐ একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকরাই পেয়ে আসছে। অন্য কেউ এসব ব্যবসায় ঢুকতে পারছে না। আমি বিশেষ শ্রেণীর লোকের মনোপলী ভেঙ্গে দিয়েছি। যাদের নারকেল তেলের দোকান বা ব্যবসা নেই তাদের লাইসেন্স বাতিল করে যাদের দোকান বা ব্যবসা আছে তাদের নামে লাইসেন্স ইস্যু করার কথা বলে দিয়েছি। সোনারুদের মধ্যে যারা অন্তত একজন নতুন কর্মচারী নিয়োগ করেছে–কেবলমাত্র তাদেরই লাইসেন্স রিনিউ করা হচ্ছে। বিড়ি পাতার লাইসেন্সও যথাযথ প্রতিষ্ঠানের নামে রিনিউ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর অনিয়মের কারণে যে সব লাইসেন্স বাতিল হবে –নতুন ব্যবসায়ীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সেগুলো বরাদ্দ করা হবে।' আমি একটু থেমে কিছুটা আবেগ–মিশ্রিত কণ্ঠে বললাম, 'স্যার, সরকার ইচ্ছে করলে আমার এসব নির্দেশ বাতিল করতে পারে। কিন্তু আমি এসব পদক্ষেপ নিয়েছি ন্যায় বিচারের স্বার্থে–এর পেছনে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমার উদ্দেশ হল যাতে এ সব ব্যবসায় নতুন নতুন ব্যবসায়ী ঢুকতে পারে এবং কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী চিরদিন এসব ব্যবসাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে না রাখতে পারে।'

গভর্নর ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, আমার এসব কিছুই জানা ছিল না।'

বললাম, 'স্যার, প্রেসিডেন্টকে বাস্তব অবস্থা জানানর জন্য আমি নিজে গিয়েই তাঁর কাছে এসব ব্যাখ্যা করতে চাই।'

গভর্নর আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'না, তার দরকার হবে না। প্রেসিডেন্ট তাঁদের কথা শুনে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদের আমি সব বুঝিয়ে দেব।' বললাম, 'স্যার, এঁরা তো সবাই আপনার পরিচিত। এঁরা হঠাৎ আপনাকে কিছু না জানিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে চলে গেল, ব্যাপারটা কি?'

আমার এ প্রশ্নে গভর্নর মোনেম খান বিব্রত ও অস্বস্তিবোধ করলেন। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

প্রেসিডেন্ট ইলেকশন শেষ হল। মোমেনশাহী জেলায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামান্য ভোট বেশী পেয়ে জয়ী হলেন। তবে মিস ফাতেমা জিন্নাহ হেরে গেলেও ফলাফল তেমন একটা খারাপ করেননি। এর প্রধান কারণ বিশদ পর্যালোচনায় না গিয়েও বলতে পারি, প্রশাসনের কঠিন নিরপেক্ষতা। অবশ্য এ সত্যের স্বীকৃতি শুধু নিরপেক্ষ মহল থেকেই নয়, সরকার পক্ষ থেকেও পেয়েছি।

এরই মধ্যে একটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তখনো নির্বাচনের উত্তপ্ত আবহাওয়া একেবারে স্তিমিত হয়নি। হঠাৎ একদিন পুলিশের একটা গাড়ী একজন পথচারী

www.pathagar.com

যুবককে চাপা দিয়ে মেরে ফেলল। এ ঘটনার পর ক্রুদ্ধ জনতা মোনেম খান সাহেবের নিজস্ব বাড়ীটি ঘেরাও করে ফেলল। বাড়ীটির যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য এসপি সাহেব জনতাকে নিরস্ত করতে যান কিন্তু ফল হয় উল্টো। উত্তেজিত জনতার হাতে এসপি লাঞ্ছিত হন এবং প্রাণে বাঁচার জন্য তিনি বাড়ীর ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে থেকে তিনি কম্পিত কণ্ঠে ফোনে আমাকে জানালেন যে, তাঁকে গভর্নর সাহেবের বাড়ীতে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে এবং যে কোন সময়ে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতে পারে।

তখন বেলা আড়াইটা-তিনটা হবে। আমি সবে খেতে বসেছি। ত্বরিত আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। আমি জানতাম যে, আমার হাতে মোটেই সময় নেই। কোন কারণে সামান্য বিলম্ব হলে এসপির জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য। পুলিশকে খবর দেওয়াও সমীচীন মনে করলাম না। কারণ পুলিশ আসতে যতটা সময় লাগবে ততটা সময় নেই। নির্বাচনের জন্য যে সব সৈন্য জেলায় নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের ওয়ারলেস আমার বাংলোতেই বসান হয়েছিল। ওখানে কর্মরত যে জুনিয়র অফিসারটি ছিল তাকে অতি সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললাম সে যেন কালবিলম্ব না করে তার কমান্ডিং অফিসারকে জানিয়ে দেয় যে, আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি- যদি আমি সেখান থেকে মেসেজ পাঠাই তবে যেন তিনি পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে কিছু সিপাই নিয়ে সেখানে পৌছে যান।

গভর্নরের বাড়ীতে পৌছার আগে আরেকটি কাজ করলাম। মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ফোনে জানালাম ঘটনার কথা এবং অনুরোধ করলাম, তিনি যেন সেখানে এক্ষুণি পৌছে যান। তাঁকে এও বললাম যে, ওখানেই তাঁর সাথে আমার মোলাকাত হবে। ভদ্রলোক আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌছে যাবেন।

ড্রাইভার ও একজন চাপরাশিসহ আমি গিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলাম। জনতা আমার গাড়িটিকে বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকতে বাধা দিল না। বরং রাস্তা করে দিল। কিন্তু গগনবিদারী স্লোগান উঠল, এসপির ফাঁসী চাই। বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকে আমি আমার গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম এবং পুলিশের পিকআপ ভ্যানের উপর চড়ে চিৎকার করে জানিয়ে দিলাম যে জনতাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরে যেতে হবে। বললাম, শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সুতরাং পাঁচ জনের বেশী লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ এবং পুলিশকে কঠিনভাবে এই আদেশ পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জনতাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান হয়েছে। ঘটনা তদন্ত করে অপরাধীর কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' এরপর সবার সামনেই উপস্থিত পুলিশ কর্মচারীদের লক্ষ্য করে বললাম, 'আমার এই ঘোষণা এক্ষুণি মাইকযোগে

www.pathagar.com

শহরবাসীকে জানিয়ে দিন। এবং যারা আইন লংঘন করবে তাদের বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠিয়ে দিন।'

জানতাম, এই মুহূর্তে কোন দুর্বলতা বা শিথিলতা দেখালে তা চরম অশান্তি ডেকে আনবে। এসপি সাহেব তখন বাড়ির এক কামরায় অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি বেশ একটু দমে গেছেন বলে মনে হল। আমার আর সন্দেহ রইল না যে, তিনি সত্যি উন্মুক্ত জনতার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। বললেন, আগুন ঠেকাতে গিয়েই তিনি নাজেহাল হয়েছেন। পাশে দাঁড়ান কেউ একজন ফিস ফিস করে বলল, 'স্যার, উনাকে মেরে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়েছিল।'

এসপি সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম তিনি পথচারী যুবকের লাশটি থানায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এরই মধ্যে সৈয়দ নজরুল এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে জনতা আবার সরব হয়ে ওঠল। তাঁকে ঘটনা অবহিত করে অনুরোধ করলাম তিনি যেন জনতাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আবেদন জানান। নতুবা অনর্থক একটা ঝামেলা বেঁধে যাবে–যা তিনিও চাইবেন না আমরাও চাইব না।

সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আমি সব সময়ই যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে পেয়েছি এবং আমার ওপরও তাঁর সব সময় আস্থা ছিল। তাই আমাদের সম্পর্ক ছিল ভাল। তিনি আমার নেওয়া ব্যবস্থাদি সম্পর্কে যে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলেন তার প্রমাণ পেলাম যখন তিনি জনতাকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। তাঁর আবেদন আংশিক সফল হল। বেশ কিছু লোক স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। তবে কিছু লোক এদিক–সেদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল।

যারা এদিক–সেদিক ঘোরাফেরা করছিল হঠাৎ তারা একত্রিত হয়ে নতুন করে স্লোগান দিতে লাগল। লাশ জনতার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি খুব দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলাম যে, ইতিমধ্যেই তাদের অবস্থান বেআইনী হয়ে গেছে এবং আমরা যে কোন মূল্যে এখানে আইন বহাল করব। সাথে সাথে তাদের এও জানিয়ে দিলাম যে, তাদের প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম সাহেবের সাথে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর একটা জিপ কয়েকজন সৈন্যসহ জনতার পেছনে এসে দাঁড়াল। জনতার মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। ওরা সম্ভবত ভাবল যে ওরাই এখন ধীরে ধীরে ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। মৃত ছেলের আত্মীয়–স্বজনরা ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের সাথে আলাপ–আলোচনা করে স্থির হল যে, সরকারী খরচে ও তত্ত্বাবধানে মৃতের দাফন তার নিজস্ব বাড়িতে করা হবে এবং তার পরিবারকে উপযুক্ত

www.pathagar.com

ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। শুধু তাই নয়, পরিবারে কোন কর্মক্ষম লোক থাকলে তার যোগ্যতানুসারে তার একটা চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। লাশ দ্রুত ময়না তদন্ত করে তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। নজরুল ইসলাম সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাসায় ফিরে এলাম।

যদিও এ ঘটনা এখানেই শেষ হল, কিন্তু শেষ হল না ডিসির মাথাব্যথা। ঢাকা থেকে লাট সাহেবের ফোন পেলাম। টেলিফোনের অপর প্রান্তে এতই উত্তাপ ছিল যে, মনে হচ্ছিল সে উত্তাপে এ প্রান্তের সব কিছু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গভর্নর গর্জন করে বললেন, 'আপনার এসপি কোথায়? সেই ব্যাটা আমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে। আমি জানি সে আওয়ামী লীগ করে। সে ষড়যন্ত্র করে আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। আমি তাঁকে ডিসমিস করে ছাড়ব।' আমি নীরবে গভর্নর সাহেবের তর্জন-গর্জন শুনছিলাম। আমি এতই নীরব ছিলাম যে, হঠাৎ গভর্নর নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিসি সাহেব কথা বলছেন না কেন?' বললাম, 'আপনার কথা শেষ হলেই না বলব, স্যার। একসাথে কথা বললে আমরা কেউ কার কথা বুঝব না।' তিনি আমাকে বলার সুযোগ দিতেই আমি তাঁকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলাম। কোথাও অতিরঞ্জন নয়, কোনকিছু গোপন করার চেষ্টাও নয়। যা ঘটেছিল হুবহু তাই তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে লাট সাহেব সহানুভূতি মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কিছুই বুঝেন নাই। যে এ্যাকশন আপনি নিলেন, এসপি কেন তা আগে নিতে পারল না?' 'আমি বললাম, 'স্যার, তিনি তাঁর সাধ্যমত ও ক্ষমতামত ব্যবস্থা নিয়েছেন। যদি নাই নিতেন তাহলে এতক্ষণে আপনার বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যেত। যদি তাঁর আন্তরিকতা না-ই থাকত তবে তিনি জনতার হাতে লাঞ্ছিত হতেন না।' আমার এ কথা শুনে লাট সাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, ও বেটা লাঞ্ছিত হয়েছে ভাল হয়েছে। ওর আরো মার খাওয়া উচিত ছিল। বেটা চাকরি করে সরকারের আর দালালী করে আওয়ামী লীগের।'

আমি প্রসঙ্গটা পাল্টানর জন্য বললাম, 'স্যার, আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি, আমার মনে হয় না যে, এরপর নতুন করে কোন এ্যাকশান নেয়া উচিত। যদি নতুন করে কিছু করতে যাওয়া হয় তবে মিটে যাওয়া সমস্যাটা হয়ত আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে।' এবার লাট সাহেব হঠাৎ বললেন, 'আপনি পুলিশ না নিয়ে একা একা ওখানে গেলেন কেন? আপনাকে তো ওরা পিটাতে পারত।' বললাম, 'হ্যাঁ স্যার, ওরা অবশ্যই আমাকেও লাঞ্ছিত করতে পারত। কিন্তু সে ভয়ে যদি ঘটনাস্থলে না যেতাম তাহলে জীবননাশ এবং সহায়-সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হতে পারত। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা এবং নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল বলেই আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে গেছি।'

লাট সাহেব কথা বলতে বলতে ফোন দিলেন চিফ সেক্রেটারীর হাতে। তিনি ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আবার নতুন করে তাঁকে বিস্তারিত বলতে হল। তাঁকে এও

www.pathagar.com

জানলাম যে, আজই তাঁর কাছে এ সম্পর্কিত লিখিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আর কিছু করার আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে সতর্কতার প্রয়োজন আছে।' তিনি অবশ্য একটা ব্যাপারে মনে হল সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বলেই ফেললেন যে, আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে কেন সাথে নিয়েছিলাম। বললাম, 'যাকে দিয়ে অবস্থার সামাল দেয়া যায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁকেই নেয়া উচিত।' আমার মনে হয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি কোন্ দল করেন বা কোন্ রাজনীতির সাথে জড়িত সেটা আমার কাছে মুখ্য ছিল না। চিফ সেক্রেটারীর কথা থেকেই বুঝতে পারলাম যে, সৈয়দ নজরুলের ব্যাপারে আপত্তিটি তাঁর নয়, স্বয়ং গভর্নরের।

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই ছিল স্থানীয় মুসলিম লীগ প্রধানের বাড়ী। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যদি তাঁর সহযোগিতা নিতাম তাহলে আমার বিশ্বাস আগুনে ঘি ঢালবার মতই অবস্থার সৃষ্টি হত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাড়ীটাও যাতে ক্রুদ্ধ জনতার রোষানণলে না পড়ে সে জন্য আমাকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

কিছুদিন পর লাট সাহেব মোমেনশাহী সফরে এলেন। জানতে পারলাম যে, তিনি এসপি সাহেবকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আমি এ ব্যাপারে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম না। লাট সাহেবও থাকলেন নিশ্চুপ। তবে তিনি ঢাকা ফিরে যাবার সময় তাঁর ট্রেনের কামরায় উঠে বললাম, 'স্যার একটা কথা জানতে চাই। তিনি যেন আমার মনের কথাটি মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে ফেললেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এসপি সম্পর্কে কোন কথা শুনতে চাই না, অন্য কথা থাকলে বলুন। বুঝলাম, তাঁর দলীয় লোকরা ভাল করেই তাঁর কান ভারী করে রেখেছে। আমিও নাছোড়বান্দার মত বললাম, 'এসপি সাহেবের চট্টগ্রামের পারফর্মেন্স দেখে আপনি নিজেই তাঁকে নিজ জেলায় নিয়ে এসেছেন। আমার জানামতে এখানেও তিনি ভালভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সেদিনকার যে ঘটনার কারণে আপনি তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ, আমার বিবেচনায় এতে তাঁর কোন কসুর নেই। এ ব্যবস্থায় তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করলে অন্যান্য সরকারী অফিসারের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।' লাট সাহেব আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ও আপনার বন্ধু, আপনি ওর ব্যাপারে অন্ধ, তাই আপনি ওর আসল খবরটা রাখেন না। ও তলে তলে আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।' বললাম, 'স্যার, আপনার ধারণা ঠিক হতে পারে। তবে আপনার বাড়ীতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে এ্যাকশান নিতে গেলে সাধারণ মানুষও এটাকে ভাল চোখে দেখবে না। আমার এ কথায় লাট সাহেবের মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল; তিনি মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, 'এটা কি ঠিক? আপনি কি তাই মনে করেন? এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?' আমি বললাম, 'আপনি যদি একান্তই

www.pathagar.com

তাঁর বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশান নিতে চান তাহলে হয় তাঁকে লম্বা ছুটিতে পাঠান অথবা অন্যত্র বদলি করে দিন। তবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাটা কোনমতেই সমীচীন হবে না বলে আমি মনে করি।'

মজার ব্যাপর হল, এসপি লাট সাহেবের সফরের সময় সব ডিউটি পালন করলেন, কিন্তু লাট সাহেব তাঁর সাথে একটা কথাও বললেন না। তিনি চলে যাওয়ার পর এসপি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গভর্নর সাহেব কি আমার ওপর খুব চটে আছেন?' তাঁর সাথে এতবার দেখা হল অথচ তিনি আমার সাথে একটা কথাও বললেন না।' আমি এ সুযোগে এসপি সাহেবকে আমার মনোভাবটা জানিয়ে দিলাম। বললাম, 'বুঝেনইতো। সম্ভবত তাঁর দলের লোকরা আপনার সম্পর্কে উল্টাপাল্টা বলে তাঁর মন বিষিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় আমাদের বিব্রতকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মনে পরস্পরের প্রতি আস্থার অভাব হলে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বসরা যদি কারো ওপর চটে যান তবে তো কথাই নেই। সত্য কথা বলতে কি, আপনার অবস্থায় আমি পড়লে লম্বা ছুটির একটা দরখাস্ত দিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে যেতাম। ভদ্রলোক বুঝে ফেললেন আমি কি বলতে চাচ্ছি।' বললেন, 'আপনার পরামর্শটা মন্দ নয়। ঢাকায় কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আসি, কি বলেন?' বললাম 'ঠিক আছে, তাই করুন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'এরপর আমিও আপনার পথ অনুসরণ করব। ভাবছি, আমিও ছুটিতে যাব। যা সব স্টেন যাচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে–এসব আর ভাল লাগে না।'

এসপি সাহেবের ছুটির দরখাস্ত ত্বরিত মঞ্জুর হয়েছিল এবং এ ছুটি ছিল খুবই দীর্ঘ। পরবর্তীতে কম গুরুত্বের দায়িত্বে তাঁকে পোস্টিং দেয়া হয়েছিল। অনেক পরে অবশ্য জানতে পারি যে, সত্যি সত্যিই আওয়ামী লীগের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। শেখ মুজিবের শাসন আমলে একবার তিনি আমাকে বেশ গর্বের সাথেই বলেছিলেন যে, প্রয়োজনবোধে আমি শেখ সাহেবের বেডরুমে গিয়ে কথা বলতে পারি। তখন আমার মনে হয়েছিল মোনেম খান সাহেব তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তা হয়ত গলদ ছিল না।

বেসিক ডেমোক্রেসির যুগ। আইয়ুব খান চালু করলেন মৌলিক গণতন্ত্র ১৯৬২ সালে। এ নিয়ে এ প্রদেশের মানুষের মধ্যে সমর্থন ও বিরোধিতা দু'টোই লক্ষ্য করা গেল। সরকার পক্ষের লোকরা দাবী করলেন গণতন্ত্র একেবারে গ্রামে বা ইউনিয়নে পৌঁছে গেছে। বিরোধীরা বললেন, মৌলিক গণতন্ত্রের নামে গ্রাম পর্যায়ে টাউট সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশে যারা পুরাতন রাজনীতি করেন তাঁরা সব সময় বৃটিশ বা ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপের ডেমোক্রেসি নিয়েই চিন্তা–ভাবনা করেন। এটাই তাঁদের কাছে আইডিয়াল। তাঁরা মনে করতেন নির্বাচন হবে, পার্লামেন্ট হবে,

www.pathagar.com

ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাঁর মন্ত্রিসভা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। উঁচু তলার রাজনীতিকদের সম্বন্ধে খুব-একটা জানতাম না, তবে মধ্যম তলা আর নিচু তলার রাজনীতিকদের সাথে প্রায়ই আমার পেশাদারী কাজ অঞ্জাম দিতে গিয়ে সাক্ষাৎ ঘটত, কথাবার্তা হত। তাঁদের ভাবনা-চিন্তায় অন্য কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও থাকতে পারে, এমন কখনো মনে হয়নি। সুতরাং আইয়ুব খান যে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম চালু করলেন তার সাথে এঁরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারলেন না। গোড়াতেই রয়ে গেল দ্বন্দ্ব। প্রেসিডেন্ট যখন চাচ্ছেন তাঁর ক্ষমতা পোক্ত করে গণতন্ত্রের একটা আবরণ খাড়া করতে তখন রাজনীতিবিদরা এর বিরোধিতা করে ওয়েস্ট মিনিস্টার কায়দায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছিলেন। এই দ্বন্দ্ব আমার মনকেও দোলা দিত। ভাবতাম, যে দেশের মানুষ অশিক্ষিত- যেখানে কলসি আর কলাগাছ দেখে মানুষ ভোট দেয়, যে দেশের মানুষ বুড়া আঙ্গুলে টিপ দিয়ে ব্যালট পেপার ব্যবহার করে সে দেশে সরকার পদ্ধতি কি হবে তা গুটি কয়েক লোকের চিন্তা-চেতনার ওপরই নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য। এখানে বলে রাখি, যাঁদের কথা বলছি তাঁরা মৌলিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না তবে দেশে বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ছিলেন যাঁরা মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে দশ বছর সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছেন। রাজনীতিকরাই বলতে পারবেন কোন্ পদ্ধতিটি ভাল আর কোন্‌টি ভাল নয়।

প্রশাসনিক দিক থেকে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে ডিভিশনাল কাউন্সিল ছিল, জেলা পরিষদ ছিল জেলাবোর্ডের জায়গায়। এই জেলা পরিষদের একজন সেক্রেটারী থাকতেন। ডিসি পরিষদের চেয়ারম্যানের কাজ করতেন। স্বাভাবিকভাবে জেলা কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান (যিনি নির্বাচিত জন প্রতিনিধি)-এর অধীনে কাজ করার কথা। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের লোকাল গভর্নমেন্টের সচিব সরাসরি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। এটা অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কোন খবরা-খবর না দিয়ে হঠাৎ একদিন দেড়শ ওয়াগন সিমেন্ট মোমেনশাহী রেল স্টেশনে এসে হাজির হল। বেচারা জেলা পরিষদের সেক্রেটারী ডিসির কাছে দৌড়াল মাল খালাস করে কোথায় রাখা হবে? সিমেন্টের মত জিনিস বাইরে ফেলে রাখলে নষ্ট হবে। কিন্তু রাখবার জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে না। মহা সমস্যা দেখা দিল। আমি তাঁকে ঢাকায় জানাতে বললাম যে, আগে-ভাগে না জানিয়ে এত সিমেন্ট পাঠানর ফলে আমরা যথাযথভাবে তা রাখার ব্যবস্থা করতে পারছি না। সুতরাং এ সিমেন্ট ঢাকায় ফেরত নেওয়া হোক। ভদ্রলোক কি বলতে কি বলেছেন জানি না। কয়েকদিন পর স্বয়ং চিফ সেক্রেটারী আমাকে দেখা করতে বললেন। নির্ধারিত দিনে গেলাম তাঁর দরবারে। সেখানে স্থানীয় সরকারের সচিবকে উপস্থিত দেখে বুঝলাম আমাকে তলবের হেতু কি। আলোচনা হল। চিফ

www.pathagar.com

সেক্রেটারী সাহেব স্বীকার করলেন যে, কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তবে সব সিমেন্ট ঢাকায় ফেরত পাঠানটা ঠিক হবে না। আমি বললাম, যথাযথভাবে যতটা সিমেন্ট রাখার ব্যবস্থা করা যাবে ততটা নামিয়ে রেখে বাকী সিমেন্ট ফেরত পাঠান হবে।

অন্য রকম উপদ্রবও ছিল। যেমন ঢাকা থেকে মহকুমায় এসে জেলা পরিষদ সেক্রেটারীকে নিয়ে মহকুমা অফিসারসহ স্থানীয় সরকারের সচিব সভা-সমিতি করে বিভিন্ন রকম নির্দেশাবলী জারি করে চলে যেতেন। সেই সব নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ত ডিসির ওপর। শেষে সরকারকে এইসব অযথা সৃষ্ট এবং এড়িয়ে চলা যায় এমন সব সমস্যার কথা জানালাম। কিন্তু কোন ফল হয়নি। এটাকে একটা এমপায়ার বিল্ডিং এর প্রচেষ্টা বলা চলে। কারণ থানা পর্যায়েও সার্কেল অফিসারদের (উন্নয়ন) সঙ্গেও সচিব সাহেব সরাসরি যোগাযোগ করতেন। এতে করে অন্য আরো একটা প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দিল। থানা পর্যায়ের সিও (ডেব) প্রাদেশিক সরকারের সচিব সাহেবের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকায় স্বভাবতই মধ্যের পর্যায়গুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল। মহকুমা, জেলা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তারা জানতেন না মাঠ পর্যায়ে কি হচ্ছে। অথচ তদারকির দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল। এ পদ্ধতির অকাল মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই সমস্যাগুলো ক্রমেই বেশী করে জটিল হয়ে উঠেছিল।

মৌলিক গণতন্ত্রের কথা শেষ করার আগে দেশের উচ্চতম আদালতে অধিষ্ঠিত স্বনামধন্য বিচারপতি জাস্টিস কায়ানীর নির্ভীক এবং যুগান্তকারী মন্তব্যটা উল্লেখ না করে পারছি না। কোন এক সভায় তিনি এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। মৌলিক গণতন্ত্রের জনকের সামনে বিচারপতি কায়ানী মৌলিক গণতন্ত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন, "বার্ডস বিস্টস এ্যান্ড বেসিক ডেমোক্রেটস।" তিনি তাঁর এই মন্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন ঐ সভাতেই। পরদিন দেশের উভয় অংশের পত্রিকাগুলো প্রথম পাতায় ব্যানার হেড লাইন দিয়ে তাঁর উক্তি ছাপল। আগেই বলেছি, আমি রাজশাহী থাকাকালে প্রাদেশিক সাংবাদিক মহাসম্মেলনে সাংবাদিক বন্ধুদের অনুরোধে বিচারপতি কায়ানীকে আমন্ত্রণ করে আনার এবং সম্মেলন চলাকালে তাঁর খেদমত করার সুযোগ পেয়েছিলাম। মৌলিক গণতন্ত্র এবং বিচারপতি কায়ানী আজ আর নেই। কিন্তু মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলোকে কেউ ভুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতার পর সন্ধ্যায় রাজশাহী বার এসোসিয়েশনের ডিনারে তাঁকে সার্কিট হাউজ থেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম গাড়ীতে করে। হঠাৎ বললেন, 'নাজির, তুমি সাংবাদিকদের ভয়কর নাকি?' আমি বললাম, 'কেন স্যার?' তিনি বললেন, তাঁদের সম্মেলনে মনে হচ্ছে তুমিই হোস্ট।' বললাম, 'না স্যার। এই জেলা সদরে এত বড়

www.pathagar.com

একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হচ্ছে তাতে সহযোগিতা না করে কি পারা যায়। তাছাড়া, কিছু প্রবীণ সাংবাদিক আমাকে স্নেহ করেন, সেটাও একটা কারণ।' বিচারপতি কায়ানী আমার দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, সিরাজগঞ্জে এসডিও থাকাকালে তুমি মফস্বল রিপোর্টারদের পারিশ্রমিক নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেন-দরবার করেছিলে এ জন্য কি তাঁরা তোমাকে ভাল জানে। বললাম, 'এর জবাব আমার জানা নেই স্যার। ওখানে ওদের লাইন প্রতি একটা পারিশ্রমিক নিয়মিতভাবে নির্ধারিত হোক এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল বলেই তাঁদের হয়ে এবং তাঁদের সঙ্গে মিলে কিছু লেখালেখি করেছি এই যা।' বিস্ময়ে অভিভূত হলাম এই দেখে যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সাংবাদিক সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসেছেন তাই এখানকার সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিকদের কত রকমের সমস্যা থাকতে পার সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েই এসেছেন। আর সে কারণেই সিরাজগঞ্জের এই ছোট্ট ঘটনাটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সিরাজগঞ্জের সাংবাদিকরা বহু বছর আগে কি করেছিল তাও তিনি জেনে এসেছেন। এঁর প্রতি সত্যিই আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ না জেগে পারে না।

আবার মোমেনশাহীতে ফিরে আসি। ১৯৬৫ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। একরাতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে বুড়ো পীরের মাজার নির্মাণ কাজ দেখছিলাম। দু'জন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং আরো দু'এক জন অফিসার ওখানে ছিলেন। জেলা কাউন্সিলের সেক্রেটারী সারওয়ার জাহান দৌড়ে এসে খবর দিল- একটা বিদেশী রেডিও খবর দিয়েছে যে, দু'টি ভারতীয় জঙ্গী বিমান করাচীতে গুলি করে নামান হয়েছে অর্থাৎ পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে গেছে। বাংলোয় ফিরে ঢাকায় কাউকে যোগাযোগ করতে পারলাম না অতরাতে। যুদ্ধ অবশ্য সতের দিন ধরে চলল। সত্যি সত্যি এরকম একটা সশস্ত্র যুদ্ধ দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে লেগে যাবে এটা কখনো আগে ভাবিনি। যাক ঢাকার নির্দেশের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলাম। ভাবলাম, আসবে একটা লম্বা কোড মেসেজ। সেটার মর্ম উদ্ধার করতে হতে হবে গলদঘর্ম। হঠাৎ মনে হল এই ফাঁকে 'ডিনায়াল প্ল্যানটা' লোহার সিন্ধুক থেকে বের করে ঝেড়ে-মুছে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া ভাল। 'ডিনায়াল প্ল্যান' হল একটি ছোট পুস্তিকা, বৃটিশ আমলে তৈরি। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা ঐ জাতীয় কোন ইমারজেন্সিতে শাসনযন্ত্রটিকে কি করতে হবে এতে তার বিবরণ লেখা আছে। কোন্‌টার পর কোন্ পদক্ষেপ নিতে হবে, তাও লেখা আছে। প্রয়োজনীয় কোন জিনিস, ডকুমেন্ট বা প্রতিষ্ঠান শত্রুর হাতে পড়ে গেলে দেশের ক্ষতি হতে পারে- এমন সব জিনিস নিজেদেরই নষ্ট করতে হবে বা গোপন করতে হবে, এসব কিছুই এ বইটির উপজীব্য। বইটি পড়ে যথাস্থানে রেখে দিলাম। এদিকে ভোর হয়ে গেছে। এডিএমদের এবং এসপিকে বাংলোয় আসতে বললাম। ভোর পাঁচটায় ঢাকা থেকে ফোন এলঃ "ভারত পাকিস্তানের ওপর রাতের

www.pathagar.com

অন্ধকারে হামলা চালিয়েছে। তারা ঘোষণা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করেছে। রেডিও খুলে রাখ সব সময়। প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। নির্দেশাবলীও রেডিও মাধ্যমে জারি হতে থাকবে।"

এদিকে একজন এডিএমকে জেলায় কি পরিমাণ পেট্রোল আছে খোঁজ-খবর করতে এবং পেট্রোল ও কেরোসিন সরবরাহের দিকে নজর রাখতে বললাম। অফিস-দপ্তর নিয়মিত চলবে। গুজব যাতে না রটে সে ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তী সরকারী আদেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এসপি সাহেবও নতুন কোন নির্দেশ পাননি। তবে নিরাপত্তা আইনে কিছু সন্দেহভাজন লোককে গ্রেফতারের নির্দেশ পেয়েছেন। সে বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থাও নিয়েছেন। মোটামুটিভাবে আমরা যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মোমেনশাহী জেলার ভারতের সাথে প্রায় ৮০ মাইলেরও বেশী সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে রংপুরের ডিসি ফোন করে জানালেন যে, একটা ট্রেনভর্তি সৈন্য মোমেনশাহীর উদ্দেশে রওয়ানা হচ্ছে কিন্তু রংপুরের কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই ভারতীয় প্লেন বোমা ফেলেছে। ট্রেনটি বাহাদুরাবাদ পার হয়ে মোমেনশাহী পৌঁছাতে কত সময় লাগবে তাও ডিসি জানিয়ে দিলেন।

ঢাকা থেকে নির্দেশ আসা শুরু হয়ে গেল। সারা জেলায় বিশেষ করে জেলা সদর ও মহকুমা শহরগুলোতে ব্লাক আউট-এর নির্দেশ দেয়া হল। আনসারদের সংগ্রহ করে ত্বরিত সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেয়ার হুকুমও পেলাম। কিন্তু বন্দুক কোথায়, গুলি কোথায়- এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। এসডিওদের প্রতি নির্দেশ জারি হল, তারা যেন গ্রাম এলাকা থেকে আনসারদের সংগ্রহ করে মহকুমা সদরে একত্রিত করেন। পেট্রোল স্টেশনে বলা হল যে, তারা যেন একটু সংযত হয়ে পেট্রোল বিক্রি করে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এসে অভিযোগ করলেন, পাম্পগুলো তাঁদের প্রয়োজনীয় তেল দিচ্ছে না। তাঁদের বুঝিয়ে বলা হল যে, সরকার কোন রেশন ব্যবস্থা চালু করেনি, তবে বিপদের সময় যাতে তেলের ক্রাইসিস দেখা না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। এ ব্যাখ্যায় এঁরা যে খুশী হতে পারলেন না সেটা বুঝতে পারলাম।

যা হোক, এরপর নির্দেশ এল যে, ফরিদপুর ও বরিশালের মালখানা থেকে বন্দুক আসবে এবং সেগুলো সীমান্তের আনসারদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। গুলি সম্পর্কে তখনো কোন তথ্য পেলাম না। তবে গুলি আসল একদিন পর। আর রংপুর থেকে আসা ট্রেনটি ভাগ্যগুণে বেঁচে গিয়েছিল। ভারতীয় জঙ্গী বিমান এই ট্রেনটির ওপর বোমা ফেলেছিল বাহাদুরাবাদ পৌঁছার আগেই। মজার ব্যাপার হল, সৈন্যবোঝাই ট্রেনটির আগে

www.pathagar.com

একটি খালী মাল গাড়ী পাঠান হয়েছিল আর ভারতীয় জঙ্গী বিমান হতে ঐ মাল গাড়ীটির ওপরেই বোমাবর্ষণ করা হয়।

সীমান্তের প্রতিরক্ষার প্রথম লাইনে আনসাররা অবস্থান নিল আর সৈন্যরা ছিল তাদের পশ্চাতে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর সীমান্ত পরিদর্শনে যাবার নির্দেশ এল। নির্দেশ এল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যেন কোন ক্রমেই না বাড়ে। গ্রামে-গঞ্জে যেন ক্রাইম না বাড়ে।

প্রেসিডেন্টের ভাষণ শোনার জন্য মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখেছি, উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখেছি তা কখনও ভুলবার নয়। সকাল থেকেই মানুষ রেডিও ঘিরে বসে ছিল প্রেসিডেন্টের ভাষণ শোনার জন্য। শেষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। ভাষণটি ছিল ছোট্ট কিন্তু তার প্রতিটি শব্দ দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলল। "দুশমন জানে না সে কোন্ জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। আমরা সেই জাতি যাদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে এবং যাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে কালেমা তৈয়বা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ধ্বনিত হচ্ছে। এ জাতি দুশমনের সাথে এ জিহাদে শহীদ হবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।" প্রেসিডেন্ট রাতের অন্ধকারে চুপিসারে আক্রমণকারী দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সাল। তাঁর এই ভাষণ প্রতিটি মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল নারী, পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধবণিতা ছোট-বড় সকলেই এক হয়ে গেল সকল ভেদাভেদ ভুলে। এ ছিল এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। ব্যবসায়ীরা বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ান তো দূরের কথা দাম কমিয়ে দিল। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র বিভিন্ন পেশার মানুষ সকলেই যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেল এ মুহূর্তে। এই অভূতপূর্ব অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। বিভিন্ন সংগঠন-রাজনৈতিক বা সামাজিক যাই হোক না তাদের করণীয় জানতে জেলা প্রশাসকের কাছে ছুটে এল। ছাত্র-শিক্ষকরা এল, কেউ চুপ করে বসে থাকতে চায় না। কি করতে হবে তারা জানতে চায়। ছাত্রদের বললাম, ব্লাক আউটের ব্যাপারটা তারা যেন নজরে রাখে এবং এর অন্যথা যেন না হয়, সেটা তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক ও আইনজীবীদের অনুরোধ করা হল তাঁরা যেন মানুষের মনোবল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তাঁদেরকে আরও বলা হল, গুজবের বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করতে হবে এবং শত্রু দেশের রেডিও যাতে কেউ না ধরে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এসডিওদের ডেকে বলা হল, তাঁরা যেন কঠোরভাবে নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখেন। মোমেনশাহী জেলার অন্তত তিনটি মহকুমা খুবই বিপজ্জনক অবস্থানে ছিল- জামালপুর, সদর (উত্তর) এবং নেত্রকোনা। এসব মহকুমায় সহজেই শত্রু ঢুকে পড়তে পারে। তাছাড়া প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা যে কত নাজুক তাত

www.pathagar.com

আমাদের জানাই ছিল। যুদ্ধের প্রথমদিন একটার পর একটা নির্দেশ আসতে থাকল। সেগুলোর পাঠোদ্ধার করে করণীয় ব্যবস্থাদি নিতেই প্রায় সারাটা দিন কেটে গেল। একটা কন্ট্রোল রুম নিজের বাংলোয় বসালাম। দিন রাত ২৪ ঘন্টা কাজ করার জন্য। এরপর ঢাকার কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলরুম থেকে সাইরেন ধ্বনি রিলে করে সেটা পুন প্রচারের ব্যবস্থা করা হল।

সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত সফর করতে লাগলাম। কারণ আনসারদের মনোবল ঠিক রাখতে হবে। বেচারাদের হঠাৎ করে ঘরবাড়ী থেকে তুলে এনে সীমান্ত এলাকায় কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, কোথাও কোন রকম শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়নি। এ ব্যাপারে ঢাকা রেডিওর ভূমিকা সবচেয়ে জোরদার বলে আমার মনে হয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাস, না বর্ষা না শুকনা। হঠাৎ খবর এল হালুয়াঘাট থেকে সীমান্ত রাস্তার মাঝখানে একটা জায়গা সামরিক যান চলাচলের অনুপোযুক্ত হয়ে পড়েছে বৃষ্টির পানিতে। রাত তখন ১০টা হবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সেখানে একজন অফিসারকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রাত দু'টার দিকে অফিসার ফিরে এসে জানাল যে, রাস্তাটা আসলে পানির স্রোতে এবং ট্রাক চলাচলের কারণে ভেঙ্গে গিয়েছিল। স্থানীয় লোকজন মাটি ও বালি দিয়ে সেটা মেরামত করে দিয়েছে।

এসপি সাহেব ও আমি সে রাতেই নালিতাবাড়ির বর্ডারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম একটি জরুরী প্রয়োজনে। কাজ সেরে ঠিক করলাম হালুয়াঘাট হয়ে আমরা মোমেনশাহী শহরে ফিরব। যখন হালুয়াঘাট এলাকায় এসে পৌছলাম, দেখলাম জনশূন্য সীমান্ত ঘেঁষে যে রাস্তা বরাবর চলে গেছে সে রাস্তায় এক ৮০ বছরের বৃদ্ধ একটা পোটলা নিয়ে বর্ডারের দিকে এগিয়ে আসছে। হাতে তাঁর একটা লাঠি। তাঁর কাছে পৌছে গাড়ী থামালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'চাচা মিয়া, কোথায় যাচ্ছেন?' বৃদ্ধ বললেন, 'বাবা শুনলাম সীমান্তে লড়াই হচ্ছে। অনেক সিপাহী লড়ছে। আমি একটু নাস্তা নিয়ে যাচ্ছি, ওদের খাওয়াব।' বৃদ্ধকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিরস্ত করলাম। তারপর তাঁকে গাড়িতে তুলে হালুয়াঘাট এনে ছেড়ে দিলাম।

মানুষের মনে যে জেহাদী জোশ সৃষ্টি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। রাস্তার যে ভাঙ্গা অংশটি কয়েক ঘন্টা আগে মেরামত করা হয়েছে তা দেখলাম। সাধারণ সময়ে এ ধরনের একটা কাজ করতে কয়েকদিন লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু মানুষের কর্ম-উম্মাদনার কাছে সেটা কয়েক ঘন্টার বেশী লাগেনি। কারণ মানুষ জানত এই রাস্তা মেরামত না হলে সৈন্যদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে এবং এতে করে

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষ লাভবান হবে। হালুয়াঘাটে সেনা কমান্ডারের সাথে দেখা হল। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে জেহাদী জোশ দেখে দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছেন।

শহরে ফিরলাম। ঢাকা থেকে বার্তা এল মির্জাপুর থেকে মধুপুর পর্যন্ত রাস্তাটা একদিনের জন্য বন্ধ করে দিতে হবে জরুরী প্রয়োজনে। টাঙ্গাইলের এসডিওকে সে দায়িত্ব দিলাম। তিনি অবাধে কাজটি করতে পারলেন। কেউ কোথাও বাধা দিল না বা আপত্তি করল না। নির্দেশ এল যুদ্ধবন্দী হিসাবে যাদের আটক করা হবে তাদের রাখবার জন্য একটি সাময়িক অন্তরীণের ব্যবস্থা করে অবিলম্বে তা জানাতে হবে। মুক্তাগাছা রাজবাড়ীতে সে ব্যবস্থা করা হল। বলে রাখি, এটা জেলখানা নয়, এখানে খেলাধুলাসহ সব রকমের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা হল। এর ভেতর প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ভারতীয় নাগরিককে রাখা হল। অন্যদিকে অতি গোপন নির্দেশ এল, তোমার সবচেয়ে সিনিয়র এডিএমকে "কোড" শিখিয়ে দাও। কার পরে কে দায়িত্বে থাকবে সেটার ব্যবস্থাও করে রাখ। ত্বরিত ব্যবস্থা করে ঢাকায় জানিয়ে দিলাম।

ভারতীয় রেডিও থেকে প্রচার করা হচ্ছিল যে, তাদের সৈন্যরা হালুয়াঘাট দখল করে নিয়েছে। এটা একেবারেই বানোয়াট। এই মিথ্যা প্রচারে হালুয়াঘাট এলাকার মানুষ বিভ্রান্ত না হলেও অন্য এলাকার মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু করার তো কিছু নেই।

পরবর্তী নির্দেশ এল, অতি গোপনে মধুপুর জঙ্গলে একটা এয়ার স্ট্রীপ তৈরী করতে হবে। এ কাজটা পূর্ত বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দিলাম আঞ্জাম দেয়ার জন্য। তিনি যথারীতি ব্যবস্থা নিলেন। অন্য এক নির্দেশে জানান হল, আমি যেন নিজের সদর দপ্তর জেলার অভ্যন্তরে কোথাও স্থানান্তর করার জন্য প্রস্তুত থাকি। সেদিনই সন্ধ্যায় শহর থেকে ছ-সাত মাইল দূরে একটা স্কুল নির্দিষ্ট করে এলাম। প্রয়োজনে এটাকে আমি আমার অফিস হিসাবে ব্যবহার করব। আমি ও ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আব্দুল আলী দু'জনে দুটি সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম জায়গা দেখতে। রাতে আরেকটি নির্দেশ এল যে, ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্রেজারি আসছে, তার হেফাজত করতে হবে। ভোরে আরেকটি নির্দেশ পেলাম যে, নিজের ট্রেজারি কোন গোপন স্থানে সরানর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এরই পরপর বলা হল যে, আমি শত্রু পক্ষ দ্বারা অপহৃত হলে আমার জায়গায় পরপর দায়িত্ব পালন করবে এমন সাত জনের নাম পাঠাতে হবে। এ নির্দেশে এও বলা হল যে, এখন থেকে তোমাকে ১৪তম আর্মি ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হল। এখন থেকে তাদের নির্দেশেই কাজ করতে হবে। এমনকি ক্যাপচার্ড হবার পরও। বার্তার শেষ অংশটা বুঝতে কষ্ট হল।

www.pathagar.com

সকালে এসে হাজির হলেন চৌদ্দতম আর্মি ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ফজলে মুকিম খান। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা সীমান্তের উদ্দেশ্যে বের হলাম। কিন্তু মোমেনশাহীর কেন্দ্রীয় কারগারের প্রধান কর্মকর্তা হঠাৎ একটা জরুরী মেসেজ নিয়ে আসায় সফর কিছুটা বিলম্বিত হল।

আমাকে তৎক্ষণাত যেতে হল কারাগার পরিদর্শনে। জেলের প্রধান কর্মকর্তা বললেন, কয়েদীরা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওরা আপনাকে কিছু বলতে চায়। কয়েদীরা যা বলল তা শুনে আমি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ওরা সব যুদ্ধে যেতে চায়। বলছে, দেশ আক্রান্ত, আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারিনা। আমাদের সে অনুমতি দিতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে আমরা বন্ড সই করতে রাজি। কিন্তু আমাদের অনুমতি না দিলে আমরা আমরণ অনশন করব। ওদের দেশপ্রেমে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

ওদের আশ্বস্ত করে বললাম, আপনারা নিশ্চয়ই শত্রুর মোকাবিলা করবেন, যুদ্ধে অংশ নেবেন। তবে কিভাবে সে কাজে অংশ নেবেন তা জেইলর সাহেব পরে বলবেন।

সীমান্তে এসে জিওসি সাহেব বিভিন্ন বাংকার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, সৈন্যদের সাথে মত বিনিময় করতে লাগলেন। আমাকে তিনি পরিচয়ও করিয়ে দিচ্ছিলেন সবার সাথে।

ট্রেঞ্চগুলোতে পানি নেই তবে কাদা জমে আছে। সিপাইরা অবলীলায় তাতেই অবস্থান করছে। এক বাংকারে এক কম্পানি কমান্ডার কে দেখলাম আমাদের বেরুবার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখ তার লাল। জিওসি সাহেবকে বার বার বলছে, 'সাব, হুকুম কি জিয়ে।' ফজলে মুকিম খান সহাস্যে বললেন, 'হুকুম তো ডিসি সাহাব দেয়েঙ্গে- ম্যায় নেহি।' মনে মনে চমকে উঠলাম, আমি কি হুকুম দেব? নিজের মনোভাব চেপে রেখে কমান্ডারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালামঃ কিসের হুকুম ভাই? সে বলল, 'সাব, হাম লোগ আগে বাড়না চাহতে হায়। আজ তিনদিন আমরা এখানে বসে আছি। হুকুম পেলে আমরা এতক্ষণ তুরা পৌঁছে ওখানে ক্যাম্প করতে পারতাম। আমাদের আগে বাড়বার অনুমতি দিন।' তার কথা শেষ হলে জিওসির দিকে তাকালাম। তিনি নিশ্চুপ, অভিব্যক্তিহীন। বুঝলাম, জিওসি চান আমি কিছু বলি।

কমান্ডারকে বললাম, 'আপনি একা এগিয়ে গেলে বা আপনার একটা মাত্র কম্পানী ফরওয়ার্ড মার্চ করলে আমাদের লক্ষ্য হাসিল হবে না। সব কম্পানীকে একযোগে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই আমাদের এখানে আসা। সবাই প্রস্তুত হবার পর সংকেত পাবেন, তখন নিশ্চয়ই সম্মুখে অগ্রসর হবেন। আমরাও আপনাদের সাথে থাকব, ইনশাল্লাহ্।'

www.pathagar.com

আমার কথায় কমান্ডার খুব একটা আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। সে জানতে চাইলঃ ' কেতনা দের হোগা, বহুত জিয়াদা তো নেহি?'

বাংকার থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমরা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হলাম। কারণ কমান্ডারের আচরণ আমার মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। অথচ তাকে ফেস করার জন্য জিওসি সাহেব আমাকে লাগিয়ে দিলেন। এ জন্য আমি মনে মনে তাঁর উপর বিরক্ত। আমার এ রকম আশঙ্কাও হয়েছিল যে শত্রু নিধনের নেশায় বুদ ঐ কমান্ডার তার অপছন্দনীয় কোন কথার জন্য আমাদের উপরও তার হাতের অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে। হঠাৎ জিওসি আমাকে বললেন, 'ডিসি', আপনার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না। আপনি চমৎকারভাবে একটা নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন।' খুব সাধারণভাবে কথাগুলো বললেন তিনি। এটা প্রশংসা না সুক্ষ্ম কৌতুক, ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে এটা বুঝলাম যে তিনি আমাকে বাজিয়ে নিচ্ছেন। হঠাৎ আমার খুব রাগ হল তাঁর উপর, কিন্তু এটা রাগের সময় নয়। তা ছাড়া আমি এখন তাদের সাথে কাজ করছি।

শহরে ফিরে এসে শুনলাম, ভারতীয় রেডিও ঘোষণা করেছে যে মোমেনশাহী জেলার তিনটি থানা– হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী ও দূর্গাপুর তাদের দখলে চলে গেছে এবং মোমেনশাহীর ডিসিকে ভারতীয় সৈন্যরা বন্দি করেছে। আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। হেডমাস্টার সাহেব স্কুল ছুটি দিয়ে সরকারী নির্দেশে ছাতাওয়ালা কলের গানে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রচারণামূলক রেকর্ড বাজিয়ে ছাত্রদের শোনাতেন। একটা রেকর্ডের কথা এখনো মনে আছেঃ জাপানীরা আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলে কাঁচাই–রান্না করে না।' ভারতীয় অপপ্রচারের নমুনাটা সেই রকমই।

জামালপুরের গজনি সীমান্তে একদিন গেলাম পরিদর্শনে। দেখলাম কয়েকজন নেপালী সৈন্য ভারতীয় এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। আমাদের এক সাথী চিৎকার করে নেপালী সৈন্যদের জিজ্ঞেস করলঃ 'তোমাদের সাথে আমাদের এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক অথচ তোমরা আমাদের মারতে এসেছ– ব্যাপারটা কি?' ওরা জবাব দিলঃ 'আমরা চাকরি করি ভাই।' হঠাৎ একজন সিপাহী আমাদের কাছে ছুটে এসে বলল, ভারতীয়রা তাদের 'বাদর বাহিনী' ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এখনি এখান থেকে সরে যাওয়া ভাল।

সতের দিনের এই যুদ্ধে আমাদের হয়েছে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। কোন্‌টা বলব আর কোনটা বলব না, সেটাই হল সমস্যা। তবে সব কিছুর বর্ণনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়।

সতের দিন পর যুদ্ধ বিরতি হল। যুদ্ধ কালে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ করে সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যে অবদান রেখেছেন, তার তুলনা হয় না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সব কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পশ্চিম পাকিস্তানে সফরে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের লেখায়, কাব্যে, গানে যে অনুভূতি তুলে ধরেছিলেন তা যে কোন জাতির জন্য গর্ব ও গৌরবের বস্তু। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের শিল্পীরা তাঁদের গানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন ভারতীয়রা তা দেখে শুধু অবাকই হয়নি, অভিযোগ করে ছিল যে দীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া এ ধরণের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। দলমত নির্বিশেষে সবাই সেদিন এক কাতারে শামিল হয়েছিল। তবে একটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ছিল রহস্যময়। এ দলটি ভারতকে ধিক্কার দিতে একবারও মুখ খুলেনি। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, সাময়িকীতে এর প্রমাণ মিলবে?

মানুষের দেশপ্রেম, একতা, নিষ্ঠা ও ঈমানের দৃঢ়তা দুশমনকে হতবাক করে দিয়েছিল– এতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী বছর গুলোতে এই একতা বিনষ্ট করতে দুশমন কিছুই বাকী রাখেনি।

যুদ্ধ শেষে গভর্ণর মোনেম খান এলেন মোমেনশাহী জেলা সফরে। যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক অজানা কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন এক বৈঠকে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা আমাদের উপস্থিত সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ–যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে যখন পূর্ব পাকিস্তান কার্যত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন– তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি (মোনেম খান) যদি এই সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তবে তাঁর দল সর্বোতোভাবে তাঁকে সমর্থন দেবে। আর এটা শুধু নৈতিক বা আনুষ্ঠানিক সমর্থনই হবে না; হবে সর্বাত্মক সমর্থন। যুদ্ধাবস্থায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এই জন্য জনাব খান বিষয়টি চেপে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি বিষয়টি পিন্ডিকে জানিয়েছেন।

যুদ্ধে যে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ অকুণ্ঠভাবে সরকারকে সমর্থন দিয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভিন্ন চিন্তাও যে কাজ করছিল তার প্রমাণ মিলে মোনেম খান সাহেব বর্ণিত ঘটনায়। যুদ্ধকালে যতটা আমরা টের পেয়েছিলাম তাতে চীন ও ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানকে ব্যাপক সাহায্য–সহযোগিতা করেছিল। এ কথাও উপলব্ধি করা গেছে যে পূর্ব পাকিস্তান গুরুতরভাবে আক্রান্ত হলে অবস্থা ভয়ানকরূপ নিতে পারত। স্বভাবতই সেই পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হত এবং মানুষের কষ্ট ও দুর্ভোগের শেষ থাকত না।

যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা শুনে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ খুব একটা খুশী হতে পারেনি। দুশমনকে খতম না করে যুদ্ধ বন্ধ ঠিক হয়নি বলে মানুষজন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। মার্কিনরা যথেষ্ট সাহায্য করেনি বলেও সাধারণ মানুষ অভিযোগ করেছে। শহরের শিক্ষিত মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্নঃ – যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে– বাঁচা গেল।

www.pathagar.com

পয়ষট্টির যুদ্ধের সবচেয়ে দুঃখজনক দিক ছিলঃ ভারতের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধের ফলে যে অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ধরে রাখা যায় নি। সেই ব্যর্থতার মারাত্মক ফল আমরা প্রত্যক্ষ করেছি পরবর্তীকালে।

গভর্নর মোনেম খানের সফর সঙ্গী ছিলেন একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ও একজন সিনিয়র ডাক্তার। আমাদের এবারের সফরটা ছিল মেরী এন্ডারসন স্টিমারে। এসপি সাহেব ও আমি এ সফরে শামিল ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গভর্ণর সাহেবকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে বিভিন্ন সার্ভিস থেকে সেক্রেটারী নিয়োগের উপকারিতা কি। ডাক্তার সাহেব সমর্থন যোগাচ্ছিলেন।

মোনেম খান সাহেব এ ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলেন। বললাম, 'স্যার এটা গুরুতর ক্লাস ফাইট–গোষ্ঠী সংঘর্ষ। আমার পেশায় আমি একজন অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, সুতরাং আমার এ ব্যাপারে কি মন্তব্য করা ঠিক হবে?' গভর্ণর সাহেব হেসে বললেন, 'আপনার ব্যক্তিগত মতামতটাই বলুন দেখি।' বুঝলাম পরিত্রানের উপায় নেই, কিছু বলতেই হবে। বললাম, 'স্যার, আমি মনে করি যে, যে যার পেশায় নিয়োজিত থাকুন। প্রত্যেক পেশার লোকের মর্যাদা সমান হোক– এটাই আমার কাম্য। আমাকে পেশাগতভাবে আমার পেশার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে– আমি কর্মজীবনে নিজ পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছি; ঘাত–প্রতিঘাতে নতুন নতুন বাস্তব শিক্ষাও পাচ্ছি– এখন হঠাৎ করে যদি আমাকে বলা হয় যে একজন মুমূর্ষ রোগীর অপারেশন করতে হবে অথবা একটা বহুতল ইমারতের ফাউন্ডেশন কেমন হবে ঠিক করে দাও– এ সব ক্ষেত্রে আমি অপদার্থই প্রমাণ হব। তেমনি একজন ইঞ্জিনিয়ার স্বাভাবিক কারণেই সুষ্ঠুভাবে একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ চালাতে পারবেন না। প্রশ্ন থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের সেক্রেটারী একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে দোষ কি? এখানে পাল্টা প্রশ্ন করব একজন সেক্রেটারীর কাজ কি? আমাদের তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। অভিজ্ঞতা আর পেশাগত শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতার আলোকে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে– কোন একটি বিষয়ের উপর। পেশাদার হিসাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার পেশাগত পরিপক্ক সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিতে পারবেন কিন্তু সার্বিক পারিপার্শ্বিকতার বিচারে কতটুকু বাস্তব সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারবেন, সেটা অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের রয়েছে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। একজন ভিন্ন পেশার প্রবীন ব্যক্তিত্বকে প্রধান সচিবের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি ফাইলে কিছু লিখে তা কাটতেন, সিদ্ধান্ত বদলাতেন। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত কেটে তৃতীয় সিদ্ধান্ত টাইপ করে তা পেষ্ট করে দিতেন কাটা লেখার উপর। অথচ সচিবালয়ের রুলস অব প্রসিডিওরের একটি মৌলিক নির্দেশ হচ্ছে– নোট শিটে লেখা কোন মন্তব্য বা আদেশ কোন ক্রমেই কাটা যাবে না এবং লেখার উপর কাগজ সাঁটা একেবারেই নিষিদ্ধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গ করছেন প্রধান সচিব নিজে।'

www.pathagar.com

আমি গভর্ণর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'স্যার, উদাহরণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। অন্য পেশার অফিসারদের প্রয়োজনে বিশেষ বেতন ও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সবাইকে সেক্রেটারী হতে হবে, এমন কোন কথা নেই।' এই বলে আমি আমার কথা শেষ করলাম যে একথাগুলো বললাম আমি আমার সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে। গভর্ণর সাহেব ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনলেন তো একজন সিভিল সার্ভেন্টের কথা।

আমার বিশ্লেষণ যে কারোরই কোন কাজে আসিনি–পরবর্তীতে তা লক্ষ্য করেছি। এর সঙ্গে এও যোগ হতে দেখেছি যে প্রেসিডেন্ট আর গভর্ণরের সফরের সময় পেশাদার আমলারা ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতায় কোন কিছুই করতে বাদ রাখতেন না। এ জন্য প্লেন উড়িয়ে তাঁদের মাথায় গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ করতে যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি তাঁদের খুশীর জন্য রাস্তার দু'পাশে সম্বর্ধনার নামে যুবতী মেয়েদের নাচাতে ও গাওয়াতে। দেখেছি তোষামোদের প্রতিযোগিতা।

তোষামোদের কথাই যখন উঠল, এখানে বলে রাখি, চাটুকারীতার প্রতিযোগিতায় সকল পেশার লোককেই অংশ গ্রহণ করতে দেখেছি। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এখানে একটা ঘটনা বলি। একদিন আমার এক পূর্ব পরিচিত ভদ্রলোক, যিনি শিক্ষা বিভাগে কর্মরত, বরিশাল থেকে ফোন করে জানালেন তিনি মোমেনশাহী আসছেন। তাঁর অবস্থানকালে তিনি আমার সাথেও দেখা করতে চান। আমিও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছি এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এ পেশার প্রতি সব সময়ই ছিল আমার দুর্বলতা। কাজেই তাঁর সাথে দেখা করার একটা আগ্রহ আমার মধ্যেও জেগে উঠল।

মুশকিল হল ভদ্রলোক যেদিন আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন ঐ একই দিন গভর্নর মোনেম খানও মোমেনশাহী সফরে আসছেন। বলা বাহুল্য, আমি গভর্নরের সফর নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু তবুও শিক্ষক ভদ্রলোকের সাথে একটা মোলাকাতের সুময় বের করে নিলাম। ভদ্রলোক তখন বরিশাল বি এম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় অথবা মোমেনশাহীর এ এম কলেজে বদলি হয়ে আসতে চান। বুঝতে পারলাম এটা তাঁর নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়। আসলে তিনি আমার কাছে তদবিরে এসেছেন। তিনি আমাকে সরাসরি বললেন আমি যেন গভর্নর সাহেবকে বলে এই বদলির ব্যবস্থা করে দেই। আমি তাঁকে কোন মিথ্যা আশ্বাস না দিয়ে সত্য কথাটাই বলে দিলাম। বললাম, আমি কারো জন্যই এ পর্যন্ত কোন তদবির করিনি। তা ছাড়া এ এম কলেজটি গভর্নর সাহেবের নিজের শহরে তাই এ ব্যাপারে হয়তো বা তাঁর নিজস্ব কোন চিন্তা–ভাবনা আছে। সুতরাং অনুরোধ করে ফল নাও পাওয়া যেতে পারে। ভাল হয় যদি তিনি গভর্নর সাহেবকে আমার উপস্থিতিতে প্রস্তাবটি দেন এবং গভর্নর সাহেব যদি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করেন তাহলে আমি তাঁর পক্ষেই আমার মতামত জানিয়ে দেব।

গভর্নর সাহেব মফঃস্বলে একটি প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে তাঁর মোমেনশাহী শহরের বাড়ীর বসবার ঘরে এসে বসলেন। আমরা তাঁর আসবার আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। ওখানে আরো দশবারো জন লোক হাজির ছিলেন। মোনেম খান সাহেব একটা সোফাতে আসন গ্রহণ করার সাথে সাথেই অধ্যক্ষ ভদ্রলোক আমাদের সবাইকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিয়ে গালিচায় বসে পড়ে গভর্নরের পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করলেন এবং ঐ অবস্থাতেই বিনীত কণ্ঠে তাঁর আর্জিটাও পেশ করলেন। গভর্নর সাহেবও হঠাৎ সাপ দেখে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, তেমনি লাফিয়ে উঠে পড়ে বললেন আরে করেন কি করেন কি সাহেব, আপনি একজন প্রিন্সিপাল, এটা কি করছেন!

দুর্ভাগ্যের বিষয় এতকিছু করেও অধ্যক্ষ সাহেব আমার থাকাকালীন সময়ে এ এম কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে মোমেনশাহীতে আসতে পারেন নি। একজন উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক এবং একটি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল যে সামান্য একটি বদলির ব্যাপার নিয়ে গভর্নরের পায়ে পড়তে পারেন এটা ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই ভদ্রলোকই আজকাল দেশের সেরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একজন হিসাবে পরিচিত এবং মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে নানা বিষয়ে বুদ্ধিব্যবসায়ীরা যে সব বিবৃতি দিয়ে থাকেন তাঁর নামটা গোড়ার দিকেই দেখা যায়। শিক্ষকদের চরিত্রের গুনাগুন অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমবেশী প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আজকে শিক্ষাঙ্গনে যে নৈরাজ্য এবং হতাশা এর পেছনে শিক্ষক নামের এইসব মেরুদণ্ডহীন চাটুকারদের ভূমিকাই যে দায়ী তাতে আর সন্দেহ নেই।

শুধু শিক্ষকই নন, কোন কোন সরকারী অফিসারকেও দেখেছি শাসক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের অবলীলায় বিকিয়ে দিতে। ফলে প্রশাসন যন্ত্রে নানা রকম বিশৃংখলা এবং পক্ষপাতদুষ্টতা দেখা দিয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে শক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত না কারণ তদবির পার্টির খুটীর জোর ছিলো অনেক বেশী।

হঠাৎ একদিন ঢাকা থেকে ফোন পেলাম চিফ সেক্রেটারী আলী আসগর সাহেব মোমেনশাহী ট্যুরে আসবেন। অনেক আগে তিনি এই জেলায় ডি এম ছিলেন। তাঁর অবস্থানকালে গারো পাহাড়ী অঞ্চলে হাজং উপজাতিরা বিদ্রোহ করে সীমান্তের ওপারে পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে আসগর সাহেব বেশ কিছুদিন পেরেশানীতে ছিলেন। এ গল্পটা মোনেম খান সাহেব এবং স্বয়ং আলী আসগর সাহেবের মুখ থেকে শোনা। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তাঁর এই সফরের হেতুটা কি? মনে মনে ভাবলাম এখানে তো তেমন কিছু অবস্থা নেই যে স্বয়ং চিফ সেক্রেটারীকে আসতে হবে। তা ছাড়া নিয়মমাফিক কোন সফর সূচীও পাইনি। ব্যাপারটা কেমন গন্ডগোলে মনে হল।

www.pathagar.com

যাইহোক নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে সকালে না এসে চিফ সেক্রেটারী সাহেব এলেন সন্ধ্যার বেশ পরে। আমরা সারাদিন তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। ভদ্রলোক এমনিতে বেশী লোকজন পছন্দ করেন না তাই তাঁর আগমনের পর আমি আর এসপি সাহেব সার্কিট হাউজে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। এসপি সাহেবকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় করলেন। তিনিও সালাম জানিয়ে কেটে পড়লেন। থাকলাম আমি একা। জানতে চাইলাম যে তাঁর প্রোগ্রাম কি? বললেন, কাল তিনি হালুয়াঘাট বর্ডার হয়ে জামালপুর ঘুরে ফিরে আসবেন এবং সন্ধ্যার পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। এটাও আমাকে জানিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে কারো থাকবার দরকার নেই। এমনকি পুলিশেরও দরকার হবে না। তাঁর এই আচরণে আমি একটু অবাক হলাম বই কি।

তিনি ফিরলেন বেশ দেরীতে। জানতে পারলাম শহরে ফেরার আগে মধুপুরের এক ডাক বাংলোয় বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন। রাতে তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের সাথে দেখা করলেন আমাকে নিয়ে। ফিরে আমার বাংলোয় (যেখানে এককালে তিনিও ছিলেন) উঠলেন। হঠাৎ বললেন, 'নাজির, লাট সাহেব তোমাকে ঢাকায় চান। আমার মনে হয় ঢাকা তোমার জন্য ঠিকই হবে। ঢাকা জেলার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।' কথাটা শুনে আমার মনে হল আমার মাথায় বাজ পড়ল। জোরেসোরে বললাম, 'স্যার, জেলায় তো পাঁচ বছর কাজ করলাম। আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। আমি এখন মাফ চাই, আমাকে বরং ওএসডি করে নিয়ে চলুন। তিনি আমার কথায় কোন আমল না দিয়ে বললেন, 'এটা গভর্নর সাহেব চাচ্ছেন আর আমার মনে হয় এটা তোমার জন্য ঠিক হবে।' আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য হয়তো বললেন, 'নাজির, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।' আমি জানতাম, ভদ্রলোক কম কথা বলেন। তাই তাঁকে আর ঘাটতে চাইলাম না। ওঠবার আগে শুধু জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, কবে যেতে হবে আমাকে?' তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সময় মত জানতে পারবে।' ফিরে এসে সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। অথচ একটা সময় ছিল যখন এই সুখ-চিন্তায় রাতের ঘুম নষ্ট হত যে কখন জেলার দায়িত্ব পাব? আর আজ দু'টো বড় জেলার দায়িত্ব পালনের পর তৃতীয় জেলা, তাও আবার প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে আমার খুশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর আগের সেই থ্রিল অনুভব করিনা। কাজের চাপ ও নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে নতুন দায়িত্বের কথা শুনলে মন বিষিয়ে উঠে। কিন্তু চাকরী জীবনে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্বই বা কতটুকু?

সকালে আলী আসগর সাহেবকে বিদায় জানাতে গেলাম সার্কিট হাউজে। তিনি আমাকে দেখেই নাটকীয়ভাবে বললেন, 'নাজির, তুমি তোমার বদলির অর্ডারটি পেয়ে গেছ নিশ্চয়ই?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'স্যার, কাল রাত দশটার দিকে আপনি আমাকে ব্যাপারটা জানালেন মাত্র। এ ক ঘন্টার মধ্যেই কি অর্ডার এসে যাবে?' তিনি

www.pathagar.com

খুব জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এক ঘন্টার মধ্যেই অর্ডার এসে যাবার কথা। আমি সে রকম ব্যবস্থাই করে এসেছি। তবে তুমি অর্ডার বাতিলের কোন আবেদন করবে না। কারণ এতে কোন লাভ হবে না। আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত তোমাকে ঢাকায় যেতে হবে।'

মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার বিরুদ্ধে কিছু ঘটে গেলে সম্ভবত এ রকমই হয় যা সেদিন আমার হয়েছিল– প্রচণ্ড বিষন্নতা। তবে এটাও আমি প্রায় হলফ করে বলতে পারি যে ঢাকায় ডি সি হিসাবে পোষ্টিং পাবার আকাঙ্খা আমার সহকর্মীদের প্রায় সবার মধ্যেই প্রবল ছিল। আর এটা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ ঢাকা এ প্রদেশের প্রায় কেন্দ্র।

আলী আসগর সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, ত্বরিত অর্ডার পেয়ে গেলাম। এই অবস্থায় হঠাৎ ডিকে পাওয়ার (ডেভিড খালেদ) সাহেবের ফোন পেলাম। মোমেনশাহীতে অবস্থানকালে চিফ সেক্রেটারীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে মোটামুটি একটা ধারণা দিলাম। মধুপুর ডাক বাংলোয় আলী আসগর সাহেবের যাবার কথা শুনে পাওয়ার সাহেব চটে গেলেন মনে হল। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে চিফ সেক্রেটারীর মোমেনশাহী সফরের ভেদটা বলে দিলেন। বললেন, ক'দিন আগে মির্জাপুরের আর পি সাহা লণ্ডন থেকে আলী আসগর সাহেবকে ফোন করে তোমার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছেন। যখন ফোনে কথা হয় তখন আমি তাঁর কামরায় উপস্থিত ছিলাম। পাওয়ার সাহেব এও জানালেন যে, এই আর পি সাহার কারণে চিফ সেক্রেটারী এন এম খান আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মোমেনশাহী থেকে বদলি করে দিয়েছিলেন। তুমি আর পি সাহাকে চটিয়েছ, সুতরাং তোমার পক্ষে আর মোমেনশাহী থাকা সম্ভব নয়। তোমাকে এ ব্যাপারে আগামীতেও হেকমতের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ আর পি সাহার দৌড় অনেক উঁচুতে। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, আগামীতে কি হবে সে দেখা যাবে। আমার তো বদলির অর্ডার হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তবে যাবার আগে সাহার হাসপাতালের দোহাই দিয়ে যে বিদেশী মদের কৌটা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল বাস্তব কারণ দেখিয়ে তা আমি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি। এ জন্য আমি আনন্দিত। কারণ ঢাকা থেকে সপ্তাহান্তে বড় বড় সরকারী চাঁইরা যাঁরা সুরার লোভে মির্জাপুর এসে ভীড় করতেন, তাঁরা এখন অনেকটা হতাশ হবেন। অবশ্য এ কথা সত্য, সুরার সাথে এখানে আর যা যা চলে তার সব কিছু বন্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমাদের অনেক কর্তা ব্যক্তিই এ সবের সাথে জড়িত। আমি আরো বললাম, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর পি সাহার তিন কোটি টাকার কর অনাদায়ী এবং একজন কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য এসেছিলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। আর এ ঘটনাটা ঘটেছে আমার সময়কালে। পাওয়ার সাহেব নীরবে এতক্ষণ আমার কথা শুনছিলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'আই উইশ ইউ গুড লাক'।

www.pathagar.com

কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলতে দ্বিধা করবে না। রিসিভার রাখতে রাখতে ভাবলাম, প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারী ইতিমধ্যে যাঁর পেছনে লেগে পড়েছেন পাওয়ার তাঁর কি কাজে আসবেন? তবু মনে মনে তাঁর সহানুভূতির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। কেন যেন ডেভিড খালেদ পাওয়ারের ফোন পাওয়ার পর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। যে বিষন্নতা আমাকে গ্রাস করেছিল তা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

আগে বলা হয়নি, ইনি ছিলেন একজন ইংরেজ আই সি এস। ইসলাম কবুল করে নতুন নাম গ্রহণ করেন– ডেভিড খালেদ পাওয়ার। তিনি প্রাদেশিক সরকারের একজন সেক্রেটারী হিসাবে কর্মরত ছিল।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে চিফ সেক্রেটারী আলী আসগর সাহেবের আকস্মিক মোমেনশাহী সফর এবং আমার ঢাকায় বদলি– প্রায় এই এক সপ্তাহকালীন সময়ের মধ্যে আমি লাট সাহেবের কোন ফোন পাইনি।

www.pathagar.com

টেলিফোন বয়

অবশেষে নতুন দায়িত্ব নিয়ে ঢাকা পৌঁছলাম। কিন্তু সাথে সাথেই সরকারী বাসভবনে উঠতে পারলাম না। কারণ সরকারী বাড়ী খালি হয় নি। ভাড়া বাড়ীতে কতদিন থাকতে হবে কে জানে। আমরা কিছু কিছু মানুষ আছি যারা অন্যের অসুবিধা টসুবিধার দিকে বিশেষ বড় একটা খেয়াল করি না। বদলি হবার পরও কারো কারো আগের পোষ্টের সুবিধাদি ছাড়তে একটু বেশী মায়া লাগে।

যাই হোক ভাড়া বাড়ীতে থেকেই ঢাকার ডিসির দায়িত্ব পালন করতে লাগলাম। সরকারী বাড়ীর প্রতি আমার তেমন কোন মোহ ছিল না। তবে, ডিসির বাড়ীতে তা সে যত অসুবিধারই হোক- কতগুলো জিনিস থাকে- যেমন গোপন অফিস এবং অন্যান্য কিছু আয়োজন। এসব জিনিস অন্যত্র সরানো সম্ভব নয়। এই গোপন অফিস প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে, বিশেষ করে ঢাকায়।

ভাড়া বাড়ীতে তো মাথা গুঁজলাম। বাচ্চাদের স্কুলে আনা-নেওয়ার ব্যাপারে গাড়ী পাই কোথায়? সরকারী গাড়ী আছে, কিন্তু তা ব্যবহার করলে যে ভাড়া দিতে হবে, তা আদায় করা আমার সাধ্যের বাইরে।

তখন সরকারীভাবে গাড়ী আমদানী করে পারমিট দেওয়া হত। সবার নজর থাকত ছোট গাড়ী ফোক্সওয়াগন-এর দিকে। পারমিট দেবার জন্যএকটা কমিটি ছিল। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অতিরিক্ত চিফ সেক্রেটারী এবং সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী। একটা দরখাস্ত পাঠালাম কমিটির সচিব বরাবরে এবং চেয়ারম্যানের কাছে গেলাম তদবির নিয়ে। চেয়ারম্যান হাসান তোরাব আলী সাহেবকে বললাম, 'স্যার, গাড়ী যদি না পাই তবে সরকারী গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার হবেই এবং তাতে আমি অভিযুক্ত হব। সুতরাং আমাকে ফোক্সওয়াগন মঞ্জুর করা হোক।' চেয়ারসম্যান সাহেব বললেন, 'ডিসি ঢাকা যে গাড়ীতে হাত দেবেন সেটাই সরকারী হয়ে যাবে। কাজেই ডিসির কোন নিজস্ব গাড়ীর প্রয়োজন নেই।' এই অদ্ভুত জবাব শুনে চলে আসতে হল, গাড়ী ভাগ্যে জুটল না।

সে বছরই নাভানা টয়োটা আমদানী শুরু করেছে। সরকার থেকে গাড়ী বাবদ যে লোন পাবো ওটার দাম ছিল প্রায় তার সমান। সেই গাড়ী একটা একদিন কিনে ফেললাম। গাড়ী দেখে মোনেম খান সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'এই দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা আপনি পয়সা দিয়ে কিনেছেন? জাপানী জিনিস ঠুনকো- ক'দিন

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে পারবেন এটা?'

সারা শহর অতিক্রম করে সদর ঘাটের কাছে ডিসির অফিসে যেতে হত দিনে কয়েকবার। রাস্তায় ভীড়ের অবস্থা বর্তমানের চেয়ে সে সময় কোন অংশে কম ছিল না। এখন ওয়ানওয়ে হয়েছে নবাবপুরের রাস্তা, তখন তা ছিল না।

অফিসে বসে কাজ শুরু করতে হল অনেকটা নিজের ধারণা থেকে। কারণ আমি আমার পূর্বসূরির কাছ থেকে 'হ্যাণ্ডিং ওভার নোট' পাইনি। অফিস চলাকালীন সময়ে সেক্রেটারীয়েট থেকে প্রচুর ফোন পেতাম। অধিকাংশই থাকতো ওপরওয়ালাদের বিভিন্ন ফরমায়েশের। গভর্নর হাউজ থেকেও অনেক ফোন পেতাম। বিভিন্ন মিটিং-এর এত্তেলা দেওয়া হত। অথবা জরুরী তলব করা হত এসব ফোনে। এটা ছিল নিত্য দিনের ব্যাপার। এছাড়াও লাট সাহেব শহর বা শহরতলীতে পরিদর্শনে বেরুলে তার ব্যবস্থা করা ও সঙ্গে থাকা-দুটো কাজই আমাকে করতে হত। এ সবের পাশাপাশি আরো কতগুলো সমস্যা মোকাবেলা করতে হত। যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র আন্দোলন; ঢাকা শহরের আশেপাশের শিল্প এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষ, যানবাহন ধর্মঘট ইত্যাদি। এর সাথে যুক্ত হত ছোট বড় মাঝারী ভিআইপিদের সফর, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং পল্টন ময়দান। কিন্তু সবার উপর ছিল টেলিফোন। যাঁরা ঢাকায় ডিসি বা ডি এম ছিলেন শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন টেলিফোন তাঁদের জীবনের শান্তি কতটা কেড়ে নিয়েছিল।

অফিসে বসে কাজ শুরু করতে না করতেই সেক্রেটারীয়েট থেকে ফোনে ফরমায়েশ আসতে শুরু হল। বোর্ড অফ রেভিনিউর সিনিয়র মেম্বর ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বললেন, 'তোমার অফিসের অফিস সুপারেনটেনডেন্টকে দিনাজপুর বদলি করা হয়েছে। কিন্তু সে যাবে না সেখানে। শুধু তাই নয়, সে মুন্সেফ কোর্টে ডিসির বিরুদ্ধে মামলা করে দিয়েছে যাতে বদলির আদেশটি রদ হয়ে যায়। তাকে অন্য কোথাও বদলি করা যাচ্ছে না। কারণ, ঢাকা ও দিনাজপুর ছাড়া অন্য সব জেলায় ঐ পদটি বিলোপ করে এডমিনিষ্ট্রিটিভ অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।' তিনি রসিকতা করে বললেন, 'তুমি যদি এ লোকটিকে বদলি করতে পার তা হলে তোমাকে সুপ প্লেটের মত একটা বড় মেডেল দেব।' মেম্বর সাহেবকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'চেষ্টা করবো স্যার। তবে কোর্টের আদেশ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।' তিনি বললেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যেই কোর্টের আদেশ হয়ে যাবে।' কিন্তু তিনি টেলিফোন ছাড়লেন না। লোকটি সম্পর্কে আরো কিছু কথা বললেন ক্ষোভের সঙ্গে। বললেন, 'একই জায়গায় একই পদে দীর্ঘদিন থাকার কারণে ভদ্রলোক সরকারী উকিলকেও প্রভাবিত করেছেন যাতে তাঁর প্লিডিংটা দুর্বল হয়।'

রেভিনিউ বোর্ডের আর এক সদস্য আর একদিন ডেকে পাঠালেন। গেলাম।

www.pathagar.com

বললেন, 'জিপিও-র পশ্চিম পাশে এক ফালি খালি জায়গা পড়ে আছে যাতে খুব আজে বাজে কাজ হয়। যদি ওটাকে একটু ঠিকঠাক করে একটা ছোট পার্কের মত করে দিতে পার তবে একটা কাজের কাজ হয়।' সি এণ্ড এ-এর সহযোগিতায় জায়গাটা ঠিকঠাক করে 'পার্ক কর্ণার' তৈরী করা হয়েছিল। মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে (এটাই এখন মুক্তাঙ্গন হিসাবে পরিচিত)।

অনুরোধ বা হুকুম যাই বলুন- এভাবেই আসত। কাজ করতে পারলে তো ভালই, না করতে পারলেই মুশকিল। উচ্চ পর্যায়ের প্রতিটি মিটিং-এ বিষয়টি ওঠবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কাজটি সম্পন্ন না হবে ডিসির অযোগ্যতা বাড়তেই থাকবে। আর, এসব মিটিং-এ ডিসিই হলেন সবচেয়ে ছোট অফিসার। সুতরাং কাজ যত কঠিনই হোক, করতেই হবে।

একদিন অফিসে আধবয়সী এক লোক হঠাৎ করে আমার কামরায় ঢুকে পড়ল। অনুমতি-স্লিপ ছাড়াই ঢুকে পড়ায় আমি তার দিকে অবাক হয় তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে, কি চান?' লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'স্যার, আমি আপনার ও,এস। আমাকে দিনাজপুর বদলি করা হয়েছিল অন্যায়ভাবে। আমি আগের ডিসির আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলাম মুন্সেফ কোর্টে। মামলার রায় বেরিয়েছে, আমি জিতেছি। তাই এখন আমি কাজে যোগ দিতে এসেছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সরাসরি ওপরওয়ালা কে?' তিনি জানালেন, 'এডিসি জেনারেল।' বললাম, 'তাঁর কাছে যান। এখানে কেন এসেছেন বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া অনুমতি না নিয়ে হঠাৎ করে কামরায় ঢুকে পড়লেন, এটাই বা কেমন আচরণ। ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন, যান।'

কিছুক্ষণ পর এডিসি সাহেবের ফোন এল। তিনি জানতে চাইলেন, 'একে নিয়ে কি করব, স্যার? রেভিনিউ বোর্ড তাঁকে বদলি করে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে চার্জ নিয়ে নিতে আদেশ করেছিল। ইনি চার্জ বুঝিয়ে না দিয়ে লম্বা ছুটির দরখাস্ত রেখে চলে গিয়েছিলেন। আজ এসেছেন কোর্ট অর্ডারে কাজে যোগ দিতে।'

ফোনে এডিসি সাহেবকে কিছুই বললাম না। শুধু বললাম, 'আপনি আমার রুমে চলে আসুন।' তিনি চলে এলে জানতে চাইলাম, 'এর বসার কোন বিশেষ জায়গা আছে কি না?' এডিসি বললেন, 'হ্যাঁ এজলাস আছে- উঁচু প্লাট ফরমের উপর এবং সেটা লাল সালু দিয়ে ঘেরা। ইনি বহুদিন যাবত এখানে আছেন। বাড়ী নারায়নগঞ্জ। জানা গেছে যে সেখানে তাঁর একটি সাবানের কারখানা আছে। এ কারখানার কাজেই তিনি বেশী সময় ব্যস্ত থাকেন। এগারটার দিকে একবার অফিসে এসে ঘন্টাখানেক থেকেই উধাও হয়ে যেতেন।'

www.pathagar.com

এডিসিকে বললাম, 'কোর্ট অর্ডার না মেনে আমাদের উপায় নেই। তাঁর জয়েনিং রিপোর্ট নিয়ম মাফিক নিয়ে নিন, তবে তাঁর এজলাসটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তারপর ঐ কামরায় একটি হাতল ছাড়া চেয়ার ও একটি টেবিল লাগিয়ে দিন এবং বাকী আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলুন। তাঁকে বলুন, এখন থেকে এখানে বসে তাঁকে কাজ করতে হবে।

এডিসি চলে যাবার পর বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে অফিস সুপার ভদ্রলোকের একটা স্লিপ পেলাম। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। ডাকলাম তাঁকে। তিনি নীরবে একটা দরখাস্ত আমার হাতে তুলে দিলেন। বিষয়- চাকুরী থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা। আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে লিখে দিলাম, ইস্তফা গ্রহণ করা হল এবং তাঁকে অব্যাহতি দেবার যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হোক।

বার্নওয়েল সাহেবকে ফোনে খবরটা জানিয়ে দিলাম। তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করেন নি। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন, ঘটনা সত্য, ভীষণ খুশী হলেন। তবে মেডেলটি আমার ভাগ্যে জুটেনি।

ঢাকার জেলা প্রশাসন কার্যতঃ এডিসিরাই চালাতেন। মাঝে-মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ নিতে হত। কিন্তু সমস্যা হত ডিসিকে পাওয়া নিয়ে। মিটিং নামক এক অদ্ভুত বস্তু কিভাবে প্রশাসন যন্ত্রটিকে পঙ্গু করে ফেলেছিল তা বলে বোঝান যাবে না। একবার মিটিং শুরু হলে আর শেষ হতে চাইত না। দশ মিনিটের কাজ শেষ হতে লাগত দু-তিন ঘন্টা। আর এ ছিল নিত্য দিনের ব্যাপার। অথচ ঢাকা শহর তখন ছিল রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। চলছিল আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা, আওয়ামী লীগের ছ' দফা ও ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন, বড় বড় নেতাদের ধর-পাকড়। এ ছাড়া ছিল ইত্তেফাক বন্ধ হওয়ার কারণে উত্তেজনা, চীনা রাষ্ট্রপ্রধানের সরকারী সফর নিয়ে ব্যাস্ততা এবং আরো অনেক কিছু।

একদিন হঠাৎ একটা ফোন পেলাম অফিসে বসে রহমতুল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে। তাঁর কণ্ঠে ছিল প্রচুর উত্তেজনা। তিনি বললেন এক অবিশ্বাস্য কথাঃ 'নাজির, বিশ্বাস কর আর নাই কর, সরকার জানতে চাচ্ছে আমার নাগরিকত্ব আছে কিনা!' ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি ছিলেন ঢাকার প্রথম ডি এম। পরে তিনি ঢাকা বিভাগের কমিশনারও হয়েছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় হিন্দু-মুসলিম রায়টে ইনি মারখাওয়া ও বিতাড়িত মুসলমানদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন হাওড়া জেলার আইসিএস অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সম্ভবত অবসর গ্রহণের পর পেনশন সংক্রান্ত কাগজ পত্রে ঘোষণা দিতে হচ্ছে বা নথিপত্রে দেখাতে হচ্ছে যে তিনি একজন পাকিস্তানী। তাঁকে যথাসম্ভব শান্ত করে বললাম, 'স্যার, সার্টিফিকেট কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি-

www.pathagar.com

চিন্তা করবেন না।'বললাম, 'আইনতো স্যার আমরাই বানিয়েছি। সুতরাং এর দুর্বল দিকগুলোর ভোগান্তিও আমাদের বরদাস্ত করতে হবে।'

এবার আর একটা টেলিফোনের কথা মনে পড়ছে। অপরপ্রান্তে ছিলেন জনাব আব্দুস সালাম। হ্যাঁ 'পাকিস্তান অবজারভার' –এর সম্পাদকের কথাই বলছি। তিনি একটা পিস্তলের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। বললাম, 'ঠিক আছে, একটা ফরম্যাল দরখাস্ত মেহেরবানী করে পাঠিয়ে দিন। ফরমালিটিগুলো পুরো করে আমি লাইসেন্সটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

খুব সরল মনেই আমি আব্দুস সালাম সাহেবকে পিস্তলের লাইসেন্স দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম। কিন্তু ঘন্টাখানেক পর ঘটল এক অবাক কান্ড। সম্পাদক সাহেবের এক ঘনিষ্ট আত্মীয়, আমার সার্ভিসের সহকর্মী এবং আমার শিক্ষানবীশ খালেদ শামস ছুটে এলেন আমার কাছে। পেরেশান হাল তাঁর। বললেন, 'সালাম সাহেব কি পিস্তলের লাইসেন্স চেয়েছেন আপনার কাছে, স্যার? আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, চেয়েছেন। কিন্তু তাতে এমন কি আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে?'

তিনি বললেন, 'কোন ক্রমেই তাঁকে পিস্তলের লাইসেন্স দেবেন না,স্যার। এই খবর শুনে বাড়ী শুদ্ধ লোক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আর এ জন্যই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।' আমি অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলাম, 'কারণটা কি?' সহকর্মী বললেন, 'স্যার সম্পাদক সাহেব ইদানীং ভীষণ টেনশনে ভুগছেন। যখন তখন লোকজনের উপর রেগে যান, মারমুখী হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় তাঁর হাতে পিস্তল এলে তিনি কখন যে কার উপর চালিয়ে দেবেন, বলা যায় না।' এটা আমার জন্য উভয় সংকট। সালাম সাহেবকে কথা দিয়েছি তাঁকে পিস্তলের লাইসেন্স দেব। আর এখন সহকর্মীর মুখে যা শুনলাম তাতে তাঁর হাতে পিস্তল যাওয়াটা সমীচীন নয়। কি করব আমি? সহকর্মী ভদ্রলোক নাছোড় বান্দা, 'স্যার আপনাকে মত পাল্টাতেই হবে। নতুবা নির্ঘাত একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। বাড়ীর সবার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।'

এরপর সালাম সাহেব প্রায়ই ফোন করতেন, খোঁজ নিতেন তাঁর পিস্তলের লাইসেন্সের কি হল? প্রতিবারেই একটা না একটা সমস্যার কথা শুনতেন। শেষে নিশ্চয়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোথাও একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। আর এজন্য তিনি আমার উপর রুষ্ট হয়ে ছিলেন কিনা জানি না।

আমার ঢাকা জেলার দায়িত্ব নেবার দ্বিতীয় সপ্তাহেই একটা মজার ঘটনা ঘটল। একদিন কালেকটরী অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় আবগারী সুপারিন্টেনডেন্ট ও এডিসি জেনারেলকে সাথে নিলাম। সোজা গেলাম ঢাকা ক্লাবে। সময় তখন বেলা দুটো হবে। ডিসির গাড়ী দেখে এক কর্মচারী ছুটে এল। বিনীতভাবে জানতে চাইল সে আমাদের কি খেদমত করতে পারে? বললাম, 'এই মুহূর্তে বাসায় নেবার মত কোন

www.pathagar.com

ভাল জিনিস আছে কিনা!' সে হাস্যদীপ্ত মুখে বলল, 'স্যার, খুব ভাল হুইস্কি আছে, দেব?' তার কথা লুফে নিয়ে বললাম, 'একটা বোতল কাগজে মুড়ে বিল সমেত নিয়ে এস।'

আমরা গাড়ীতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে সুন্দর কাগজ মোড়া একটা বোতল আমাদের হাতে চলে এল। বিলটা পরিশোধ করে দিলাম। যতদূর মনে পড়ে বিলটা ছিল আশি টাকার।

বাসায় এসে এডিসি জেনারেলকে বললাম, সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখিতভাবে আবগারী সুপারিন্টেডেন্টকে একটা রিপোর্ট দিতে। এডিসি রিপোর্ট দিলেন। আবগারী সুপারিন্টেনডেন্ট ঢাকা ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার প্রার্থনা করে ডিসির কাছে নোট দিলেন। আমি আবগারী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক বেআইনীভবে বাইরে এবং ক্লাবের মেম্বর নয় এমন লোকের কাছে মদ বিক্রীর অপরাধে ঢাকা ক্লাবের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত এরং ক্লাবে তালা লাগানোর আদেশ লিখলাম। জানতাম, মৌচাকে ঢিল পড়ল। জেনে শুনেই আমি এ ঝুঁকি নিলাম।

সন্ধ্যায় শিল্প দপ্তরের সচিব আমার বাসায় এলেন। এসেই তিনি জানতে চাইলেন আমার ফোকস্ওয়াগান চাই কিনা? কি রং আমার পসন্দ এবং গাড়ীর অভাবে আমার ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসা-যাওয়ায় নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। আমার প্রতি তাঁর দরদের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমি ইতিমধ্যেই একটা গাড়ী কিনেছি। খবরটা শুনে তিনি কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন বলে মনে হল।

যাই হোক, আসল কথাটা তিনি পাড়লেন একটু পরেই। তাঁর হঠাৎ এই আগমনের হেতুটা পরিস্কার হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তিনি বললেন যে তিনি ঢাকা ক্লাবের সেক্রেটারী। বললেন, 'নাজির ক্লাবের তালাটা খুলে দাও- খুবই অপমানজনক অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি। আসলে ওদের হুইস্কি বেচা উচিৎ ছিল না। তুমি তো জন, ঢাকা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই ক্লাবে আসেন। তুমি একটা ওয়ার্নিং দিয়ে এবারের মত ছেড়ে দাও।' আমি সরাসরি তাঁর অনুরোধের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্লাব ছাড়া অন্যান্য লাইসেন্সধারীদের ব্যাপারেও কি আপনি এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বলেন?' তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'না না আমি তা বলবো কেন। আমি বলছি এটা একটা প্রিমিয়ার ক্লাব, তোমাকে এ ব্যাপারে একটু বিবেচনা করতে হবে।' আমি শীতল কণ্ঠে তাঁকে জানিয়ে দিলাম, আইন মোতাবেক যা করার তা আমি করেছি। আমার এ ব্যাপারে আর কিছুই করার নেই। কিন্তু তিনি কিছুতেই পিছু হটতে রাজী নন। একই সার্ভিসে তিনি আমার সিনিয়র, তবুও এমন সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন যে আমি বিব্রত না হয়ে পারলাম না। আমাকে টলাতে না পেরে শেষে তিনি হতাশ হয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় অবশ্য এমন একটা ভাব দেখালেন, আচ্ছা, দেখে নেব

www.pathagar.com

বাছাধন, কত ধানে কত চাল।

পরের তিন দিন ঢাকা ক্লাব প্রসঙ্গ নিয়ে চলল এলাহী কান্ড। কেউ কেউ সাক্ষাত করলেন, কেউ কেউ করলেন ফোন, কেউ কেউ ঘনিষ্টজনের মাধ্যমে তদবির করালেন। সবই ঢাকা ক্লাবের পক্ষে। ধমক, চোখ রাঙ্গানী, প্রলোভন, অনুরোধ-উপরোধ কিছুই বাকী রইল না। শেষমেশ ফাইন করা হল বড় অঙ্কের টাকা এবং মদ বরাদ্দের পঁচাত্তর ভাগ কমিয়ে দেওয়া হল। এভাবেই এ ঘটনার ইতি টানলাম চিফ সেক্রেটারী সাহেবের অনুরোধক্রমে।

ঢাকা ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে আমি উঁচু সমাজের হৃতপিন্ড ধরে টান দিয়েছিলাম। প্রতিভাধর সরকারী আমলারা বড় বড় ব্যবসায়ীদের আনুকূল্যে যা কিছু করতেন তার জন্য প্রয়োজন হত বুদ্ধির আর এই বুদ্ধির গোড়ায় রঙ্গিন পানি না ঢাললে বুদ্ধি খোলত না। এ জন্য ঢাকা ক্লাব ছিল আদর্শ স্থান।

এই ঘটনার পর অনেকেই আমাকে চশমার উপর দিয়ে দেখতেন। তাদের মনোভাবটা বুঝতাম। তবে এ ঘটনায় লাভ হয়েছিল এই যে আমার কাছে কেউ তদবির বা রিকোয়েস্ট নিয়ে আসতেন না। নতুবা ঢাকা জেলার ডিসির শিরদাড়া রিকোয়েস্টের চাপে সোজা রাখা হত প্রায় অসম্ভব।

এই রিকোয়েস্ট প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। একটা রিভলবারের জন্য দরখাস্ত এল। পুলিশে পাঠালাম তদন্তের জন্য। রিপোর্ট এল অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে যে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এবার পাঠালাম গোয়েন্দা বিভাগে। জবাব এল, প্রার্থী সন্দেহজনক চরিত্রের লোক। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত বলে তাকে সন্দেহ করা হয়। তবে সে মোটামুটি ভাল পরিবারের লোক। এদিকে প্রার্থী আমার এক পরিচিত লোকসহ প্রতিদিন অফিসে এসে তদবির করছে যাতে তার কাজটি দ্রুত হয়ে যায়। আমি চুপচাপ আছি, কিছু বলছি না। প্রায় সপ্তাহ তিনেক পর মাদানী সাহেবের ফোন পেলাম। লোকটিকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য তিনি নিজে জোর সুপারিশ করলেন। তাঁর আগ্রহ দেখে বললাম, 'স্যার, ফাইলে আপনার সুপারিশের উল্লেখ করে লাইসেন্স দিয়ে দেব?' বললেন, 'দিয়ে দাও না বাবা, খামকা কেন গোলমাল করছ!' ফোন ছাড়বার আগে বললাম, 'দেখব, স্যার।' এক সপ্তাহ পর ফাইলে লিখলাম, 'একে কখনই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া যাবে না।'

এ ঘটনার এখানেই ইতি। কিন্তু তবুও এর একটু রেশ থেকে গেছে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিছুদিন পর আমার সেই পরিচিত লোকটি কথা প্রসঙ্গে বলল, 'স্যার, ঐ লোকটিকে রিভলবারের লাইসেন্স না দিয়ে খুব ভাল করেছেন।' আগ্রহ ভরে জানতে চাইলাম, 'কেন?' সে লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'লোকটি একটি নারী ঘটিত ব্যাপারে মারামারি ও গুন্ডামীর কারণে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এবং এখন শ্রীঘরে আছে।

www.pathagar.com

যদি ওর কাছে রিভলবার থাকত তবে এক-দুটো মার্ডার হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না।' আমি তাকে তম্বি করে বললাম, 'এমন একটা লোকের সুপারিশ কেন করেছিলে আমার কাছে?' সে কাচুমাচু করে বলল, 'স্যার (একজন বড় সাহেব) বলেছিলেন নাজির তোমাকে ভাল জানে, তুমি বললে ওর লাইসেন্সটা হয়ে যাবে। আমি তো স্যার স্যারের হুকুম তামিল করেছি মাত্র।'

এ হল এক ধরণের রিকোয়েস্ট বা তদবির যা প্রায়ই ফেস করতে হত। আর এক শ্রেণীর লোক দেখতাম যাদের আমার দালাল কিসিমের বলে মনে হত— বড় বড় বস ও রাজনৈতিক নেতাদের রিকোয়েস্ট নিয়ে আসত। অবাক হতাম না। ভাবতাম, রাজধানীর ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।

চীনের রাষ্ট্র প্রধান লিও শাও চি ঢাকা সফরে আসবেন। তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনার আয়োজন করা হচ্ছে। সরকারী নির্দেশ হল যে খুব জাঁকজমক পূর্ণ অভ্যর্থনা দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে চীনারা যে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা দিয়েছিল মাদের তার ফিল্ম দেওয়া হল। শহরের বিভিন্ন স্তরের লোকদের বিশেষ করে যারা চীনা নেতার সম্বর্ধনার সাথে জড়িত, এ ফিল্ম দেখান হল। স্থানীয় একটা সিনেমা হলে এক সপ্তাহ ব্যাপী এ ফিল্ম প্রদর্শন করা হল। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সহ যাদের এ ছবি দেখান হল তাদের একটা ধারণা দেওয়া হল যে কিভাবে চীনা নেতাকে অভ্যর্থনা জানান হবে। অন্যদিকে এই সফরকে উপলক্ষ্য করে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হল। চীনা নেতাকে লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, ঢাকার সম্বর্ধনা হতে হবে তার চেয়েও জাকাল, তার চেয়েও বর্ণাঢ্য- এমন একটা মনোভাব সবার মধ্যে কাজ করছে দেখলাম। মানুষ-জন সত্যি সত্যি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছিল।

চীনা নেতার আগমনের মাত্র দু'দিন আগে গোয়েন্দা বিভাগ মারফত একটি প্রচারপত্র পেলাম। এতে মেহমানের গণঅভ্যর্থনার একটা কর্মসূচী ছাপা হয়েছে বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানীর তরফ থেকে। কর্মসূচী অনুযায়ী পল্টন ময়দানে একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মওলানা ভাসানী চীনা প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে দেবেন অভ্যর্থনা সূচক বক্তৃতা। আরো দু'জন বক্তৃতা করবেন। তারপর ভাষণ দেবেন চীনা নেতা। এবং সব শেষে প্রেসিডেন্ট আয়ূউব খান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। বিমান বন্দরেও, প্রচারপত্র অনুযায়ী, ন্যাপ সদস্যরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট লিও শাও চিকে একই কায়দায় অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করেছে।

ঢাকার ডিসির অবশ্য এসব বিষয়ে তেমন মাথা ঘামানর কিছু নেই। ওপর থেকে যা হুকুম আসবে সরকারী সিদ্ধান্ত হিসাবে ডিসিকে তাই কার্যকর করতে হবে। তবে মওলানা ভাসানী কী করেন, সেদিক নজর রাখতে হবে।

www.pathagar.com

এ প্রচারপত্র সম্পর্কে কোন মহল থেকেই আর কিছু শুনিনি। পরে অবশ্য মওলানা ভাসানীর অন্য একটি কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে পারি। এটা সম্ভবত আগের কর্মসূচীর সংশোধিত রূপ। এই নয়া কর্মসুচী অনুসারে মওলানা সাহেব তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হাইকোর্ট গেটের সামনে অপেক্ষা করবেন। অতিথিকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা আসবে সেটি থামিয়ে তিনি চীনা নেতাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। আমাদের নজর রইল পথে যাতে কোথাও বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

মেহমানের আসার দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, প্রস্তুতিও ব্যাপক হতে লাগল। ঢাকার কমিশনার একদিন বিমান বন্দর ঘুরে সোজা আমার মিন্টো রোডস্থ বাসায় এসে পৌঁছলেন। প্রস্তুতি ও আয়োজন নিয়ে তিনি আমার সাথে মত বিনিময় করলেন। তিনি বললেন, তিনি একটু দূরে দূরে থাকতে চান। কারণ তাঁর বেশী বেশী উপস্থিতি কর্মীদের কাজে বাধা স্বরূপ হতে পারে। আমার ভাল লাগল তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী। আমি নিজেও প্রতিটি কাজ এক এক জন দায়িত্বশীল ব্যক্তির ওপর ন্যাস্ত করে সমন্বয়কারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তা ছাড়া এই বিশাল আয়োজনে কর্তৃত্ব দেখাতে গেলেই গোলমাল বেধে যেতে পারে। যারা কাজ করছে তাদের কাজের স্বাধীনতা দিলে এবং তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করলে সুফল পাওয়া যাবেই।

নির্দ্ধারিত দিনের আগের দিন বিকেল বেলা চিফ সেক্রেটারী সাহেব বিমান বন্দর ঘুরে এসে আমাকে ফোন করলেন। তাঁর কণ্ঠে হতাশা, উৎকণ্ঠা। বললেন, সাজ সজ্জার কোন চিহ্নই তিনি কোথাও দেখতে পেলেন না। তা হলে হচ্ছেটা কি?

আসলে আবহাওয়া বিভাগ থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে মেহমানের আগমনের আগের দিন সন্ধ্যায় ঝড় বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। আমরা সে সময়টা পার করে কাজে হাত দিতে চাচ্ছিলাম। চিফ সেক্রেটারীকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'সব ঠিকঠাক মতই হবে।' তবে মনে হল তিনি আমার কথায় খুব একটা আশ্বস্ত বা খুশী হতে পারলেন না।

যা হোক, সারা রাত ধরে রমনা পার্কের পাশের প্রেসিডেন্ট হাউজ (বর্তমানে সুগন্ধা) থেকে বিমান বন্দর (পুরাতন) পর্যন্ত রাস্তার দু'ধার সুন্দরভাবে সাজান হল। সকাল বেলা উপচে পড়া জনতার ঢলকে সুশৃংখল রাখার জন্য এডিসি ও সম মর্যাদার অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হল। তা ছাড়া, জনতার সামনের দু' সারিতে সাধারণ পোষাকে আনসারদের দাঁড় করান হল। মেহমান প্রেসিডেন্টকে নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হলে দেখা গেল বেচারা ডিসির গাড়ী বহু পেছনে স্থান পেয়েছে। কারণ প্রোটোকল অনুসারে তাঁর গাড়ীর সামনে আসার উপায় নেই। অথচ অত পিছনে থেকে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তাই অতিথির গাড়ীর ঠিক সম্মুখের পুলিশের খোলা পাইলট জিপে ওঠে পড়লাম। দেখলাম, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অবস্থাও আমার মতই।

www.pathagar.com

বেচারা পুলিশের পাইলট জিপ দেখে এগিয়ে এসে দেখলেন ওটাতে ডিসি দাঁড়িয়ে আছেন। সরে গেলেন তিনি অন্যদিকে। সম্ভবত অন্য কোন গাড়ীতে স্থান করে নিতে।

শোভাযাত্রা ইউনিভার্সিটির টিএসসির সামনে পৌছামাত্র একটা ছোটখাট অঘটন ঘটে গেল। হঠাৎ সম্মুখের মোটর সাইকেল রাইডারের মোটর সাইকেলটি কাত হয়ে পড়ে গেল। রাইডারও হল ভূতলশায়ী। শোভাযাত্রা স্বাভাবিক কারণেই থেমে গেল। এ সময় এক যুবক ছোট একটা ফুলের তোড়া হাতে চীনা প্রেসিডেন্টের দিকে এগিয়ে এল। আমি চোখের পলকে সেটি তার হাত থেকে নিয়ে তাকে সরিয়ে দিলাম। শোভাযাত্রা আবার চলতে শুরু করল। আমার মনে হয়েছিল মোটর সাইকেল রাইডারের পড়ে যাওয়া এবং যুবকের ফুলের তোড়া হাতে এগিয়ে আসার মধ্যে হয়ত একটি যোগসূত্র আছে। পরে অবশ্য এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।

শোভাযাত্রা হাইকোর্টের কাছে আসতেই আমরা খুব সতর্ক হলাম। কারণ এখানে রয়েছে মওলানা ভাসানীর প্রোগ্রাম। আমরা কোনমতেই শোভাযাত্রা থামতে দেবনা। নির্দেশ ছিল এ জায়গাটা আরো দ্রুত অতিক্রম করতে হবে। কারণ এই বিশাল শোভাযাত্রা একবার থামলে প্রচন্ড ভীড়ে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে, তা সামাল দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

সব কিছু ভালয় ভালয় হয়ে গেল। শোভাযাত্রা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌছে গেল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। খুশী হলাম আমাদের সাফল্যে। পরে শুনেছি নির্দিষ্ট স্থানে কোন উঁচু কিছুর ওপর মওলানা ভাসানী দাঁড়িয়েছিলেন। তবে আমি তাঁকে দেখিনি।

চীনা নেতা ঢাকা ত্যাগ করার পর চিফ সেক্রেটারী ঢাকার কমিশনারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'বহুত আচ্ছা হুয়া।! কমিশনার সাহেব চিফ সেক্রেটারীকে তারিফের জন্য শুকরিয়া জানালেন। আমরা অর্থাৎ এডিসি, এসপি, পুলিশের কর্মকর্তা এবং আরো অনেকেই যাঁরা এই আয়োজনের সঙ্গে জড়িত- উপস্থিত ছিলাম। প্রটোকল অনুযায়ী চিফ সেক্রেটারী কমিশনারকে তাঁর এপ্রিসিয়েশন জানাবার কথা। তিনি করলেনও তাই। কিন্তু কমিশনার সাহেব একবারও তাঁর অধীনস্তদের খেদমতের কথা উল্লেখ করলেন না। এটা করলে দেখতে ও শুনতে ভাল লাগত। এসব ক্ষেত্রে বড় মন ও উদারতার প্রয়োজন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সকলের আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের তারিফ করলেন অকুণ্ঠভাবে। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি রওয়ানা হবার পূর্ব মুহূর্তে ডিসিকে ডেকে বললেন, তোমরা দারুণ খেটেছ। তোমাদের আয়োজন লাহোর ও পিণ্ডির আয়োজনকে হার মানিয়েছে। তোমার সকল অফিসার ও সহকর্মীকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে দিও।'

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের এই এপ্রিসিয়েশন আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলাম। কারণ কমিশনার সাহেবের কার্পণ্য অনেকের মনকেই ব্যথিত করেছিল।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, প্রশাসনিক কাজ করতে গিয়ে সহকর্মী ও অধীনস্থদের সাবাসি দিলে তাদের সহযোগিতা ও আনুগত্য নিশ্চিত করা যায়। লিও শাও চির আগমনটা অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনের মত ছিল না। কারণ '৬৫-এর যুদ্ধে চীনের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কারণে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর হামলা করতে সাহস করেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই চীনকে এ প্রদেশের মানুষ তাদের বিপদের দিনের বন্ধু মনে করেছে। তাই চীনের প্রেসিডেন্টের আগমনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহ দেখিয়েছে, তাদের আন্তরিকতার প্রদর্শন করেছে শোভাযাত্রায় সামিল হয়ে, রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে মেহমানকে অভ্যর্থনা জানিয়ে। যাঁরা আয়োজনে ছিলেন তাঁদের আন্তরিকতাও ছিল প্রশ্নাতীত।

ঢাকা জেলার ডিসি হিসাবে আমার সময়কাল স্বল্পকালীন হলেও, এ সময়টা ছিল ঘটনাবহুল। রাজনৈতিক অস্থিরতা, উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। শেখ মুজিব তাঁর ৬ দফা দাবী নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন দাবীর আন্দোলন। এসবের পক্ষে চলছিল বক্তৃতা-বিবৃতি, সভা-সমাবেশ, প্রচারপত্র বিলি, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটান এবং আরো কত কি। অপরদিকে সরকার পক্ষও চুপচাপ বসেছিল না। তারাও এসব দফার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছিল।

ডিসি হিসাবে এসবের পক্ষে বা বিপক্ষে আমার কিছুই করণীয় ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আমাদের পড়তে হত বিপাকে।

৬ দফার দাবীতে আওয়ামী লীগ হরতাল ডেকেছে ৭ জুন। তারা চায় সব কিছু বন্ধ থাক, জনজীবন হয়ে পড়ুক অচল। আর সরকার চায় সব কিছু খোলা থাক, হরতাল হোক নিষ্ফল।

এ রকম অবস্থায় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বা সংঘাত অনিবার্য। এটা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, হরতালের সময় যখনই সরকার জোর করে দোকানপাট খোলানর চেষ্টা করেছে বা গাড়ীঘোড়া চালানর কোশেশ করেছে, গন্ডগোল বেঁধেছে সরকার ও হরতালকারীদের মধ্যে। এসবক্ষেত্রে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে অবধারিতভাবে। পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয় এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে গুলি চালাতে হয়।

www.pathagar.com

ঘটনার পর আমাদের প্রশাসনের লোকদের উভয় পক্ষ থেকে শুনতে হয় গালমন্দ। সরকার পক্ষ হয়তো নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে প্রশাসনের সমালোচনা করল আর বিরোধী পক্ষ হয়তো ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দায়ী করল প্রশাসনকে।

৭ জুনের হরতাল নিয়ে এক নাজুক ও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হল। সরকারী দলের মনোভাবটা এই, যে কাজটা তারা করতে পারছে না, প্রশাসন যন্ত্র যেন তাদের হয়ে তা করে দেয় আর এর ব্যত্যয় হলেই নেমে আসবে নানা রকম মুসিবত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উপর।

আমরা নানা মিটিং-সিটিং-এ ব্যস্ত। একবার যেতে হচ্ছে সেক্রেটারীয়েটে একবার গভর্নর হাউজে। হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত নোটিশ পেলাম পুলিশের আইজির কাছ থেকে। শান্তি-শৃংখলার ওপর মিটিং ডেকেছেন তিনি তাঁর দপ্তরে। পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে ডিসিকেও সেই মিটিং-এ যেতে বলা হয়েছে।

আমার খটকা লাগল। পুলিশের আইজি শান্তি-শৃংখলার বিষয়ে তাঁর পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে যত ইচ্ছে মিটিং করুন, তাতে ডিসির কিছু করার নেই। কিন্তু ডিসিকে যখন এ ধরনের মিটিং-এ ডাকা হয় তখন অবশ্যই এখতিয়ারের প্রশ্ন ওঠে। আমার মনে হল এটা আইজি সাহেবের এখতিয়ারে পড়ে না। তাঁকে ফোন করলামঃ কি ব্যাপার, কিসের মিটিং? তিনি বললেন, আমরা প্রধানত আইন-শৃংখলার বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। বললাম, এ কাজ তো আমরা ক'দিন যাবতই করছি সেক্রেটারীয়েট ও গভর্নর হাউজে। তিনি বললেন, আমরা ঢাকা শহরের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে কোন্ বিষয়ে কি করা হবে, আলোচনা করে স্থির করতে চাই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এর আগেও আমি মিটিং করেছি এবং তাতে ডিসি যোগ দিয়েছেন।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। তবে আমার করণীয় স্থির করে ফেললাম। আইজির মিটিং-এর আগেই একই বিষয়ে একটি মিটিং-এর দিন-তারিখ ঠিক করে নোটিশ জারি করলাম। এডিএম, এসপি, এসডিও, ইনটেলিজেন্স-এর জেলা প্রধান ও ঢাকা ডিভিশনের ডিআইজিকেও সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করলাম। এটা কিন্তু আমি গোয়র্তুমি করে করিনি বা এটাকে আমার প্রেসটিজ ইস্যুও বানাইনি। পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গলে ডিসিকে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তার বলেই এ সভা ডাকলাম।

আমার ডাকা সভা যেমন হয়নি, আইজির ডাকা মিটিংও বাতিল হয়ে যায়। কারণ চিফ সেক্রেটারি একই বিষয়ের ওপর আরো আগে জরুরী বৈঠক ডাকলেন। নানা কথা আলোচনা হল। কি কি ব্যবস্থাদি নেওয়া হবে, চূড়ান্ত করা হল।

এখনো মনে পড়ে, দুটো বিষয়ের সঙ্গে আমি দৃঢ়তার সাথে দ্বিমত পোষণ করি।

www.pathagar.com

প্রথম বিষয়, জোর করে দোকানপাট খোলা রাখার চেষ্টা। আমি বললাম, জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন কিছুই করবে না। তবে অন্য দল যদি জোর করে খোলা দোকান বন্ধ করাতে চায়, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখব; কাউকে আইন তার হাতে তুলে নিতে দেব না।

দ্বিতীয় বিষয়, আমি কোন মতেই শহরে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ করব না। কারণ আমি মনে করি, ১৪৪ ধারা জারি করে তা কার্যকর করা কঠিন হবে। আর ১৪৪ ধারা জারি করে তা বলবত না করতে পারলে মানুষের চোখে প্রশাসন হেয় প্রতিপন্ন হবে। সেজন্য এ থেকে বিরত থাকাই আকলমন্দি হবে।

আমার মত পাল্টানর জন্য যুক্তি খাড়া করা হল, অনেক বিতর্ক হল, কিন্তু শেষ পর্যন্তও আমি আমার মত পাল্টালাম না। যখন অনেক চাপাচাপি করা হল, আমি বললাম, যতক্ষণ আমি দায়িত্বে থাকব আমি আমার মত করেই পরিস্থিতি সামাল দেব। এটা যদি কর্তৃপক্ষের পছন্দ না হয় তবে তাঁরা আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে আসতে পারেন।

এ মিটিং-এ এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেয়া হল। প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে ছ'জন করে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হবে। মনে মনে ভাবলাম ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়ে বুঝি মিছিল নিয়ন্ত্রণ করবে! এটা যেহেতু আইজির সমস্যা তাই আমি আর এ বিষয়ে তেমন কিছুই বললাম না।

এও স্থির হল, প্রত্যেক মোড়ে একজন এসপির পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন কিছু পুলিশসহ। গোলমাল হলে এসপি সাহেবরা নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন। হঠাৎ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধরুন এমন একটা স্থান যা প্রথম এসপির এলাকা কিন্তু সেটা দ্বিতীয় এসপির এলাকার কাছাকাছি-গোলমাল বাঁধলে এ অবস্থায় কে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসবেন? মনে হল আমার প্রশ্ন শুনে আইজি বিরক্ত হলেন এবং চিফ সেক্রেটারী একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

ঘটনার দিন কার্জন হলের কাছে এবং হাইকোর্ট গেটের পাশে ছাত্ররা একটা গাড়ীতে আগুন দিল। পুলিশের চোখের সম্মুখে এবং দুজন উচ্চপদস্থ অফিসারের উপস্থিতিতে। আসলে এ এলাকা ছিল যাঁর দায়িত্বে সেই অফিসার অবস্থান নিয়েছিলেন এখনকার দোয়েল চত্বরের কাছে। ছাত্রদের ইট বৃষ্টির ফলে তিনি তাঁর সীমান্ত এলাকা অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। অপরদিকে যে অফিসারের খুব কাছে এ ঘটনা হল তিনি ভাবলেন এটা তাঁর এলাকা নয়। তিনি অহেতুক অন্যের এলাকায় হস্তক্ষেপ করলেন না। এই সুযোগে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা নিরাপদে তাদের কাজ করে গেল পুলিশের নাকের ডগায়।

www.pathagar.com

এখন যেটা ফরেন অফিস, সে সময় এটা ছিল ঢাকার কমিশনার অফিস। দোতলায় ঢাকার ডিসির কন্ট্রোল রুম। কন্ট্রোল রুমে ঢুকবার আগে ভোরে শহরে একটা চক্কর দিতে বেরুলাম। সূর্য তখনো ওঠেনি। নবাবপুরে এসে গাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেল। আর এগুনো গেল না। রাস্তায় লোকজন নেই তেমন। হেঁটে হেঁটে এলাম অফিসে। একটা জিপ নিয়ে আবার বেরুলাম। এবার গেলাম তেজগাঁও-এর দিকে- পুলিশ কিভাবে অবস্থান নিয়েছে দেখার জন্য। ফিরলাম কার্জন হল হয়ে। হলের কাছে যেতেই ফুল গাছের আড়াল থেকে আমাদের জিপ লক্ষ্য করে তিনটা ইট মারা হল। এরমধ্যে মাত্র একটা আমাদের জিপের কাঁচের উপরকার লোহার রডে লাগল। বডিগার্ডকে নামতে নিষেধ করে আমি জিপ থেকে নেমে দ্রুত ফুল গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে একজন বা দু'জন যারা ফুল গাছের আড়াল থেকে ইট মেরেছিল, দ্রুত পদে সরে গেল। আমি রসিকতা করে উচ্চস্বরে বললাম, 'তোমরা লেখাপড়া বাদ দিয়ে যা করছ তার নমুনা দেখলাম। কুল তিনটি ইট মেরেছ, তার একটা মাত্র আলতভাবে আমার জিপের গায়ে লেগেছে। আর এখন আমাকে দেখে পালাচ্ছ, এই বুঝি তোমাদের বীরত্ব? এভাবে কতদূর যেতে পারবে?' বিল্ডিং-এর আড়াল থেকে একটা ছেলে চিৎকার করে বলল, 'নাজির ভাই, আপনি চলে যান, আপনার সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমাদের বিরোধ ঐ পাঞ্জাবী পুলিশদের সাথে।' আমি অবাক হলাম। পাঞ্জাবী পুলিশ কোথায়? বুঝলাম, আমার উঁচু লম্বা বডিগার্ড দেখে ওরা মনে করেছে ও ব্যাটা পাঞ্জাবী। ভীষণ হাসি পেল। একটু ছেলেমানুষী করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তাই আবার উচ্চ কণ্ঠে বললাম, 'তোমরা যাকে পাঞ্জাবী মনে করছ আসলে ও বাঙালী, বাড়ী পাবনা।'

ওখান থেকে সোজা কন্ট্রোল রুমে ফিরলাম। একটু পর কমিশনার এস বি চৌধুরী ও আইজি এলেন দেখতে। তাঁদের পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দিলাম। বললাম, এখন আপনারা দয়া করে কেউ বাইরে যাবেন না। গেলে নিজ দায়িত্বে যেতে হবে। সবাই ব্যস্ত, সুতরাং এসডিও বা অন্য কাউকে এ মুহূর্তে সাথে দেওয়া যাবে না।

কিন্তু তাঁরা কেউ আমার কথা শুনলেন না। ড্রাইভার নিয়ে তাঁরা তেজগাঁর দিকে রওয়ানা দিলেন। প্রায় একঘন্টা পর ওয়ারলেসে দুঃসংবাদ পেলামঃ তাঁরা দু'জন জনতার হাতে আক্রান্ত। জনতা ট্রেন আটকানর জন্য যখন ফিশ প্লেট তুলছিল, তখন তাঁরা দু'জন এটা বন্ধ করার জন্য জনতার উদ্দেশে এগিয়ে যান। জনতা তাঁদের দিকে লাইনের পাথর ছুঁড়ে থাকে। এ সময় একটা ট্রেন এসে থামলে তাঁরা দু'জন কোন মতে চালকের রুমে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু জনতা সেখানেও তাঁদের ওপর চড়াও হয়। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে তাঁদের। তাঁরা দুজনই কিছুটা আহত হয়েছেন, তবে মারাত্মক নয়। ত্বরিত একজন সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠালাম কিছু পুলিশসহ তাঁদের উদ্ধারের জন্য।

www.pathagar.com

কমিশনার ও আইজি সাহেবকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল। তাঁরা পৌঁছেই তাঁদের করুণ কাহিনী শোনাতে লেগে গেলেন। আমাদের সবার ব্যস্ততা এত ছিল যে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভাষ্য পুরটা শুনতে পেলাম না।

কিছু পরে নারায়ণগঞ্জ থেকে খবর এল যে লোকজন সেখানে থানা আক্রমণ করেছে। এসডিওস সাইদ আহাম্মদ থানায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতির অবনতি হলে তিনি গুলির আদেশ দেন। গুলিতে চারজন লোক মারা গেছে। এদিকে তেজগাঁ থেকেও গুলি চালানর খবর এল। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হয়েছে।

সারাদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে অশান্তির খবর আসতে থাকল। সদরঘাট এলাকায় গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেল। ট্রেজারীর আশেপাশে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে। একজন ডিআইজি ও রফিকুল্লা চৌধুরী এডিসি ওখানকার অবস্থা মোকাবেলা করছেন। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করছে। তবে প্রবল বাতাসের কারণে এই কাঁদানে গ্যাস পুলিশকেও কাঁদাচ্ছে।

চিফ সেক্রেটারীর ফোন পেলাম। বললেন নাজির, 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। গুলির হুকুম দাও আর ১৪৪ ধারা জারি কর। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম। ১৪৪ ধারা জারি করলাম না। জানতাম ১৪৪ ধারা জারি করলে এ পরিস্থিতিতে তা বলবত করা যাবে না। আর এতে অনেক মানুষের প্রাণনাশও ঘটবে।

ইপিআর কমান্ডার এসে জানিয়ে গেলেন, স্যার, হামলোগ তৈয়ার হ্যায়, হুকুম কিজিয়ে। বললাম, জরুর তৈয়ার রহিয়ে, ওয়াক্ত আনেপে হুকুম করুঙ্গা।

মোনেম খান সাহেব খুব কঠোর ভাষায় আমাকে আক্রমণ করলেন- ফোনে। বললেন, আপনার হয়েছেটা কি? গুলি চালাচ্ছেন না কেন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ওপর? ওরা আপনার বাবা হয় নাকি?' মাথা ঠান্ডা রেখে বললাম, জি স্যার, আমার একার নয়, আমাদের অনেকেরই বাবা হয় ওরা। নূরুল আমীন সাহেব গুলি চালিয়ে একটা ছাত্র মেরে গতিচ্যুত হয়েছিলেন। এরপরও যদি গুলি চালাতে চান, স্যার, ডিসিকে বদলিয়ে দিন।' লাট সাহেব একটা কথাও বললেন না। শুধু নীরবে রিসিভার রেখে দিলেন।

খবর পেলাম, বিকেল বেলা কার্জন হলে ছাত্রদের একটা সভা হবে। সভাশেষে তারা দলবদ্ধভাবে পুলিশের গুলিতে নিহতদের লাশের সন্ধানে বেরুবে।

এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে আরো খারাপ হবে। এতে আমরা না চাইলেও গুলি চলবে, আরো লোক মারা যাবে। কাজেই এ সভা যাতে না হতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়।

www.pathagar.com

আমার এসপির সাথে পরামর্শ করলাম। ভদ্রলোক পুরাতন মানুষ, ঠান্ডা মাথার লোক। এ ব্যাপারে আমরা একমত হলাম, যে দু'জায়গায় গুলি হয়েছে–নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁতে– পরিস্থিতি বাধ্য করেছে স্থানীয় অফিসারদের গুলি চালাতে। নানা উস্কানীর মুখেও আমরা কোথাও গুলি চালাবার আদেশ দেইনি। পারতপক্ষে দেবও না; এড়িয়ে যাওয়াই হবে আমাদের লক্ষ্য।

আমরা ঠিক করলাম কার্জন হলের সভা ভাঙ্গতে হবে। একটা পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেললাম। এসপি সাহেব জনা বিশেক তাগড়া হাবিলদার ও সুবেদারকে নিরস্ত্র করে সাদা পোশাকে আমার সামনে হাজির করলেন। ওদের হাতে বেতের চাবুক দিয়ে বললাম, চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় দিতে হবে। প্রয়োজনের বেশি একটা আঘাতও যেন কারো শরীরে না লাগে। কোনমতেই যেন কেউ রক্তাক্ত না হয় এবং ভয় দেখিয়ে যতটা কাজ হাসিল করা যায়– তার চেষ্টা করতে হবে। খুব কৌশলে ছাত্রদের সভায় শ্রোতা হিসাবে যাবেন–ওরা যেন কোনক্রমেই টের না পায়। পুরো অপারেশনের দায়িত্ব ন্যস্ত করলাম সিটি এসপি সাহেবের ওপর। সময়ও বেঁধে দিলাম। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে মিশন সফল করতে হবে।

অপারেশনে যাবার কালে ওদের সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, মহিলাদের ওপর যেন কোন এ্যাকশন না নেওয়া হয়। তারা যাই কিছু করুক, তাদের আঘাত করা যাবে না। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তবে আমাদের মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে গণ্য হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

আমাদের এই মিশন ষোল আনা সফল হল। ছাত্রদের সভা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কে কোথায় চলে গেল, কে জানে। এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে ছাত্ররা মোটেই পরিচিত নয় বলে হয়তো এটা এতটা কামিয়াব হল। আমি স্বস্তি বোধ করলাম এইভেবে যে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করতে গেলে হয়তো বা অকালে অনেকগুলো প্রাণ ঝরে পড়তো।

একদিকে স্বস্তিবোধ করলেও অন্যদিক থেকে অশান্তির খবর এল। ঠিক সন্ধ্যা বেলা খবর এল সদরঘাট এলাকা থেকে পুলিশের গুলিতে তিন জন মারা গেছে ঘটনাস্থলেই। ট্রেজারীর দরজায় এক সুবেদার কর্মরত ছিল। উত্তেজিত জনতা কয়েকবার তার উপর চড়াও হবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। সম্ভবত সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিল না। পরে আরো লোক জমা হয়ে ট্রেজারীর ওপর ভয়ানক আক্রমণ করে। সুবেদারের শুধু ধৈর্যচ্যুতিই ঘটেনি, আত্মরক্ষার জন্য সে গুলি চালায়। তা ছাড়া ট্রেজারী লুট হবার আশংকাও ছিল।

নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও ও সদরঘাট–এই তিন জায়গায় গুলি চলেছে। মৃতের সংখ্যা এগার। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তদানীন্তন আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব জহিরুদ্দিনের সহযোগিতা নিলাম। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গাড়ীতে ঢাকার বিভিন্ন

www.pathagar.com

রাস্তা ঘুরলাম। তাঁকে বললাম কোন সরকারই লাশ জনতার হাতে তুলে দেবে না। সুতরাং তাঁর দলের এই দাবী প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি রাজি হলেন। তবে চাইলেন গায়েবানা জানাজার নামাজ যাতে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে জানালাম, মৃতের মধ্যে অমুসলিমও আছে। তাঁকে কথা দিলাম নামাজে জানাজায় কোন বাধা দেয়া হবে না এবং আমি নিজেও তাতে শরীক হবো বলে জানিয়ে দিলাম।

এরই মধ্যে একটা উত্তেজনাকর খবর পেলাম। আদমজী থেকে একটা বিরাট মিছিল আসছে ঢাকায়। এ ধরনের একটা মিছিল সত্যি সত্যি ঢাকায় ঢুকলে তা সামাল দেয়া হবে দুষ্কর। সুতরাং মিছিল যাতে ঢাকা শহরে ঢুকতে না পারে সেজন্য ইপিআরকে ডেমরার কাছে মোতায়েন করা হল।

আসলে এটা ছিল একটা গুজব। এ ধরনের সংকটের সময় নানা রকম গুজব জন্ম নেয়। গুজব সংকটকে আরো ঘনীভূত করে, আরো মারাত্মক করে তুলে।

মাগরেবের কিছুক্ষণ পর গেলাম গভর্নর হাউজে। মোনেম খান সাহেব চিফ সেক্রেটারীর সাথে বসে কথা বলছিলেন। চিফ সেক্রেটারী সাহেব আমাকে দেখেই জানতে চাইলেন– 'আজকের জন্য খেল খতম কিনা?' বললাম, 'স্যার কেবল আজকের জন্য কেন, হামেশার জন্যই এ খেল খতম।' তিনি আমার মন্তব্যকে মজাক মনে করে হাসলেন। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে সহানুভূতির সাথে বললেন, সারাদিন তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। এখন তোমার বিশ্রাম দরকার। বাসায় গিয়ে দু'ঘন্টা বিশ্রাম করে ফের এস।

গভর্নর সাহেব এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'শুনলাম আওয়ামী লীগের জহিরুদ্দিনের সাথে আজ খুব বেড়ালেন! বুঝতে পারলাম না গভর্নর সাহেব উষ্মা প্রকাশ করছেন না কৌতুক করছেন।' বললাম, 'ঠিকই শুনেছেন স্যার। আর সেজন্যই বলছি, এ খেল হামেশার জন্যই খতম। আগামীকাল, আশাকরি, কিছুই হবে না। তবে কাল বিকেল চারটায় ওরা বায়তুল মোকাররম এলাকায় গায়েবানা জানাজার নামাজের প্রোগ্রাম নিয়েছে। আমি নিজেও তাতে শামিল থাকব বলে ওদের কথা দিয়েছি।'

তাঁরা কেউই কোন মন্তব্য করলেন না। তবে তাঁদের চেহারায় ফুটে উঠা অভিব্যক্তি থেকে বুঝলাম, এতবড় একটা ব্যাপার এত সহজে মিটে যাবে, এটা তাঁরা বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

পরদিন পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী বায়তুল মোকাররমর দক্ষিণ গেইট এলাকায় গায়েবানা জানাজার নামাজ হল। আমি আমার কথা রাখলাম। আমি আমার গাড়ী নিয়ে স্টেডিয়ামের গেইটের কাছে রইলাম। সব কিছু হল শান্তিপূর্ণভাবে। কোথাও কোন গোলমাল, হট্টগোল নেই।

www.pathagar.com

তবে স্টেডিয়ামের ভিতরে হল প্রচন্ড গোলমাল। ঐদিন স্টেডিয়ামে চলছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলা। প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। জানি না কি কারণে দু'পক্ষের মধ্যে লেগে গেল হাতাহাতি, মারামারি। লোকজন মনে হল ইট ছুঁড়ে হাতের সুখ মেটাচ্ছিল। পুলিশ নীরব রইল না। কাল হরতালের সময় নিশ্চুপ থেকে যে ক্ষোভ জমেছিল অনেক পুলিশের মনে, তা আজ সুদে-আসলে মেটাল।

আমি স্টেডিয়াম থেকে সোজা গেলাম গভর্নর হাউজে। দৈনিক মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য।

অনুভব করলাম, আবহাওয়া হালকা। আমি ১৪৪ ধারা জারি না করায় আমার উপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে ক্ষোভ ছিল, মনে হল তাও নেই। সবাই বেশ রিলাক্সড মুডে আছে।

লাট সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা আজ কোন গোলমাল করল না, কারণটা কি?' বললাম, 'স্যার, কাল জহিরুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে গাড়ী করে শহরের অনেকটা এলাকা ঘুরেছি এবং এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাও বলেছি। তাঁকে আমার খুব রিজনেবল লোক বলে মনে হয়েছে। যুক্তি মানতে রাজি তিনি। তাঁকে যখন বুঝালাম যে, 'লাশ সরকার কোন অবস্থাতেই জনতার হাতে তুলে দিতে পারে না। লাশ একবার জনতার হাতে গেলে কি মারাত্মক আবেগের সৃষ্টি হবে এবং সে আবেগ জন্ম দেবে বিপর্যয় ও ধ্বংসের। এটা কারোই কাম্য হতে পারে না।' তিনি আমার যুক্তি মেনে নিলেন।

তা ছাড়া আমরা ১৪৪ ধারা জারি না করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছি, তা তাকে বললাম। তিনি আমাদের এই মনোভাবের তারিফ করলেন। তাঁকে যেখানে যেখানে গুলি হয়েছে সেসব জায়গার প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, 'আমরা কোথাও গুলি করার নির্দেশ দেইনি। পুলিশ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। যা কিছু হয়েছে তা ছিল স্থানিক সিদ্ধান্ত, ওপরের নির্দেশে নয়। তাছাড়া ঘটনার উপর যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল তাতে কিছুই গোপন করা হয়নি। সব সময় এ কাজটি করে থাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পলেটিক্যাল সেল-নানা রিপোর্টের ভিত্তিতে। কিন্তু এবার হয়েছে এর ব্যতিক্রম। আমি নিজে লিখে এটা জারি করেছি। ফলে প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে যা বিবৃত হয়েছে, কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠন তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেনি। মৃতদের পুরো পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়নি।

এরপর শুরু হল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের পালা। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার কাছে মনে হয়েছিল দারুণ অবিবেচনা প্রসূত কাজ। তাঁকে নিয়ে রীতিমত গ্রেফতার গ্রেফতার খেলা চলতে লাগল। একবার গ্রেফতার করা হয়

www.pathagar.com

একবার ছেড়ে দেয়া হয়, আবার গ্রেফতার করা হয় আবার ছেড়ে দেয়া হয়। ওপর মহলে যাঁরা এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তাঁরা কী সুকৌশলে শেখ মুজিবকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাচ্ছিলেন? আমার মত অনেকের মনেই এ প্রশ্ন দোলা খেতে দেখেছি।

এই গ্রেফতারীর প্রক্রিয়াটি শুরু হয় রাজধানী ঢাকা থেকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সাধারণ নিয়মে এই গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হত না। উঁচু মহলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত এবং কার্যকরী করা হত সরাসরি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে। নির্দেশ দেওয়া হত গভর্নর হাউজ থেকে।

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে জানান হল যে রাতে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হবে। শহরে এর কি প্রতিক্রিয়া হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাতে এসপি অবশ্য ফোনে জানালেন যে ভোর রাতে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার এই গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করতে যাবেন এবং নির্দিষ্ট বাড়ীটির প্রতি ইতিমধ্যেই নজর রাখা হয়েছে। তাঁকে বললাম যিনি যাচ্ছেন তাঁকে বলবেন তিনি যেন ভদ্র আচরণ করেন। কারণ তিনি সরকারী চাকুরে, আদেশ পালন করছেন মাত্র।

সকালে খবর পেলাম, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোন ঝামেলা হয়নি। যথারীতি আমার সদরঘাট অফিসে গেলাম। কাজ করছি ঠিকই কিন্তু কান খাড়া রয়েছে সব সময়ঃ এই বুঝি ডাক এল। এই ডাক আসতে পারে প্রধানত দু'জায়গা থেকেঃ সেক্রেটারিয়েট ও গভর্নর হাউজ।

প্রথম ফোন পেলাম বেলা দশটার দিকে। ত্বরিত উঠিয়ে নিলাম রিসিভার। না, যা ভেবেছিলাম তা নয়, সেক্রেটারীয়েট বা গভর্নর হাউজের ফোন নয়। ফোনের অপর প্রান্তে মিসেস মুজিব। তিনি জানতে চাইলেন আমি ঢাকার ডিসি বলছি কিনা। বললাম, জ্বি, আমি ঢাকার ডিসি বলছি। তিনি বললেন, 'দেখুন, আমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তিনি অসুস্থ। কিছু ঔষধ সঙ্গে রাখার জন্য তাঁকে দিতে চাই এবং সেই সাথে কিছু প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়। কিন্তু মুশকিল হল, গোয়েন্দারা বলছে জেলা পুলিশ সুপারকে বলুন, পুলিশ সুপার বলছেন আইজিকে বলুন, আইজি বলছেন ডিসিকে বলুন-তিনি অনুমতি দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন। এখন আমি কি আসব এই অনুমতির জন্য?'

আমি সত্যি একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লাম। কারণ রাজধানী ঢাকা ছাড়া সকল জেলাতেই ডিসিরা এই অনুমতি দিয়ে থাকেন। গ্রেফতারও তাঁরই হুকুমে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঢাকা গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক গ্রেফতার পরওয়ানা জারি হয়েছে। এখন ডিআইজি গোয়েন্দা বিভাগ অথবা আইজির সুপারিশে হোম মিনিস্ট্রি থেকে এই অনুমতি পাওয়া যাবে। এটাই নিয়ম। আমি তাঁকে বিষয়টি খোলাসা করে জানালাম। কিন্তু তিনি আমার কথা মানতে চান না। বললেন, আমি তো সবাইকে এ্যাপ্রোচ

www.pathagar.com

করলাম, কিন্তু আপনারা এ ওর কথা বলছেন, আমি কি করি? আমি বরং আপনার অফিসে আমি, তার পর যার কাছে যেতে বলবেন তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেব। আমি মিসেস মুজিবকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনার কষ্ট করে আর এখানে আসার দরকার নেই। আমি আধা ঘন্টার মধ্যে আপনাকে ফোনে জানিয়ে দেব কার অনুমতি নিতে হবে।

এসপি বললেন তাঁর কিছুই করার নেই। আইজি বা এসবি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ)-এর সাথে কথা বলে দেখতে পারেন।

আইজি মহিউদ্দীন সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি হেসে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, অনুরোধ যখন একটা এসেছে, এটার প্রোসেস করা প্রয়োজন।'

আমি বললাম, 'আপনারা একজন ভদ্র মহিলাকে এখানে-ওখানে যেতে বলছেন, বলুন। কিন্তু আমাকে অহেতুক এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন? আপনি জানেন এটা ঢাকার ডিসির এখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি। আপনারা অনুমতি দিতে না চাইলে সরাসরি তাঁকে সে কথাটা বলে দিন। তা না করে তাঁকে আমার কাছে পাঠাচ্ছেন। অথচ গ্রেফতারের ব্যাপারে বেচারা নগন্য ডিসির কোন পরামর্শই নেওয়া হয়নি। আর এখন এক হাস্যকর খেলায় এই ডিসিকেই জড়ানর চেষ্টা হচ্ছে। এটা কি ঠিক?' তিনি বললেন, 'আপনি ভয় পেয়ে গেছেন নাকি?' তাঁর কথা শুনে অবাক হলাম।

বললাম, 'এখানে ভয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কার কি দায়িত্ব বা এখতিয়ার সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে। পুলিশ প্রক্রিয়া পুলিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয়। রাজনীতির খেলা রাজনৈতিক পরিমন্ডলেই থাকুক। প্রশাসন যন্ত্র তার নিজ গন্ডির মধ্যে থাকলে আমরা ভালভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারব।'

আইজি সাহেবের সাথে যখন আবার এই নরমগরম আলোচনা হচ্ছে, গভর্নর হাউজ থেকে ফোন এল অবিলম্বে আমাকে সেখানে হাজির হতে হবে। ছুটলাম।

সেখানে দেখলাম লাট সাহেবের সাথে আইজি সাহেব বসে আছেন। কামরায় ঢুকবার সাথে সাথে তিনি আমাকে উদ্দেশ করে হেসে হেসে বললেন, 'ডিসি সাহেব, ফোনে তো খুব সহানুভূতির সাথে মিসেস মুজিবের সাথে আলাপ করলেন-কি ব্যাপার?' বুঝলাম আমার কথাগুলো ফোন থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। অর্থাৎ শেখ মুজিবের ফোনে যন্ত্র লাগান হয়েছে। তাছাড়া তাঁর কথার ধরণটা আমার খুব ভাল লাগল না। ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠলাম। কিন্তু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে বললাম, 'সহানুভূতি কেবল নয়, ভদ্রভাবেও কথা বলেছি। একজন ভদ্র মহিলার স্বামীকে আপনারা ভোর রাতে বাসা থেকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে গেছেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর স্বামীর সাথে দেখা করতে চান, ঔষধ ও প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

কাপড়-চোপড় দিতে চান। আইনসম্মত হলে তাঁকে তাঁর স্বামীর সাথে দেখা করতে দেবেন আর বেআইনী হলে স্পষ্ট করে কথাটা তাঁকে বলে দেবেন। কিন্তু এখানে তা করা হচ্ছে না। যে কারণেই হোক, ভদ্রমহিলাকে এর-ওর কাছে পাঠিয়ে হেরাস করা হচ্ছে।'

গভর্নর মোনেম খান নীরবে আমাদের কথোপকথন শুনলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

গভর্নর সাহেবের নীরবতা সম্ভবত আইজি সাহেবের জন্য ছিল অপ্রত্যাশিত। তিনি হয় তো আশা করছিলেন যে মোনেম খান সাহেব তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাকে অপদস্ত করবেন। কিন্তু সে রকম কিছু না হওয়ায় তিনি মরিয়া হয়ে ওঠলেন। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাত্র অবস্থায় কোন্ দলে ছিলেন?' এবার আমার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। কঠোরভাবে বললাম, 'এ প্রশ্নের জবাব আপনাকে দেবার প্রয়োজন নেই। আর কথা বলতে গিয়ে ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না, এটাই আমি আশা করি।'

আইজি সাহেব হঠাৎ কোন কথা খুঁজে পেলেন না। ক' মুহূর্ত সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কাটল। নীরবতা ভঙ্গ করে মুখ খুললেন গভর্নর সাহেবঃ 'মিসেস মুজিবকে এখনই দেখা করার অনুমতি দিতে হবে কেন?' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন। বললাম, 'তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হবে কি হবে না সেটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয়, ঢাকার ডিসির নয়। কিন্তু এসপি এবং আইজি বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁরা মিসেস মুজিবকে এই বলে আমার কাছে পাঠান যে আমিই অনুমতি দেবার মালিক তখন এটা আমার কাছে প্রতারণা বলে মনে হয়। আর আমি এই প্রতারণার শরীক হতে রাজি নই। আমি মনে করি, ডিসিরা যদি মানুষকে ধোঁকা দেবার কাজে নেমে পড়েন তবে প্রশাসনের অবস্থা কি হবে বুঝতেই পারছেন।'

মনে হচ্ছিল গভর্নর সাহেব বিতর্ক এড়াতে চাচ্ছেন। তিনি আমার কাছ থেকে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে সে সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এ ব্যাপারে আমার যা জানা ছিল, তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি আবার জানতে চাইলেন, শেখ মুজিবের সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখা করতে দিলে কোন অসুবিধা হবে কিনা? বললাম, একেবারে দেখা করতে না দেওয়া আইনানুগ হবে না। তা ছাড়া এটার একটা মানবিক দিকও আছে। এজন্য অহেতুক সরকারকে সমালোচনার মধ্যে পড়তে হবে। তবে পুলিশই এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবে যে মিসেস মুজিবকে তাঁর স্বামীর সাথে দেখা করতে দিলে কোন মারাত্মক ক্ষতি হবে কিনা!

www.pathagar.com

আরো কিছুক্ষণ গভর্নর হাউজে কাটিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এলাম। এসেই ওয়াদা মোতাবেক মিসেস মুজিবকে ফোন করলাম। তাঁকে বললাম, 'আইজি সাহেবের সাথে আমার কথা হয়েছে। এবার তিনি তাঁকে ফোন করে বিষয়টি জেনে নিতে পারেন।'

গভর্নর হাউজে উচ্চপর্যায়ের এক মিটিং চলছে ঃ দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করতে হবে এবং এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করতে হবে। এ মিটিং-এ ডিসিকে প্রধানত এ জন্য ডাকা হয়েছে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তাঁকে তা কার্যকর করতে হবে। তবে তাঁর যদি কিছু বলার থাকে তাও তিনি অনুমতি নিয়ে বলতে পারবেন।

আলোচনা চলছিল খুব জোরেসোরে। আমি চুপচাপ বসে আছি। আইন মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারীকে দেখলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে। প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁর মতামত চাওয়া হচ্ছিল। জানা গেল, মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা কোন সমস্যা নয়। কারণ, বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাঁকে আটকানর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী আছে।

আমার মতামত জানতে চাওয়া হল। আমি এর বিরোধিতা করলাম খুব দৃঢ়তার সাথে। কিন্তু আমার একমাত্র ভিন্নমত কোন গুরুত্বই পেল না।

মিটিং শেষে খানা ছিল। রাত প্রায় দুইটায় খাবার সময় লাট সাহেবকে বললাম, 'স্যার, ইত্তেফাক বন্ধের অর্ডার লিখতে দিয়েছেন আইন বিভাগকে আর কার্যকর করতে দিয়েছেন ইপসিক (বর্তমানে বিসিক)-এর চেয়ারম্যানকে। ওঁরা ইত্তেফাককে জালে আটকাতে পারবেন ঠিকই কিন্তু ডাঙ্গায় তুলতে পারবেন না।'

গভর্নর সাহেব সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেনঃ 'আচ্ছা দেখা যাবে।' তারপর তিনি খাবারে মনোযোগী হলেন। চিফ সেক্রেটারী সাহেব শুধু একবার আমার দিকে তাকালেন।

ইত্তেফাক বন্ধ হল। মানিক মিয়া গ্রেফতার হলেন। বিষয়টি জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। সর্বত্র এটা আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল। স্বভাবতই ইত্তেফাকের তরফ থেকে হাইকোর্টে মামলা হল। মামলায় সরকার হেরে গেল। সরকারকে ইত্তেফাক ছেড়ে দেবার হুকুম দিল হাইকোর্ট। তবে মানিক মিয়ার ডিটেনশন বহাল রইল।

মনে আছে, তখনকার হাইকোর্টের সামনের দিকে বিরাট একটা তেঁতুল গাছ ছিল। ঐ গাছের ছায়ায় নিজের গাড়ীতে বসে আছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সেকশন অফিসার শুনানির সময় ছুটে এসে বললেন, 'স্যার, মনে হচ্ছে সরকার কেসে হেরে যাবে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' তিনি বললেন, 'বিচারপতিরা যে সব প্রশ্ন করছেন

www.pathagar.com

সরকারী উকিল তার কোন যুতসই উত্তর দিতে পারছেন না।' তাঁকে বললাম, 'আমি কতগুলো ফাইল দিচ্ছি এগুলো সরকারী উকিলকে দিয়ে বলবেন এগুলো যেন বিচারপতিদের সমীপে পেশ করা হয়। আর এ অনুরোধও করবেন যে এগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ পেলে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।'

প্রায় এক ঘন্টা পর ঐ ভদ্রলোক প্রায় দৌড়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'স্যার, সরকার কেস জিতেছে। ডিটেনশন বহাল আছে। তবে স্যার যাই বলুন, এটা ঐ ফাইলগুলোর জন্যই সম্ভব হয়েছে। কারণ বিচারকরা ফাইলের পাতা উল্টাচ্ছিলেন আর চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছিলেন।'

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণদের জন্য কোন কামরাতেই ফ্যানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম বারের মত সরকারী অনুমোদন নিয়ে দু'টো কামরায় খুব উঁচুতে দু'টো সিলিং ফ্যান লাগানর ব্যবস্থা করা হল। একটি লাগান হল শেখ মুজিবের কামরায় আর অন্যটি মানিক মিয়ার কামরায়। তবে সুইচ রইল কামরার বাইরে।

সত্য কথা বলতে কি ঢাকা জেলার ডিসির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠলাম। গত পাঁচ বছর কাটিয়েছি দু'টো বড় বড় জেলায়–রাজশাহী ও মোমেনশাহীতে। পয়ষট্টির যুদ্ধের ধকলও আমাদের ওপর দিয়ে কম যায়নি। মনে না হলেও শরীরে এসেছে ক্লান্তি। তাই ফিকির খুঁজছিলাম অন্য কোথাও যাওয়া যায় কিনা?

আমি যে দায়িত্ব ছাড়তে চাচ্ছি তার আকর্ষণ ও জৌলুস কিন্তু কম নয়। ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রদেশের সব ডিসিরাই ঢাকার ডিসিকে হিংসে করেন। অনেকেই হয়তো স্বপ্ন দেখেন যে একদিন তাঁরা ঢাকার ডিসির দায়িত্ব পাবেন। কিন্তু এসব কিছুই আর আমাকে ধরে রাখতে পারছিল না। বিশেষ করে রাজনৈতিক ডামাডোল আমার মনকে অস্থির করে তুলেছিল। ঢাকায় সব সময় একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। একদিকে আছে মিটিং, অফুরন্ত আদেশ, রিকোয়েস্ট, ফোন আর অন্যদিকে সব কিছুর সাথে জড়িয়ে আছেরাজনীতি।

স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেখে ফেললাম অবাক হবার মত সব কান্ড কারখানা। রাজনৈতিক নেতাদের যে কত বিচিত্র রূপ থাকতে পারে, ঢাকার দায়িত্বে না এলে তা কখনো দেখার সুযোগ হত না। দিনে যাঁদের সভা করে সরকারকে গালাগাল করতে দেখেছি, রাত্রে আবার তাঁদেরই দেখেছি চাদর গায়ে (গ্রীষ্ম ও শীত সব মৌসুমেই) লাট ভবনে প্রবেশ করতে। সেখানে তাদের আনাগোনা ও নিভৃত আলাপচারিতা–মনে জাগিয়েছে বিস্ময় ও জন্ম নিয়েছে নানা প্রশ্নের। কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? জিজ্ঞেস করাই হয়তো মূর্খতা। কারণ রাজনীতিতে এসব চলেই। এটাই রাজনীতির নীতি।

www.pathagar.com

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনলাম, সমবায় দপ্তরের রেজিস্ট্রারের পদ খালি হচ্ছে। আমার ব্যাচমেট যিনি এ দায়িত্বে ছিলেন, পিন্ডি বদলি হয়ে যাচ্ছেন। এটার জন্য চেষ্টা করব কিনা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু মুশকিল হল মাত্র ছ'মাস আমি ঢাকা এসেছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে বদলির প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ মানতে চাইবেন বলে মনে হয় না। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না–মনে মনে ভাবলাম।

চিন্তা–ভাবনা করে বিষয়টি নিয়ে গভর্নর সাহেবের সেক্রেটারীর সাথে কথা বললাম। ভদ্রলোক তো আমার কথা শুনে হতবাক। তিনি প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব–এটা হতেই পারে না। লাট সাহেব কখনই রাজি হবেন না। আর চিফ সেক্রেটারী একথা শুনতেও চাইবেন না। সামনে বহুত ঝামেলা আছে, নাজির। সুতরাং চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেরে ফেলে দাও।'

তাঁর এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও আমি হাল ছাড়লাম না। বললাম, 'যদি আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি তবে তো কাউকে না কাউকে এ জায়গায় আসতেই হবে।' তিনি হেসে বললেন, 'সে ভিন্ন কথা। তবে এখন অসুস্থ হওয়াও চলবে না।' বুঝতে কষ্ট হল না যে খুব সহজে ডাল গলবে না।

একদিন সুযোগ বুঝে গভর্নর সাহেবের কাছে কথাটা বলেই ফেললাম। তিনি কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আলী আসগর (চিফ সেক্রেটারী) কে বলেছেন?' বললাম, 'না স্যার, এই প্রথম আপনাকে বলছি। আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। তা ছাড়া, এত টেনশন আর ক্রমাগত রাত জাগার ফলে আরো কাহিল হয়ে পড়েছি।' তিনি বললেন, 'রেস্ট নেন। দিনে ঘুমাবেন।' বললাম, 'আমি ঘুমালে ফোন ধরবে কে স্যার? আর মিটিং–এই বা হাজিরা দিবে কে? মুশকিল হল, প্রত্যেকেই ডিসিকে চান, অন্য কাউকে নয়। কারণ তাঁদের ক্ষমতা জাহিরের প্রথম ও প্রধান প্রকাশ হচ্ছে ডিসিকে হুকুম মত হাজির পাওয়া এবং ডিসির উপর সরাসরি অর্ডার জারি করা। মোনেম খান সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। এ ব্যাপারে পরে আপনার সাথে কথা বলব।'

সেদিনের মত একটুই। তবে মনে হল গভর্নর সাহেব বিষয়টি নিয়ে চিফ সেক্রেটারী সাহেবের সাথে কথা বলবেন। মনে মনে কিছুটা আশাবাদী হয়ে ওঠলাম।

কিন্তু এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ঘটল এক বিস্ফোরক ঘটনাঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ঢাকা গুজবের শহর বলে এমননিতেই নাম আছে। তার ওপর এমন একটা ঘটনা, গুজবের বন্যায় সবকিছু ভেসে গেল। বদলির ব্যাপারটা আপাতত চাপা পড়ে গেল।

www.pathagar.com

বাতাস ক্রমেই ভারী হয়ে আসছিল। সরকারী বড় কর্তাদের দিকে তাকালে তাঁদের চেহারায় যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠত তাতে মনে হত কোথায় যেন একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। সবাই হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কাউকে কাউকে বেশ আতঙ্কিতও মনে হচ্ছিল।

এ সময় হঠাৎ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ঢাকা আগমনের খবর এল। যথারীতি তাঁর সফর সংক্রান্ত করণীয় সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। এবার স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাহেবও আগের মত খোলামেলা নন। তিনিও বেশ গম্ভীর। এরই মধ্যে একদিন রাত এগারটার দিকে প্রেসিডেন্ট হাউজে (রমনা পার্কের পাশে) গেলাম। সেখানকার পরিবেশ দেখে রীতিমত অবাক হলাম। বসার কামরায় অনেক হোমরা-চোমরাকে দেখলাম নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। কিন্তু সবাইকে মনে হচ্ছিল ভীষণ গম্ভীর এবং চিন্তিত। লাট সাহেব একবার ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, কিন্তু আমাকে দেখার পরও তিনি আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। এ রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যখন ভাবছি ফিরে যাব কিনা, হঠাৎ করেই ন্যাশনাল এসেম্বলির লিডার সবুর খান সাহেব ভেতর থেকে বাইরে এলেন এবং আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে একটা সিগারেট অফার করলেন এবং আমার কাঁধে হাত রেখে এক কোণায় চলে এলেন। কোন ভূমিকা ছাড়াই তিনি বললেন, নাজির সাহেব, ভিতরে অবস্থা খুবই উত্তপ্ত। প্রেসিডেন্ট আমাদের সবাইকে বিশেষ করে মোনেম সাহেবকে চার্জ করেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র অফিসারদের অনেকেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে জড়িত। গভর্নর সাহেব অবশ্য জোরের সাথে এর প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, যেই রিপোর্ট দিয়ে থাকুন, তা বানোয়াট। এতে প্রেসিডেন্ট আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন যে তিনি কোন বানোয়াট-মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে কথা বলছেন না। তিনি যা বলেছেন তার সমর্থনে রয়েছে দলিল-দস্তাবেজ। তারপর প্রেসিডেন্ট দোতলার এক কামরা থেকে একটা রিপোর্ট আনিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেন। এ রিপোর্ট পড়ার পর মোনেম খান সাহেব নিশ্চুপ হয়ে যান।

আমি সবুর খান সাহেবকে বললাম, 'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই পিন্ডি থেকেই এ রিপোর্ট সম্পর্কে জানেন। যদি আপত্তি না থাকে দয়া করে বলবেন কি কোন্ কোন্ অফিসারের নাম আছে এ লিস্টে?' তিনি কোন রকম দ্বিধা না করে তিন-চার জন অফিসারের নাম বললেন এবং দু'-তিন জন প্রাক্তন অফিসারের নামও উল্লেখ করলেন।

সবুর খান সাহেব আমার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'যাঁদের নাম বললাম, চেষ্টা করে দেখুন এঁদের নাম লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া যায় কিনা। তবে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে যাতে কোন মতেই ব্যাপারটা জানাজানি না হয়ে যায়। আর সহকর্মীদের জন্য সত্যি সত্যি যদি কিছু করতে চান তবে এখনই কাজে নেমে পড়ুন, পরে শত চেষ্টা করেও কিছু করতে পারবেন না।'

www.pathagar.com

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, যে কাজটা সবুর খান সাহেব করতে পারবেন না, সেটা আমরা চুনোপুটিরা কি করে করব? এ সব ব্যাপারে জড়িত হওয়ার মানেই হচ্ছে জেনে-শুনে বিপদ ডেকে আনা। তবুও তাঁর অনুরোধটা ফেলতে পারলাম না। বললাম, 'ঠিক আছে স্যার, আমি আমার আওতার মধ্যে চেষ্টা করব কিছু করা যায় কিনা।' তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে জানতে চাইলাম, 'স্যার, যাঁদের নাম লিস্টে আছে তাঁদের ঘটনার সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি আপনি বিশ্বাস করেন?' তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে পরে বিষন্ন কণ্ঠে বললেন, 'না করে উপায় নেই।'

সবুর খান সাহেবকে খোদা হাফেজ বলে যখন বাসায় ফিরলাম তখন মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কিভাবে এগুবো। এস এন্ড জি-এর ডেপুটি সেক্রেটারীকে ফোন করলাম। ফোন অপর প্রান্তে বাজতে থাকল দীর্ঘক্ষণ, কিন্তু কেউ উঠালেন না। রিসিভার রেখে আবার বেরুলাম। দু'-এক জন ঘনিষ্ট সহকর্মীর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। এই গভীর রাতে ওঁদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলাম। আমরা এ ব্যাপারে একমত হলাম যে এটা উঁচু মহলের বিষয়। আমাদের লেভেল থেকে আসলে কিছুই করার নেই। আর যাঁদের নাম বলা হয়েছে তাঁরা যদি সত্যি সত্যি ঘটনার সাথে জড়িত থাকেন-এবং থাকাটা বিচিত্রও নয়-আমরা কেন খামাকা তাঁদের পক্ষ নিতে যাব? তবে মানবিক কোন সাহায্যের প্রশ্ন উঠলে আমরা যতটা সম্ভব তাঁদের পাশে থাকব।

আমি আমার বদলির বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম এবং মওকা খুঁজছিলাম গভর্নর সাহেবকে আরেকবার এ্যপ্রোচ করার জন্য। মওকাও পেয়ে গেলাম শিগগিরই। পিন্ডিতে নিয়মিত গভর্নরস মিটিং। চিফ সেক্রেটারী চলে গেছেন তিনদিন আগে আর গভর্নর সাহেব যাচ্ছেন দু'দিন পর। গভর্নর সাহেবকে একদিন একা পেয়ে ধরলাম, স্যার, আমার বদলির ব্যাপারটা একটা কিছু করতেই হবে আপনাকে। তিনি তো প্রথমে আমার কথাই শুনতে চান না। কিন্তু আমার নাছোড় ভাব দেখে নরম হলেন এবং জানতে চাইলেন আমার জায়গায় কাকে আনা যায়? বললাম, 'স্যার, এটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে।'

এ ব্যাপারে গভর্নর সাহেবের সাথে আমার কিছু গোপন কথা হল। সেই মোতাবেক মোমেনশাহী ও ফরিদপুরের ডিসিকে এক রাতে আমার ঢাকার বাসায় খাবার দাওয়াত করলাম। দু'জনই এলেন। এক সাথে আমরা খেলাম এবং অনেক গল্প-গুজব করলাম। বিদায়ের আগে ফরিদপুরের ডিসি এম কে আনো য়ারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, 'জলদি গাট্টি-বোচকা বেঁধে তৈরি হোন। অর্ডার যাচ্ছে ত্বরিত এসে ঢাকার দায়িত্ব নিতে হবে।' তিনি অবাক হলেন, প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। তারপর ভীতি প্রকাশ করে বললেন, 'ঢাকায় অনেক ঝামেলা। আর তা

www.pathagar.com

ছাড়া এত তাড়াতাড়ি কেন?' বললাম, 'ওজর করলে এ সুযোগটা হারাবেন। আপনার প্রতি লাট সাহেবের আস্থা আছে। তিনি চান আপনিই ঢাকার দায়িত্ব নিন। আপনি ফরিদপুরে হেলিকপটার দুর্ঘটনার পর ভাল কাজ করেছেন বলে তিনি আপনার কথা মনে রেখেছেন।'

পরদিন আমার বদলির নির্দেশ পেলাম। কোঅপারেটিভ রেজিস্টার হিসাবে নতুন দায়িত্ব পাচ্ছি আমি। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত চিফ সেক্রেটারী একটা ফ্যারকা বাজিয়ে দিলেন। বললেন, চিফ সেক্রেটারী ফিরে না আসা পর্যন্ত চার্জ দেওয়া-নেওয়া যাবে না। আবার লাট সাহেবের কাছে ছুটলাম। কারণ আমি ভাল করেই জানতাম যে চিফ সেক্রেটারী ফিরে এলে তিনি সব ভন্ডুল করে দেবেন নানা অজুহাত খাড়া করে। সুতরাং যা কিছু করার তাঁর অনুপস্থিতিতেই করতে হবে। যাই হোক, গভর্ণর সাহেব ইজ্জত রক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত ঢাকার ডিসির দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলাম। আমার মনে হল কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এসেছি। ক'দিন খুব ঘুমালাম। শান্তির ঘুম। কিন্তু আলী আসগর সাহেব তাঁর অনুপস্থিতিতে সংঘটিত এই কর্মের জন্য আমাকে কোন দিনই ক্ষমা করেন নি। এক দিক থেকে বলতে গেলে পরবর্তীতে এ জন্য আমাকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছে।

তিন বছরেরও বেশী সময় সমবায়ে থাকতে হল। ভাল মন্দ নানা অভিজ্ঞতা হল। সে অনেক কথা, তবে যেহেতু এ সবই ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা তাই তিন বছরের ইতিবৃত্ত শোনাবার ইচ্ছা নেই। তা ছাড়া, আমি প্রায় হলফ করেই বলতে পারি যে এ সব কথা বলতে গেলে এমন কেউ নেই যে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না। তবে এর মধ্যেও এমন কিছু ঘটনা আছে যা বিবৃত করা সম্ভবত এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

চট্টগ্রামের বদরখালী একটি অখ্যাত গ্রাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি গ্রাম্য কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠান। আমরা অনেকেই এই সমবায় সংস্থাটির খবর জানতাম না। এই গ্রামের বাসিন্দা যারা তারা প্রায় সকলেই সামাজিক অপরাধে দন্ডিত। এক বৃটিশ রাজ কর্মচারী এদের এখানে বসিয়েছিল। সারা গ্রামের হাজার হাজার একর কৃষি জমি যৌথ খামার প্রথায় চাষাবাদ হয়। মজার কথা হল কোথাও কোন জমির আইল নেই। ব্লক অবশ্য আছে। তবে সমবেতভাবে সবাই এ সব জমি চাষ করে এবং ফসল ভাগ করে নেয়। নিজেদের মধ্যে কখনো কোন গোলমাল লাগলে এদেরই মনোনীত লোকদের নিয়ে গঠিত একটা আদালত বা কোর্ট আছে- সেখানে বিচার বা শালিস হয়। হাটবাজার, স্কুল, মসজিদ ইত্যাদি সব কিছু তাদের এই যৌথ ব্যবস্থায় চলে। আইল ছাড়া জমিগুলো দেখতেও ভাল লাগে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা নামক মহা সমুদ্রের মধ্যে এ যেন একটা ছোট্ট দ্বীপ। এদের দুর্ভাগ্য সম্ভবত এটা যে সরকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকতে হয়েছে তাদের। আর সৌভাগ্য এটা

www.pathagar.com

যে এখানে যা কিছু আছে সবই তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় হয়েছে এবং এ জন্য তারা গর্বিত। আমি একথা শুনে কম বিস্মিত হইনি যে এই গোটা এলাকা থেকে সে বছর একটা মামলাও মহকুমা কোর্টে যায়নি। অথচ ঢাকার সমবায় কর্মকর্তাদের নেক নজর অদূরে পড়ে থাকা এই সমবায় সমিতিটির উপর যে খুব একটা পড়েছে, তা মনে হয় না।

রেজিষ্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে একটা ঘটনা আমার মনে প্রচন্ড দুঃখ দিয়েছিল। এ কথা আমি নিঃসংকোচে বার বার বলেছি যে আমি আমার কর্ম জীবনে আখতার হামিদ খান সাহেবকে আমার আদর্শ মনে করতাম। তিনি ছিলেন প্রকৃতই কর্মবীর। আমি এসডিও থাকাকালে তিনি এটা চেয়েও ছিলেন যে আমি তাঁর কুমিল্লার একাডেমীতে যোগদান করি। রাজি হইনি।

তিনি এ সময় একটা নতুন সমবায় পদ্ধতি চালু করেন–সবাই এটাকে কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় বলে জানে। খান সাহেব কখনো চাইতেন না যে রেজিস্টার বা তাঁর কোন প্রতিনিধি তাঁর ঐ নতুন পদ্ধতিতে নাক গলাক। ঢাকা এলে অবশ্য তিনি রেজিস্টারের সঙ্গে মাঝে–মধ্যে সাক্ষাৎ করতেন। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই –এর বেশী কিছু নয়। রেজিস্টার কুমিল্লা সফরে গেলে খান সাহেব বড়জোর তাঁকে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য কিছুক্ষণ সময় দিতেন মাত্র। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং সরকারের উচ্চ মহলে তাঁর প্রভাব, বেচারা রেজিস্টারদের কাবু করেই রেখেছিল বলতে হয়।

সমবায় সমিতির রেজিস্টারের মূল দায়িত্ব হল, সমিতি রেজিস্ট্রি করা, কাজ কর্ম সমবায় আইনে পরিচালিত করা আর যেহেতু জনসাধারণের আমানত ও সঞ্চয়ের টাকা পয়সা নিয়েই কাজ–কারবার তাই সমিতির তহবিল অডিট করান। কাগজপত্র থেকে জানতে পারলাম, কুমিল্লা একাডেমীর সৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত কোন সমিতিরই কোন অডিট হয়নি জন্ম–লগ্ন থেকেই। অফিস আমাকে জানাল যে আখতার হামিদ খান সাহেব নাখোশ হবেন এ কারণে ওখানে অডিট করা হয় না। কুমিল্লা থানা সমবায় সমিতি বা কেটিসিসি–এ হল খান সাহেবের প্রধান পরীক্ষামূলক নতুন সমবায় সমিতি।

অডিটের বিষয়টি আমাকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছিল। কেউ নাখোশ হবেন–এ কারণে অডিট হবে না, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমি একজন ঝানু সহকারী রেজিস্টার ও দু'জন পাকা ডিস্ট্রিকট অডিটর নিয়ে একটা অডিট টিম গঠন করলাম এবং সমবায় আইন অনুসারে তাঁদের খান সাহেবের সমিতির গত সাত বছরের হিসাব অডিট করার নির্দেশ দিলাম। ব্যাস, খান সাহেব দারুণ চটে গেলেন। অডিট টিমের সদস্যরা জানালেন যে তাঁদের সাথে সহযোগীতা তো করা হচ্ছেই না বরং দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। নিজে গেলাম সেখানে। অফিসারদের বললাম, 'অসীম ধৈর্যের সাথে করতে হবে এ কাজ। কারণ খান সাহেব আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কোন মতেই

www.pathagar.com

তাঁর মনে দুঃখ দেওয়া যাবে না। তবে আমরা আমাদের আইনানুগ দায়িত্ব পালন করবই– এ ব্যাপারে কোন আপোষ নেই।'

সকালে খান সাহেব এলেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম, বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি না বসে এক পা সেই চেয়ারের উপর তুলে বললেন, 'নাজির, এরা কি চায়?' বললাম, 'স্যার, এরা অডিট করতে এসেছে।' তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'কেন?' আমি বুঝতে পারলাম তিনি ভীষণ রেগে এসেছেন। তাই, খুব সংযত ভাবে বললাম, 'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এটা সমবায় আইনের অবশ্য করণীয় কাজ। গত কয়েক বছর এ জরুরী কাজটি করা হয় নি। তাই এখন ওরা এসেছে সমস্ত বকেয়া কাজ করতে।' খান সাহেব নিরুত্তর রইলেন। আমি বললাম, স্যার, আপনার দফতরকে এঁদের সাথে একটু সহযোগিতা করতে বলে দিন না! আপনি বলে দিলে তো আর কোন ঝামেলাই থাকে না, স্যার।

খান সাহেব তাঁর অফিসকে কি বলেছিলেন জানি না। তবে এ অডিট টিম তাঁর এবং তাঁর লোকদের কোন সহযোগিতাই পায় নি। অধিকন্তু, যতরকমের বাধা দেওয়া সম্ভব তার কোনটাই বাকী রাখা হয়নি। তবে এ অডিট টিমের যিনি প্রধান সেই সহকারী রেজিস্টার সাহেবও ছাড়বার পাত্র নন। তিনিও লেগে রইলেন। কিন্তু আমার রেজিস্টার থাকা কাল সময়ে যাতে এ অডিট শেষ না হয়,খান সাহেবের অফিস সে ব্যবস্থাও করেছিল। একটা সাময়িক রিপোর্ট অবশ্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল। এতে দেখা যায় যে কেবলমাত্র সরকার থেকে যে সব টাকা–পয়সা কেটিসিসি–এ পেয়েছিল তারই জমা–খরচের কাগজপত্র অডিট টিমের সামনে পেশ করা হয়েছিল। অন্যান্য সূত্রে মোটা অংকের যে সব অর্থ পাওয়া গেছে তার হিসাব দেখান হয় নি। আমি চলে আসার পর শুনেছি যে এক বিরাটকায় রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সেই রিপোর্ট আর কোন দিন সূর্যের আলো দেখতে পায় নি। আর জনাব আখতার হামিদ খানও আমাকে সম্ভবত কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন নি আমার এই বেয়াদবীর (?) জন্য।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে জনাব খান সমবায় আন্দোলনে তথা এ দেশের পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অনন্য অবদান রেখে গেছেন। কুমিল্লার চেহারাই পাল্টে দিয়েছেন তিনি–নতুন সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে। এটা আর্ন্তজাতিকভাবেও স্বীকৃত। এত কিছুর পরও তাঁকে ১৯৭২ সালে অস্বাভাবিকভাবেই চলে যেতে হয়েছিল এ দেশ থেকে। ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক।

আমার সমবায়ের রেজিস্টারের জীবনে একটা ছোট্ট কিন্তু মজার ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন চিফ সেক্রেটারীর কাছ থেকে একটি আদেশনামা পেলাম। মিন্টো রোড, বেইলী রোড ও হেয়ার রোড এলাকায় সরকারের উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তারা বসবাস

www.pathagar.com

করেন। তাঁদের আবার কারো কারো গরু পোষার নেশা। কারো কারো চাপরাশীদেরও এ নেশা ছিল আরো প্রবল। ফলে এ এলাকার গরুগুলো নানা সমস্যার সৃষ্টি করত।

বড় লোকের গরু তাই প্রায়ই ছাড়া থাকত। এরা অন্যের বাগানে ঢুকে পড়ত সুযোগ পেলেই, আর একবার বাগানে ঢুকতে পারলে বাগানের হত সর্বনাশ। সখের বাগান তছনছ করে দিত কিছুক্ষণের মধ্যেই। তা ছাড়াও এসব আরাম প্রিয় গরুগুলো রাস্তায় এসে শুয়ে থাকত নির্বিকার। গাড়ীঘোড়া চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হত।

একদিন এক বেরসিক কর্মকর্তা চিফ সেক্রেটারীর কাছে গরুর বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করলেন। ফাইল খোলা হল। ফাইলে নানা রকম নোটিং হল। শেষ-মেশ চিফ সেক্রেটারী সাহেব হুকুম করলেন সমবায় রেজিস্টার একটি সমবায় সমিতি গঠন করুক।

ফাইলটা আদ্যোপান্ত পড়লাম। খুব হাসলাম একা একাই। আমার সমগ্র চাকরী জীবনে এমন মজার ঘটনা আর ঘটেনি কখনো। যাই হোক, ফাইলে লিখলাম, 'চিফ সেক্রেটারী সাহেবের হুকুমনামা দেখলাম। সমবায় সমিতি গরুদের নিয়ে না গরুর মা-লিকদের নিয়ে গঠন করা হবে সেটা স্পষ্ট করে নির্দেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হল।' এই ব্যাখ্যা চেয়ে সমবায় মন্ত্রনালয়ের সেক্রেটারী বরাবর ফাইল ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। এই বলে যে বিষয়টি চিফ সেক্রেটারী সাহেবের নিকট থেকে আমার কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে বাধিত করা হোক। এ ফাইল আর কখনো ফেরৎ আসেনি।।

শুনলাম, সমবায় দফতরের বড় বড় কর্মকর্তারা বাইরে ট্যুরে গেলে খানাদানার জাঁকাল ব্যবস্থা হয়। এটা নাকি বহু যুগের রীতি। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগে নি। তাই এই প্রথা বা ট্রাডিশন ভাঙ্গার জন্য নির্দেশ দিলাম কাজে যোগদান করার কিছুদিন পরই।

এক রমজান মাসে ঢাকা থেকে সড়ক পথে খুলনা এবং খুলনা থেকে ডিসির লঞ্চ নিয়ে সুন্দরবন এলাকায় মৎস সমবায়গুলো দেখার জন্য ট্যুরে যাব স্থির করলাম। রওয়ানা হবার কিছু আগে ওখানকার ডেপুটি রেজিস্টারকে ফোনে পরিস্কার বলে দিল-াম যে আমি সার্কিট হাউজে উঠব। ওখানে সন্ধ্যায় যখন আমি পৌঁছব, কারোরই থাকার দরকার নেই। কারণ রোজা-রমজানের দিন। পরদিন ভোরে আপনারা এসে সাক্ষাৎ করবেন। তারপর আপনাকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবন রওয়ানা হয়ে যাব। আর আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও আমার সাথেই থাকবে; সেহেরির ব্যবস্থাও আমার পিয়ন-যে আমার সাথে যাচ্ছে-সেই করবে।

ইফতারির ঘন্টাখানেক আগে খুলনা সার্কিট হাউজে পৌঁছলাম। দেখলাম ঐ অঞ্চলের অনেক অফিসার আর সমবায় সমিতিগুলোর চেয়ারম্যান ও সদস্যরা উপস্থিত

www.pathagar.com

হয়েছেন। তাঁদের সাথে পরিচয় পর্ব শেষ করে তাঁদের চলে যেতে বললাম। আমার কথা শুনে দেখলাম একজন অন্যজনের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁদের চাহনিতে এক রাশ বিস্ময়।

ডেপুটি রেজিস্টারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, 'এ কি করেছেন? আপনাকে তো আগেই জানিয়ে ছিলাম কারো থাকার দরকার নেই। এত লোক কেন ডেকেছেন? তাঁদের যেতে বলুন।' ভদ্রলোক আমার কথা মত কাজ না করে আমাকে যেন কি একটা বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতেও পারছিলেন না। তাঁকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর কোটের বুক পকেটে দেখলাম একটা লম্বা ফর্দ অর্ধেক বেরিয়ে আছে। তাতে কি সব লেখা। কৌতূহল দমন করতে না পেরে কাগজটা টান দিয়ে নিয়ে নিলাম। হ্যাঁ, যা সন্দেহ করেছিলাম এটা তাই।

এতে যে সব অফিসার রেজিস্টারের সফর উপলক্ষে ইফতার ও খানার জন্য চাঁদা দিয়েছেন বা দেবেন একপাশে তাঁদের নাম এবং অন্যপাশে টাকার অংক লিখিত। এ ছাড়াও সমবায় ব্যাংক ও সমবায় সমিতিগুলোর নামে মোটা মোটা অংকের চাঁদা ধার্য করা হয়েছে। আমি ফর্দটা পড়ছি আর আড় চোখে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাচ্ছি তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। তিনি মুহূর্তের মধ্যে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছেন। এ অবস্থায় কি করবেন বা কি বলবেন স্থির করতে না পেরে যেন আরো অসহায় হয়ে পড়েছেন।

দুই পৃষ্ঠার লম্বা তালিকাটা পড়া শেষ করে বললাম, 'আপনি তো এখানে সমবায়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি– লিস্টে আপনার নাম দেখছি না কেন?' তিনি নিরুত্তর রইলেন। বললাম, 'আপনাকে কি ফোনে নিষেধ করিনি এ সব করতে?' কোন জবাব পেলাম না। বললাম, 'কাল আপনার আমার সাথে যাবার দরকার নেই। আমার ফিরে আসার দিন আপনি এঁদের সমবায় ব্যাংকের মিটিং হলে জমায়েত করবেন এবং তার আগেই এঁদের প্রত্যেককে তাঁদের চাঁদার টাকা ফেরৎ দেবেন। মনে রাখবেন, ঐ মিটিং–এ আমি এঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করব যে তাঁরা তাঁদের চাঁদার টাকা ফেরৎ পেয়েছেন কি না। আর ভবিষ্যতে তাঁরা যাতে এ জাতীয় কাজ না করেন–সে অনুরোধও করে যাব।'

এবার ভদ্রলোক মুখ খুললেন। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, ভুল হয়ে গেছে। দয়া করে এবারের মত এটা কবুল করুন। সব প্রস্তুত স্যারঃ ইফতার, ডিনার।' বললাম, 'দেখুন, মেহেরবাণী করে আমাকে এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করবেন না। সফরে সারাদিন নাকে–মুখে ধুলো খেয়েও রোজা ভাঙ্গিনি। আপনার এই ডিনার খেয়ে সারাদিনের সযতনে রক্ষিত রোজাটা বরবাদ করার মত উদারতা আমার নেই।' তিনি হয়তো আরো অনুরোধ–উপরোধ করতেন। কিন্তু আমি তাঁকে সে মওকা আর দিলাম না। বললাম, 'কথা বাড়াবেন না। আপনারা এখান থেকে গিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। আর

www.pathagar.com

কালকে যা যা করতে বলেছি তা করুণ।' বলে নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। হ্যাঁ, চাঁদার ঐ লিস্টটা কিন্তু নিজের কাছেই রেখে দিলাম।

সমবায় দফতরে যোগ দিয়েই এ ভদ্রলোকের সুনাম শুনেছিলাম যে তিনি ওপরওয়ালাদের খাতির-আপ্যায়নে ভীষণ পারঙ্গম ও উদার।

সুন্দরবন ঘুরে এসে কথামত চাঁদা দানকারীদের সভায় মিলিত হলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে সবাই অবশ্য জানালেন যে তাঁরা তাঁদের চাঁদার অর্থ ফেরৎ পেয়েছেন। সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিভিন্ন সমিতির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বললাম তাঁরা যেন চলতি মাস, গত ও আগামী মাসের মাসিক আয়-ব্যয়ের ট্রায়েল ব্যালেন্স সদর দফতরে আমার নামে পাঠান। খুলনা সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সভাপতি সাহেব আপত্তি উত্থাপন করে বললেন, 'স্যার, এটাতো সব সময় আমরা করে থাকি-ওপরে পাঠানর রেওয়াজ নেই।' এঁর কথা শুনে একটু অবাক হলাম। কারণ এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে একটা সার্কুলারও ইস্যু করা হয়েছে। আমি সার্কুলারের কথাটাই শুধু এঁদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলাম। বললাম, 'করে থাকেন সত্য, কিন্তু এই অভ্যাস বন্ধের কোন সার্কুলার পেয়েছেন কি?' বললেন, 'জ্বি স্যার, সার্কুলার পেয়েছি।' এবার একটু তপ্ত কণ্ঠে বললাম, 'পেয়ে থাকলে সার্কুলারটা সার্কুলারদানকরীর মুখের উপর ছুঁড়ে দিচ্ছেন কেন? এটা কি ঠিক কাজ হল? শুধু আপনাদের নয়, সারা প্রদেশে কঠিন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এখন থেকে এই বদ অভ্যাসটি বন্ধ করতে হবে এবং যাঁরা এই নির্দেশ লংঘন করবেন তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে এবং তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে আসার আগেও আপনাদের ডিভিশনের ডেপুটি রেজিস্টারকে আমি নিজে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি। তারপরও এ নিয়ে আপনারা আপত্তি করছেন।' ভদ্রলোক আর কোন কথা বললেন না,নীরবে তাঁর সিটে বসে পড়লেন।

ঢাকা ফিরে এলাম যথা সময়ে। ডেপুটি রেজিস্টারের নামে নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে লিখলাম। পদমর্যাদায় তিনি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা। তাই বেশ উঁচু পর্যায়ের তদন্ত হল তাঁর বিরুদ্ধে এবং পরিণামে তিনি চাকুরীচ্যুত হলেন।

আমার খারাপ লাগে এই ভেবে যে সার্কুলার পাবার পরও তিনি নিজেকে শুধরে নিতে পারেন নি। আসলে ওপরওয়ালাদের খুশী করার জন্য একশ্রেণীর কর্মকর্তা সব সময়ই বাড়াবাড়ি ও আতিশয্য করে থাকেন। এটাকে অনেকে ওপরে ওঠবার সিঁড়িও মনে করেন। আর শুনেছি সমবায়ে নাকি এ ট্রাডিশন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কোন একটা উপলক্ষ্য খুঁজে বের করে চাঁদা তোলা এবং সে টাকার কিছু খরচ করা আর কিছু উপরি আয় হিসেবে ভোগ করা। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরও যে সে ট্রাডিশন লুপ্ত হয়েছে- এমন কথা হলফ করে বলতে পারব না। কারণ এই বিষ আমাদের মজ্জায়

www.pathagar.com

ঢুকে গিয়েছিল অনেক আগেই।

সমবায়ে থাকাকালে একবার মাছ ধরা ট্রলারে সেন্ট মার্টিন গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে বিভিন্ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করতে করতে একদিন হাজির হলাম চট্টগ্রামে। সমবায় দফতরের একটা মাছ ধরা ট্রলার ছিল– নাম তার সায়েরা। পরদিন সকালে আমরা সায়েরায় সওয়ার হলাম। নাফ নদীর ওপর একটা দু' কামরার ছোট্ট ডাক বাংলো আছে– দূর থেকে মনে হয় ওটা যেন নদীর উপর ঝুলছে। এর ঠিক পিছনেই সড়ক এবং তারপর সুউচ্চ পাহাড়।এই দেশে এত সুন্দর ডাকবাংলো আছে, কখনো ভাবতেও পারি নি। চৌকিদার বলল কখন কখন বুনো হাতী পানি খেতে আসে এখানে। নাফ নদীর পানি স্বচ্ছ নীল–শান্তভাবে বয়ে যাচ্ছে। ভারী সুন্দর লাগে। এলাকাটা আমার কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের সোয়াতের মত মনোরম লাগছিল।

কিছুক্ষণ পর সায়েরায় চড়ে আমরা সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে পাড়ি জমালাম। প্রচন্ড ঢেউ এ সায়রা উথাল–পাথাল করছিল। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চিংড়ি ভাজা খাবার আসর বসান হল। আমাদের সফর সঙ্গী দু'জন ডেপুটি রেজিস্টার ও কয়েকজন অফিসারের সাথে সায়েরার ক্রুরাও এ আসরে শামিল হল। একজন ডেপুটি রেজিস্টার ঢেউ সহ্য করতে না পেরে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। আমরা যখন খেতে বসেছি তখন তিনি বমি করতে লাগলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এ অবস্থায় খাওয়া যায় না। আমরা ভাবলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি যখন সুস্থ বোধ করবেন, চিংড়ি ভাজা খাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হল না। ভদ্রলোক স্বল্প বিরতি দিয়ে দিয়ে বমি করছিলেন। আমরা খাওয়া ভুলে তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

এই অবস্থায় সেন্ট মার্টিন পৌছলাম। শুনলাম এ দ্বীপে হাতে গোণা একশ কয়েকটি বাড়ী আছে। একটি প্রাইমারী স্কুল আছে এখানে আর আছে একটি জীর্ণ–শীর্ণ মসজিদ। কোন পুলিশ চৌকি দূরে থাক একজন পুলিশও নজরে পড়ল না। তবে এখানে আছে একটি ইপিআর ক্যাম্প। একজন সরকারী কর্মকর্তা ঢাকা থেকে আসছেন শুনে প্রাইমারী স্কুলটির একমাত্র শিক্ষক আমাদের পৌছার কিছুক্ষণ আগে সাম্পান যোগে হাজির হয়েছেন তাঁর কর্মস্থলে। শুনলাম তিনি ওখানে থাকেন না।

আমরা সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বাড়ী–ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আমরা বুঝতে পারলাম এ দ্বীপটি বার্মা ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যে স্মাগলিং হয় তার ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বার্মার মুদ্রা দেশী মুদ্রার মতই খোলাখুলি আদান প্রদান হচ্ছিল। শুনলাম, যে পরিমাণ জিনিস বার্মায় স্মাগলিং হয় তার চেয়ে অনেক কম মা–লামাল চোরাপথে আসে।

সমবায় কি বস্তু– এ সম্পর্কে এখানকার লোকজন কিছু জানে বলে মনে হল না। সুতরাং তার রেজিস্টার তাদের কোন আগ্রহের বিষয় হতে পারল না। ঘন্টা দুই

www.pathagar.com

এদিক-সেদিক বিচরণ করে আমরা ফিরে এলাম সায়েরায়। এবং কাল বিলম্ব না করে আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় পৌছালাম কক্সবাজারে।

এক রোববার সকালে চিফ সেক্রেটারী আলী আসগর সাহেব তাঁর বাসায় আমাকে সাক্ষাত করতে বললেন। হাজির হলাম। আগেই বলেছি তিনি কথা কম বলেন। তার ওপরে, তিনি বেশ ফরমাল। একটা বড় খাম হাতে নিয়ে ভেতর থেকে সোজা এসে তিনি আমার পাশে বসলেন। মনে মনে শংকিতই হলাম। কোন গুরুতর ব্যাপার নিশ্চয়ই। রুদ্ধ শ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

নীরবে খামটা খুলে একটা চিঠি তিনি আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব এই চিঠি পাঠিয়েছেন। সাত দিনের মধ্যে এর জবাব পাঠাতে হবে। অতি গোপনে কাজটি করে আমার কাছে রিপোর্ট দিবে।

গভীর ঔৎসুকের সাথে চিঠিটার ওপর নজর বুলালাম। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব লাট সাহেবের নামে এটা লিখেছেন। এর মোদ্দা কথা হচ্ছে- ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন কিনা এবং নিয়ে থাকলে তা আদৌ পরিশোধ করেছেন কিনা!

পরদিন দফতরে গিয়ে একজন প্রধান সহকারী রেজিস্টারকে একান্তে ডেকে বললাম সরকারী কর্মকর্তা ও সমাজের বড় বড় ব্যক্তিরা সমবায় ব্যাংক থেকে কে কত লোন নিয়েছেন এবং কেউ লোনের টাকা ফেরৎ দিয়ে থাকলে তার তারিখ সহ একটা তালিকা তৈরী করতে হবে। কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত এটা করতে হবে, তাও তাঁকে বলে দিলাম। এও বলে দিলাম যে এটা অত্যন্ত গোপনে করতে হবে। কারও সাহায্য নেওয়া যাবে না।

তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন আমার নির্দেশ মোতাবেক কাজটি করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। কিন্তু যখন তাঁকে বললাম যে চারদিনে এ কাজটি করতে হবে তিনি আঁতকে উঠে বললেন, 'এ কি করে সম্ভব, স্যার!' তাঁকে শান্ত করে বললাম যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীষণ জরুরী। এটা করতেই হবে এবং তাঁর মত নিষ্ঠাবান ও অভিজ্ঞ অফিসাররাই এটা করতে পারেন।

তিনদিন পর এক সন্ধ্যায় আমার বাসায় একটা ছয়-সাত পাতার লিস্ট নিয়ে হাজির হলেন ঐ অফিসার। এটা পড়ে সত্যি এক অজানা জগতের সন্ধান পেলাম। সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের হোমরা-চোমরাদের নাম ছিল এই লিস্টে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এমন সব ব্যক্তিদের নামও ছিল যাঁরা কখনো লোন পরিশোধ করেন নি- সে সব নাম উচ্চারণ করতে আমার আজো দ্বিধা হচ্ছে। সে চেষ্টাও করব না। তবে যে ব্যক্তির জন্য এই তালিকা প্রস্তুত করতে হয়েছিল তিনি

www.pathagar.com

সমবায় ব্যাংক থেকে এক সময় মোটা অংকের লোন নিয়ে থাকলেও বছরখানেক আগে তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। সুতরাং প্রেসিডেন্টের চিঠির মুখ্য উদ্দেশ এই তালিকা পূরণ করতে পারবে বলে মনে হলো না। মজার ব্যাপার হল, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক থেকে সরাসরি কেউ লোন নেননি। নারায়ণগঞ্জ টাউন সমবায় ব্যাংক প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক থেকে লগ্নি করত এবং এ সব ব্যক্তিরা ওখান থেকে লোন নিতেন।

নির্দ্ধারিত দিনের একদিন আগেই চিফ সেক্রেটারীর হাতে এই তালিকা তুলে দিলাম। ভদ্রলোক তালিকার উপর নজর বুলাচ্ছিলেন আর বার বার ভ্রুকুঞ্চিত করছিলেন। পুরা তালিকা দেখার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছাড়াও আরো কিছু আছে নাকি?' বললাম,'না স্যার, কাগজ পত্রে বা বইখাতায় এর বাইরে আর কিছু নেই।' তিনি শুধু বললেন, 'বহুত আচ্ছা–থ্যাংক ইউ! ' এই তালিকা সম্পর্কে পরে আর কখন কিছু জানতে পারি নি। তবে যাঁদের লোন বহু বছর ধরে অনাদায়ী পড়েছিল তাঁদের হয়তো একটু বিরক্ত করা হয়েছিল; কিন্তু যাঁর উদ্দেশে এই তদন্ত করা হয়েছিল তাঁর কিছুই হওয়ার ছিল না।

রেজিস্টারের সাথে সব সময় একটা 'বদনাম' লেগে থাকত যে তিনি প্রায়ই বিদেশ সফর করেন। চাকরীটার প্রকৃতিই নাকি এমনি। আমি জয়েন করেই শুনলাম ভিয়েনায় যাবার আমন্ত্রণ রয়েছে সমবায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এ সফর তৎক্ষনাত বাতিল করলাম। কারণ নিজের দেশের সমবায় সম্পর্কে বলতে গেলে তখনো আমার পাঠ শুরু হয়নি। পরে অবশ্য আমাকেও বহু জায়গায় যেতে হয়েছে– এড়াতে পারি নি।

একবার এক সম্মেলন হল চেকশ্লোভাকিয়ার প্রাগে। সত্যি বলতে কি আমার কোন ধারণাই ছিল না দেশটা সম্পর্কে। ১৯৬৮ সালের কথা। একদিন প্লেনে চেপে বসলাম প্রাগ যাবার জন্য। ধরেই নিয়েছিলাম যে বিমান বন্দরে আমার মত বিদেশী অতিথিদের জন্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র থাকবে। থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এসবের কোন বালাই দেখলাম না। ইংরেজী কেউ জানে না। পোস্টার–সাইনবোর্ড সবই চেক ভাষায়। বলাই বাহুল্য আমি চেক ভাষার চ–ও জানি না। মহা অসুবিধায় পড়লাম।

শেষমেশ কোন উপায়ন্তর না দেখে বিমানের বাসে উঠে পড়লাম তাদের টাউন অফিসে যাবার জন্য। সেখানে গিয়ে বহু খোঁজাখুজি করে এক ইংরেজী জানা কর্মচারীর সন্ধান পেলাম। তাঁকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য এবং উদ্ভূত সমস্যার কথা জানালাম। আমার আর্তি তাঁর মনে বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক করতে পারল বলে মনে হল না। তিনি আমাকে একটা রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'সোজা এই রাস্তা ধরে হেঁটে যান, মাইল দুই পর নদীর ওপর নির্মিত একটি ব্রিজ পাবেন, ব্রিজ পার হয়ে কিছুদূর গেলে দেখতে পাবেন একটা শপিং সেন্টার। শপিং সেন্টারের ডান দিকে আপনাদের সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ওখানে দু'চারটে ইংরেজী পোস্টার নজরে

www.pathagar.com

পড়লেও পড়তে পারে।' বললাম, 'ভাই এই রাস্তায় কোন্ ট্যাক্সি চলে না?' ভদ্রলোক নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'না, কোন ট্যাক্সি চলে না।'

উপায় নেই। বোচকা হাতে হাঁটা শুরু করলাম।এ যেন আমাদের দেশের গ্রামের দু'মাইল রাস্তা– আর শেষ হয় না। বোচকা নিয়ে হল আরো মুশকিল–ওটা যেন ক্রমেই ভারী হয়ে হয়ে আমার বহন ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছিল।

যাইহোক, অবশেষে এক সময় গন্তব্যস্থলে পৌছলাম। একটা দোতলা বিল্ডিং। নীচ তলায় একটা রেস্টুরেন্ট আর দোতলায় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ওপরে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে যিনি অভ্যর্থনায় ছিলেন সেই ভদ্রমহিলা ভাল ইংরেজী বলতে পারেন। তাঁকে ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম যে, 'বিমান বন্দরে আমাদের রাস্তা দেখাবার কেউ থাকলে ভাল হত না কি?' ভদ্রমহিলা আমার প্রশ্ন গায়ে না মেখে আমার কাগজ–পত্র দেখতে চাইলেন। কাগজপত্র দেখালাম। কাগজপত্র দেখা শেষ হলে তিনি আমাকে হাসিমুখে বললেন, 'আপনি যে রাস্তায় এসেছেন সেই রাস্তার অর্দ্ধেকটা ফেরৎ গেলে বাম হাতে একটা নির্মীয়মান হোটেল পাবেন। এটাই এ শহরের একমাত্র আবাসিক হোটেল এবং মেহমানদের ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' বলে দুটো বই ও কাগজ পত্রের একটা প্যাকেট তুলে দিতে দিতে বললেন, 'ঠিক আছে, কাল দেখা হবে। বাই।'

ভদ্রমহিলার আচরণে আমি হাসব না কাঁদব ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন আবার সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম, জানি না। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেছে। আমি হাঁটছিলাম আমার বোচকা হাতে নিয়ে। হোটেলে পৌঁছা পর্যন্ত ক'বার যে ঐ বোচকাসহ হুমড়ি খেয়ে পড়েছি, বলা মুশকিল। তবে মনে আছে , প্রথমবার পড়ে গিয়ে যখন এদিক–ওদিক তাকাচ্ছি–কজন ছাত্র বিপরীত দিক থেকে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল, 'ওহ ইউ ডিড দ্যাট।' লজ্জায় ও অপমানে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। নিজের উপর বার বার করুণা হচ্ছিল আমার।

হোটেলে নিজের কামরায় ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খুশী হলাম এই দেখে যে হোটেলটি পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক। তবে সাজগোজ ও পুরা নির্মাণ কাজ তখনো শেষ হয়নি।

বিশ্রাম শেষে রাতে খাবার জন্য নীচে রেস্টুরেন্টে গেলাম। ভাষা সমস্যা এখানেও প্রকট। সুতরাং ওদের কি আছে আর আমি কি খেতে চাই এটা কোন পক্ষই কোন পক্ষকে বুঝাতে পারল না। অগত্যা কাগজে ছবি এঁকে ডিম, ভেজিটেবল ও পাউরুটি চাইলাম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে অনেক দিন। কিন্তু পুনঃনির্মাণের কাজ এখানে কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। রাস্তা ঘাট জীর্ণ-শীর্ণ। গির্জাগুলো পরিত্যক্ত। মানুষের বসতবাড়ীগুলো ব্যারাকের মত লাগে দেখতে। এখানে সম্মেলন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মানুষজনের মধ্যে কোন প্রাণ-চাঞ্চল্য নেই, আগ্রহ নেই। সর্বত্রই একটা ভীতি এবং আতংক লক্ষ্য করলাম। পরে বুঝলাম,রাশিয়ার হামলার ভয়ে সবাই তটস্থ।

রাষ্ট্র প্রধান এক রাতে আমাদের রিসেপশন দিলেন। দেখলাম, কোন বাহুল্য নেই, প্রাচুর্যের জৌলুস নেই। রাষ্ট্র প্রধানকে ঘিরে সবার এক প্রশ্ন – কি হতে যাচ্ছে?

ঘড়ি দেখে আতঁকে উঠলাম, মাঝরাত পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ যাবার নামটি করছে না। আমি সাহস করে একাই বেরিয়ে পড়লাম হোটেলে ফিরে যাব বলে। দরজার কাছে যেতেই কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এঁদের একজন রাশিয়ান। তিনি পরিস্কার ইংরেজীতে আমাকে বললেন, 'তুমি কালকের একজিকিউটিভ মিটিং-এ পৌঁছাতে দেরী করেছিলে। তোমার অনুপস্থিতিতে আমি তোমার নাম একজিকিউটিভ সদস্যের জন্য প্রস্তাব করেছিলাম এবং সেটা পাশও হয়ে গেছে।' আমি হাসি মুখে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি খোঁচা দিয়ে বললেন,' তোমাদের বন্ধু আমেরিকান ডেলিগেট কিন্তু তোমার নাম প্রস্তাব করেন নি।' হাসতে হাসতে বললাম, 'সমবায়ী যাঁরা তাঁরা সবাইতো আমার বন্ধু।' দু'পা অগ্রসর হতেই এক মার্কিন ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন। উষ্ণ করমর্দন করে অনেক্ষণ বকবক করলেন। তারপর একটু থেমে সহাস্যে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ নাজির, গাঙ্গেয় বদ্বীপটি যদি বিচ্ছিন্ন হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভাল হয় না? হাজার মাইলের ব্যবধানে কখনো কি ঠিকভাবে এডমিনিস্টার করা সম্ভব? এটা কি ভেবে দেখেছ? তোমার মত কি এ ব্যাপারে?' জবাবে বললাম, 'আমাদের দেশ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তবে আমি তোমাকে তোমার দেশ নিয়েও একটু ভাবতে বলব। ক্যাপিটাল হিল থেকে তোমরা কিভাবে হনুলুলু বা আলাসকা এডমিনিস্টার করছ? এটাকি কখনো ভেবে দেখেছ? তোমরা কি হনুলুলু ও আলাসকা কে বিচ্ছিন্ন হতে দেবে?' ভদ্রলোক মিইয়ে গেলেন আমার জবাব শুনে- তাঁর অনুজ্জ্বল চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারলাম। তিনি যে আশাহত হয়েছেন তাও অনুভব করলাম।

এক চেক সাংবাদিকের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একটি স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ক'বছর আগে করাচীতে তাঁর সাথে আমার প্রথম আলাপ হয়। একটা নামের কার্ড দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি বেঁচে থাকি তবে আবার কখন সাক্ষাৎ হবে।' সত্যি তাই হল। তাঁর সাথে এখানে দেখা হল। তিনি তাঁর দেশের এক বিভিষীকাময় বর্ণনা দিলেন।

রাশিয়ানরা প্রাগ দখলের অনেক পর খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারি ১৯৬৮

www.pathagar.com

সালের গণ্ডগোলে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর কোন দিনই তাঁর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। আজ বহু বছর পর চেকশ্লোভাকিয়ার পরিবর্তনের খবর যখন কাগজে পড়ি– আমার সেই সাংবাদিক বন্ধুর নামের কার্ডটি বের করে দেখি, তাঁর কথা ভাবি এবং নিজের অজান্তেই দু'চোখের পাতা সিক্ত হয়ে ওঠে।

একবার ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় গেলাম এক সম্মেলনে অংশ নিতে। অন্য অনেক কিছুর মধ্যে জাতীয় বীরদের কবরস্থানে গিয়ে তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানও ছিল সফর সূচীতে। সেই মোতাবেক একদিন আমরা পাকিস্তান, ভারত ও আরো কয়েকটি এশীয় দেশের ডেলিগেটরা একটা বাসে চেপে রওয়ানা হয়েছি। আমাদের গাইড স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। বাস চলছে আর গাইড তার দেশের ইতিহাস বলে যাচ্ছে। মনযোগ সহকারে শুনছি। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বাস এসে থামল একটা কবরস্থানের সামনে। হঠাৎ বাইরে একটা সাইনবোর্ডের উপর আমার নজর পড়ল। তাতে ইংরেজীতে বড় বড় অক্ষরে লেখা– 'সেমিট্রি ফর ইউ এস সোলজারস্।' অবাক হয়ে ভাবলাম মার্কিন সৈন্যরা এদের জাতীয় বীর হল কখন থেকে? এদিকে অনেকে নেমে পড়েছেন আর অনেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি কিন্তু ঠাঁয় বসে রইলাম। গাইড আমাকে বসে থাকতে দেখে আমার কাছে এসে জানতে চাইল আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি নাকি? বললাম, 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।' সে অবাক কণ্ঠে বলল, 'তবে নামছ না যে!' বললাম, 'এটাতো আমাদের গন্তব্যস্থল নয়। আমাদের তো নিয়ে যাবার কথা তোমাদের জাতীয় বীরদের কবরস্থানে– এতো মার্কিন সোলজারদের কবরস্থান। আমরা এখানে নামব কেন?' যাঁরা আমার কথা শুনলেন তাঁরা আর নামলেন না। যাঁরা নেমে পড়েছিলেন তাঁরাও ফিরে এলেন। সবাই আমার সাথে একমত হলেন যে এখানে আমাদের নামার প্রশ্নই উঠে না। গাইড বেচারী খুব বিচলিত বোধ করতে লাগল। সে বলল, 'আমরা বিদেশী মেহমানদের সাধারনত এখানেই নিয়ে এসে থাকি।' তবে তোমরা চাইলে আমি অবশ্যই তোমাদের আমাদের দেশের সোলজারদের সেমি-টিতে নিয়ে যাব।'

লক্ষ্য করলাম, দুটো কবরস্থানের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। আমেরিকান সোলজারদের কবরস্থানেও আছে শান-শওকতের নমুনা। আর দেশীয় বীর সেনানীদের কবরস্থান অযত্ন অবহেলার প্রতীক। আর এ জন্যই সম্ভবত এরা বিদেশী মেহমানদের ওখানে নিয়ে যায়। কিন্তু এতবড় একটা ফাঁকি কি করে মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়, বুঝতে পারলাম না।

পশ্চিম জার্মানির ফ্রাংফুর্টে একবার এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাবার সুযোগ হয়েছিল। ওখান থেকে পূর্ব বার্লিন যাবার ইচ্ছা হল। কয়েকজন দল বেঁধে ঠিক করলাম এক রোববার ভিসা করে বার্লিন ওয়ালের ওপারে যাব। যাবার প্রাক্কালে ওপারের

www.pathagar.com

দুরাবস্থার কথা আমাদের সবিস্তারে জানান হল। শহর বিভাগের নিষ্ঠুরতার কথা বলতে বলতে বক্তা প্রায় কেঁদেই ফেললেন। তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, 'পার্টিশনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদেরও আছে।'

যথাসময়ে আমরা সীমানা চৌকি পেরিয়ে ওপারে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে যে ফারাকটা চোখে পড়ল তা হল বড় বড় দোকানের শো রুমের কাঁচের ওপর লোহার গ্রিলের আচ্ছাদন। শো রুমেও তেমন কোন জিনিস-পত্রের সমারোহ নেই। যানবাহন চোখে পড়ল না। মানুষজনের চলাচল কম। রাস্তাঘাট অবশ্য পরিষ্কার। একটা খোলা জায়গায় রঙিন ছাতা টাঙিয়ে কিছু লোক ছুটি উপভোগ করছে বলে মনে হল। গেলাম সেদিকে। না, যা ভেবেছিলাম তা নয়। এক বৃদ্ধা আইসক্রিম বিক্রি করছেন। আর মানুষ কিনছে ভীড় করে। হঠাৎ আমার ইচ্ছা হল আইসক্রিম খাবার। এটাওতো এক অভিজ্ঞতা বটে। অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভীড় কমলে বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'নানী, আমাকে তিনটি আইসক্রিম দাও।' আমার কথা শুনে সঙ্গীরা হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললাম, 'ঐ বৃদ্ধার জন্য ইংরেজী আর বাংলায় কোন তফাত নেই। হাত নেড়ে যতটুকু বুঝাতে পেরেছি তিনি ততটুকুই বুঝেছেন। ভাষা এখানে একেবারেই গৌণ।'

বৃদ্ধা ইশারায় জানালেন তাঁর সব আইসক্রিম ফুরিয়ে গেছে। বাক্স খালি। তারপর ইশারায় আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি চলে গেলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু অনেক্ষণ অপেক্ষার পরও নানী আর এলেন না। অগত্যা আমরা চলে এলাম। আমার মনে একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। পূর্ব বার্লিনের শপিং সেন্টারে কাঁচের বাইরে লোহার গ্রিল দিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থার কেন প্রয়োজন হল? অথচ পশ্চিম জার্মানি বা পশ্চিম বার্লিনের কোন শপিং সেন্টারে এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিনি। আজ যখন এ কাহিনী লিখছি তখন অবশ্য দুই বার্লিনের মাঝখানে আর কোন দেওয়াল নেই- এই যা সান্তনা।

এরই মধ্যে সরকার বাহাদুর আমার পূর্বাপর কাজের পর্যালোচনা করে একটা 'তমঘা-ই-পাকিস্তান' দিয়ে ফেললেন। এক সন্ধ্যায় ফায়ার ব্রিগেডের ডাইরেক্টর সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ইত্তেফাক অফিস থেকে ফোনে আমাকে এ খবরটি জানালেন। তিনি পেয়েছেন 'তমঘায়ে কায়েদে আজম।' ভাবলাম এ সব না করে সরকার বাহাদুর যদি আমাদের পারিশ্রমিকটা একটু বাড়িয়ে দিতেন, মন্দ হত না।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার খুব দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে দেশের উভয় অংশে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। এক দুপুরে প্রেসিডেন্ট বেতার মারফত ঘোষণা করলেন যে তিনি আর ক্ষমতায় থাকছেন না। ক্ষমতায় এলেন সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।

www.pathagar.com

আমার বদলির হুকুম হল। গেলাম ডিআইটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে। ঢাকা ক্লাবের যে সেক্রেটারীর কথা আগে উল্লেখ করেছি সেই সানাউল হক মন্তব্য করলেন, 'নাজির, এখন ডিআইটির টাউয়ার থেকে আপনি তাকাবেন আর নীচে সবাইকে সমান দেখতে পাবেন।' বুঝতে পারলাম না তাঁর এই মন্তব্যের অর্থ কি! বললাম, 'স্যার, এত জায়গা থাকতে টাওয়ারে বসতে যাব কেন? ওরা চেয়ারম্যানের জন্য নিশ্চয়ই একটা কামরা রেখেছে।'

নতুন প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন। সমস্ত সেক্রেটারী ও দফতর প্রধানদের ডাকা হল গভর্নমেন্ট হাউজের দরবার হলে। সভায় গেলাম। গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার সিনিয়র জনাব এ কে এম মুসা। আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'এই নাজির, দাঁড়াও, একটা কথা বলি।' 'আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'বলুন।' 'কি হবে ঐ সভায়?' তিনি জানতে চাইলেন আমার কাছে। বললাম, 'না, কোন পূর্ব ধারনা নেই আমার।' 'তবে আমার কাছে শোন।' তিনি বললেন, 'ইউনিফরম পরা লোকেরা যত গালি জানে আজ প্রেসিডেন্ট তার সবগুলোই সভায় এস্তেমাল করবেন। তারপর বলা হবে অমুক অমুক ছ'জন দাঁড়াও, বাকীরা ডিসমিস।' সিনিয়রের এই মন্তব্যের ওপর আমার কিছুই বলার ছিল না। তবু হেসে বললাম, 'বৃক্তৃতাটা বুঝি আপনি লিখে দিয়েছেন?'

আশ্চর্যের ব্যাপার,সভায় তাই ঘটল যা মুসা সাহেব একটু আগেই আমাকে বলেছিলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার সময় মুসা সাহেব মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর মুচকি হাসছিলেন। তিনি আমার থেকে একটু দূরে বসেছিলেন। প্রেসিডেন্ট সবাইকে এক হাত নিলেন, কিন্তু রেলওয়ে প্রধানকে যে ভাবে হেনস্থা করলেন তা রীতিমত অপমানজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তির এমন আচরণ– ভাবতেও কষ্ট হয়। মনে হচ্ছিল, দেশের সকল অন্যায়, অপরাধ ও অনর্থের জন্য এই ভদ্রলোক একাই দায়ী। সুতরাং প্রেসিডেন্টের সকল আক্রোশ তাঁর উপর।

ঐ ছ'জন ছাড়া আমরা সকলে বেরিয়ে এলাম দরবার হল থেকে। পরে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানকে তার যোগ্য হিস্যা দেবার জন্য ঐ ছ'জনকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী পদে উন্নীত করা হয়েছে।

ডিআইটির কাজে মনোযোগী হলাম। যারা অস্বাভাবিক উপায়ে ডিআইটির প্লট পেয়েছেন, যাঁরা বৈধভাবে প্লট পেয়েও বহু বছর ফেলে রেখেছেন–এমন সব লোকদের একটা তালিকা তৈরী করেছিলেন আমার পূর্বসূরি। তবে সম্ভবত মৌচাকে ঢিল পড়বে এই মনে করে তিনি কাউকে কোন নোটিশ দেন নি।

মৌচাকে ঢিল মারার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে একটা সুবিধা ছিল যে মার্শাল ল

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষও নোটিশ জারি করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। নোটিশ জারি শুরু হল।

ডিআইটির একটা বদনাম ছিল – প্ল্যান পাশ হয় না– বছরের পর বছর তা ফাইল চাপা পড়ে থাকে। স্থির করলাম, এই বদনাম ঘুচাতে হবে। একটা টাইপড প্ল্যান তৈরী করিয়ে চার আনায় তা বিক্রী করতে বলে দিলাম। ঐ প্ল্যান মোতাবেক বাড়ী হলে চব্বিশ ঘন্টায় প্ল্যান পাশ করার ব্যবস্থা করলাম। হাজার হাজার পড়ে থাকা ফাইল নিস্পত্তি করা হল দ্রুত গতিতে। খবরের কাগজগুলো আমাদের এই সব প্রচেষ্টার তারিফ করতে লাগল–কখন কখন আকর্ষণীয় হেডিং দিয়ে।

খুব উৎসাহ বোধ করতে লাগলাম। মাথায় খেয়াল চাপল, মধ্যব্যস্তি লোকদের জন্য ফ্লাট বাড়ী তৈরী করে বিক্রী করলে মন্দ হয় না। এতে তীব্র আবাসিক সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হবে। সরকার সমীপে প্রস্তাব দেওয়া হল। সুখের কথা সরকার তা অনুমোদন করলেন। সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলাম। তাঁরাও খুশী হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। মালিবাগে ডিআইটির জায়গায় তাঁদের কিছু ফ্লাট বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিলাম। উত্তরা মডেল টাউনেও এই জাতীয় ফ্লাট তৈরী করব স্থির করলাম। অর্থ সমস্যার সমাধান করলাম হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের প্রধান সানোয়ার আলীর সঙ্গে গোপনে একটা সমঝোতা করে। ওরা প্রতি বছর সাত কোটি থেকে দশ কোটি টাকা পর্যন্ত কেন্দ্রে ফেরৎ পাঠাত। তাঁকে বললাম, ঐ টাকায় আমরা ফ্লাট বানাব এবং সেসব ফ্লাট মানুষের কাছে স্বল্প কিস্তিতে বিক্রী করে তাঁর টাকা পরিশোধ করে দেব। ডিআইটি টাকার জন্য গ্যারান্টার থাকবে। বিনিময়ে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কর্মচারীদের জন্য তিনটি বিল্ডিং বরাদ্দ করা হবে। সব প্ল্যান প্রোগ্রাম তৈরী হয়ে গেল। তবে কেউ কিন্তু অর্থের ব্যাপারটা জানতে পারল না। অন্যদিকে বুড়িগঙ্গার অপর পারে জমির উন্নয়ন করে প্লট বরাদ্দের প্রাথমিক কাজও শুরু করা হল।

প্রায় প্রতিদিন বিশিষ্ট লোকরা এসে আমার সাথে দেখা করতেন। এর মধ্যে সামরিক বাহিনীর লোকজনও থাকতেন। সবার এক আব্দার – তাদের জন্য প্লট বরাদ্দ করতে হবে। তাঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না যে চেয়ারম্যান সরাসরি কাউকে প্লট দিতে পারেন না– সে এখতিয়ার তাঁর নেই। এখানে একটা নিয়মকানুন আছে–সেটা আমাদের মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাস করতেন বলে মনে হত না। সবাই ভাবতেন আমি বুঝি এড়িয়ে যাচ্ছি তাঁদের। ফলে তাঁরা ক্রুদ্ধ–বিরক্ত হয়ে চলে যেতেন। এই বিব্রতকর অবস্থার হাত থেকে বাঁচার জন্য বলতে শুরু করলাম, ডিসেম্বরের পর এ নিয়ে বিবেচনা করা হবে।

www.pathagar.com

অর্ধচন্দ্র

একদিন দু'জন পুলিশ অফিসার আমার অফিসে এসে আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন। তাঁদের ভেতরে ডাকলাম। ভাবলাম, এঁরাও বুঝি প্লটের জন্য অনুরোধ করতে এসেছেন। কিন্তু না এঁরা এসেছেন অন্য কাজে। তাঁরা বললেন, 'স্যার, মার্শাল ল তে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে।' বললাম, 'আমার কি করার আছে, বলুন?' আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। ফাইল-পত্র যা দেখতে চান, দেখুন। অন্যদিকে আমার পূর্বতন এক চেয়ারম্যানের আমলের দু'টো ফাইল পিণ্ডি থেকে তলব করা হয়েছে। দেশে তখন সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছিল- এ তারই অংশ। কারণ প্রেসিডেন্ট দেশকে করাপশন মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন।

আমার একটা প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমার শত্রুও আমার উপর দুর্নীতির অভিযোগ আরোপ করবে না। তাই নিশ্চিত মনে আমি আমার কাজ করে যাচ্ছিলাম।

এ সময়ে একদিন চিফ সেক্রেটারী শফিউল আজম সাহেব ফোন করলেন আমাকে। বললেন, 'চাঁদ-ফেরৎ তিনজন কৃতি মার্কিন বিজ্ঞানী ঢাকা সফরে আসছেন। তাঁদের নিয়ে একটা শোভাযাত্রা করা হবে। শোভাযাত্রা জিন্নাহ এভিনিউ হয়ে ইত্তেফাকের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে মতিঝিল যাবে এবং সেখান থেকে পল্টন। কিন্তু গুলিস্তান থেকে ইত্তেফাক পর্যন্ত রাস্তাটা ভীষণ খারাপ। তুমি রাস্তাটা ঠিক করে দাও। তবে হাতে সময় মাত্র তিন দিন।

ফোন রেখে তৎক্ষণাৎ ডি আই টির চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকলাম। তাঁকে সব বললাম। তিনি এক ভয়ানক দুঃসংবাদ দিলেন। বললেন, 'গুলিস্তান -ইত্তেফাক রাস্তাটার কনট্রাকটর মুন্সেফকোর্ট থেকে ইনজাংশন নিয়ে রেখেছে। সুতরাং ঐ রাস্তায় কিছুই করা সম্ভব নয়।' মহা মুশকিলে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। অবশেষে একটা সমাধানে পৌঁছালাম।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জানতে চাইলাম কার কার নামে ইনজাংশন দেওয়া হয়েছে? তিনি জানালেন যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের নামে ইনজাংশন দেওয়া হয়েছে। তাঁকে বিদায় করে অন্য একজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকলাম। তাঁকে বললাম, 'কাল বহু লোক লাগিয়ে কালই রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মালামাল ভোর বেলা পৌঁছানার ব্যবস্থা করতে হবে।' তাঁকে অভয়

www.pathagar.com

দিয়ে বললাম, 'আমি আপনার সাথে সাইটে থাকব।' প্লানটা যাথাসম্ভব গোপন রাখা হল।

পরদিন সকালে যখন প্লান মোতাবেক মালপত্র সাইটে নেওয়া হল, স্বাভাবিকভাবে কন্ট্রাকটর বাঁধা দিতে আসল। আমি এ জন্য প্রস্তুত ছিলাম। সাথে সাথে এসডিও এবং ওসিকে ফোন করলাম। বললাম, 'আমি রাস্তার কাজ করতে যাচ্ছি– আশংকা আছে, কিছু লোক গোলযোগ বাঁধিয়ে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। অথচ রাস্তাটি অতি জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করা প্রয়োজন। সুতরাং আপনারা সরেজমিনে অবস্থা তদন্ত করে প্রয়োজনে ১৪৪ ধার জারি করে বাধাদানকারীদের নিবৃত্ত করতে পারেন। আমি এই মর্মে একটা লিখিত আবেদনও পাঠাচ্ছি।

সকাল দশটার দিকে এসডিও এবং ওসি তদন্তে এলেন। তাঁরা স্বচক্ষে দেখলেন যে বিশ–পঁচিশ জন লোক হৈচৈ করছে, কাজ করতে দিচ্ছে না মজুরদের। এসডিও ১৪৪ ধারা জারি করে ওসিকে তা বহাল করতে বললেন। ফল হল। যে সব লোক গন্ডগোল করতে এসেছিল তারা সটকে পড়ল। আমি সর্বক্ষণ ওখানে উপস্থিত থাকায় কনট্রাকটরও বিশেষ নড়াচড়া করল না। আমাদের প্রোগ্রাম মত পরদিন ভোরের আগেই রাস্তার কার্পেটিং এর কাজ শেষ হল। যন্ত্রপাতিও সূর্য ওঠবার আগেই সরিয়ে ফেলা হল।

সকালে অফিস টাইমে চিফ সেক্রেটারীকে ফোন করে বললাম, 'স্যর,গুলিস্তান–ইত্তেফাক রাস্তার মেরামতের কজ শেষ। এখন আপনি নিজে একবার এসে দেখে যান।' তিনি খুব খুশী হলেন।

মুন্সেফ কোর্ট আদালত অবমাননার কোন অজুহাত পেল না। কারণ যাঁদের উপর আদলতের নিষেধাজ্ঞা ছিল তাঁরা সবাই ঐদিন ছুটিতে ছিলেন। আর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল কেবলমাত্র শান্তি–শৃংখলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে –রাস্তার কাজের সঙ্গে ওর কোনই সম্পর্ক ছিল না। নির্দিষ্ট দিনে চাঁদ ফেরৎ বিজ্ঞানীদের নিয়ে ঐসব রাস্তা দিয়ে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা হল।

আমার সম্পূর্ণ অজান্তে একটা অঘটন ঘটে গেল। ওটা ছিল পবিত্র রমজান মাস। বনানীর টিনের ছাপড়া মসজিদটা ভেঙ্গে পাকা করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। ওখানে গিয়ে কনট্রাকটরকে বললাম, 'এ ঈদের আগে তো কাজ শেষ করতে পারলেন না। আজ সাতাশে রমজান। দু'দিন বাদে ঈদ। তবে ঈদুল আজহার নামাজ যাতে এখানে পড়া যায়, সেভাবে কাজ করুণ। আপনি হাজী মানুষ, আপনাকে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

ওখান থেকে সোজা নিউমার্কেট গেলাম শুটকি মাছ কিনতে। সঙ্গে ছিলেন একজন প্রাক্তন সহকর্মী ও ডিআইটির অফিসার। প্রাক্তন সহকর্মীটি এতক্ষণ কি যেন বলতে

www.pathagar.com

চাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে মওকা দিচ্ছিলাম না। সম্ভবত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় তিনি নিউমার্কেটের ভিড়ের মধ্যেই কথাটা বলে ফেললেন। বললেন, 'স্যার, শুনেছি সরকার বহু বড় বড় অফিসারকে স্ক্রিনিং লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এতে আপনার নামও আছে। বিস্ময়ের সাথে বললাম, 'তাই নাকি? আমার নামও আছে এতে?' তারপর তাঁকে আশ্বস্থ করে বললাম, এ ক্ষেত্রে আমার কি করার আছে? এক বছর আগে উঁচু দরের একটা তমঘা দিয়ে এখন যদি সরকার আমাকে বের করে দেন, মন্দ হয় না।' ভদ্রলোক আমার লাপরোয়া ভাব দেখে বিদায় নিলেন।

বাসায় ফিরে আসতেই অতিরিক্ত চিফ সেক্রেটারী আবুল এহসানের বাসা থেকে একটা ফোন পেলাম। তাঁর স্ত্রী বললেন, 'ভাই আপনি এক্ষুণি আমাদের বাসায় চলে আসুন। খুবই গুরুতর ব্যাপার। আপনার ভাই আপনার অপেক্ষা করছেন।

_অতিরিক্ত চিফ সেক্রেটারী সাহেব থাকতেন রমনার পাশে প্রেসিডেন্ট হাউজের বিপরীত দিকের লাল দোতলা বিল্ডিংটায়। তলব পেয়ে গেলাম সেখানে। দেখলাম অনেক লোক বসার ঘরে জমা হয়েছেন। আমাকে দেখে মনে হল তিনি দারুণ খুশী হয়েছেন। বললেন,'নাজির এসেছ–এসো এসো। নিশ্চয়ই শুনেছো ওঁরা আমাদের স্ক্রিনিং এ ফেলেছেন।' কিন্তু আমার মধ্যে কোন ভাবান্তর না দেখে তিনি অবাক কণ্ঠে বললেন, 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আরে আমি কোন ফান করছি না---- সিরিয়াসলি বলছি।' তারপর তিনি গড়গড় করে লিস্ট–ভুক্ত লোকদের নাম বলে গেলেন। আমি বললাম,'স্যার, ব্যাপারটা আমি সিরিয়াসলিই নিচ্ছি। আপনিতো জানেন, সামরিক কর্তা ব্যাক্তিরা কোথাও ক্ষমতা গ্রহণ করলে জনসাধারণকে তাঁদের দাপট দেখাতে চান। তাই তারা শক্তিশালী ব্লাডি সিভিলিয়ান কর্মকর্তাদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের ক্ষমতা কত শক্ত তা প্রমাণ করতে চান। শুধু তাই নয়, এসব বেসামরিক লোকদের ভিক্টিম করেই এঁরা ক্ষান্ত হন না, এঁদের চরিত্র হননও করেন এরা। জনসাধারণের মধ্যে এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করেন এঁরা যে দেশের মানুষের সকল দুঃখ–দুর্দশার মূলে এই সব ব্লাডি সিভিলিয়ান কর্মকর্তারা রয়েছেন।' আমি একটু থেমে বললাম, 'স্যার, আমি জানি এটা আমাদের দুঃসময়, কিন্তু তাই বলে আমি কারো কাছে কৃপা চাইতে যাব না।' তিনি বললেন, 'আসলে তোমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। শোন, আমি ভাবছি আমাদের এই প্রদেশের সবচেয়ে আলোচ্য ও ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যাওয়া উচিৎ। তাঁকে আমরা বলব, সরকার আমাদের প্রতি অবিচার করেছেন, আমাদের লোক সম্মুখে হেয় করা হয়েছে– আমরা তাঁর কাছে এর প্রতিকার চাই।' জবাবে বললাম, 'স্যার, মাথা আমার বিলকুল ঠিক আছে। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের এই চিন্তা আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে। জনাব আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান যিনি এখন আপনার পাশের বাড়ীতে অবস্থান করছেন, তিনি এই প্রদেশে যে সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন, আমার বিশ্বাস, আপনার ঐ রাজনৈতিক নেতার সাথে পরামর্শ

www.pathagar.com

করেই তা করছেন। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট একা নেননি, ঐ নেতাও এর মধ্যে শামিল আছেন। সুতরাং তাঁর কাছে গিয়ে ফরিয়াদ জানানর প্রশ্নই ওঠে না। তবে স্যার, আমি মনে করি আপনাদেরও যাওয়া ঠিক হবে না। আমি শুধু এর বিরোধীতাই করব না, এটাকে ঘৃণাও করব।' বুঝতে অসুবিধা হল না যে এঁরা আমার কঠোর মনোভাবের সাথে একমত হতে পারলেন না। আমি কিছুক্ষণ পর বাসায় চলে এলাম।

বিকেলে আবার অতিরিক্ত চিফ সেক্রেটারী সাহেব তাঁর বাসায় ডাকলেন। যদিও ভিতর থেকে ওখানে যাবার কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না, তবুও গেলাম এই ভেবে যে না গেলে তিনি এটাকে বেআদবী মনে করতে পারেন। তিনি আমাকে তাঁর কাছে বসিয়ে খুব আন্তরিকতার সাথে চাপা গলায় বললেন, 'নাজির, ঐ নেতা আজ সন্ধ্যায় গুলশানের এক বাসায় আসবেন। আমরা যদি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলি যে সরকার আমাদের প্রতি অন্যায় করেছেন–দোষ কি?

বুঝতে পারলাম , ডুবন্ত মানুষ যেমন বাঁচার জন্য খড় কুটো আকঁড়ে ধরে – আমার সিনিয়রের হয়েছে সেই দশা। এখন তাঁকে শত বুঝালেও তিনি বুঝতে চাইবেন না। তবুও চেষ্টা করে দেখতে মন্দ কি? বললাম, 'স্যার, ধরুন আমরা ঐ নেতার কাছে গিয়ে বললাম, আমরা নির্দোষ, আমাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তিনি যদি বলেন, ভাল কথা, আপনারা ট্রাইবুনালের সামনে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করুণ। তখন আমাদের কি জবাব হবে? দ্বিতীয়তঃ নেতা যদি বলেন যে এহিয়া খান ঠিক কাজটাই করেছেন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে আমিও তাই করতাম।

এ অবস্থায় আমাদের ইজ্জত থাকবে? আমি যেহেতু বিশ্বাস করি তিনিও এই ঘটনার সাথে জড়িত। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে ভাল কিছু পাওয়া যাবে–এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

আমার কথা শুনে তিনি এবার সত্যি সত্যি চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন যে 'নেতা'র সাথে পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমার কথা থেকে তিনিও বুঝতে পারছিলেন যে পূর্ব–পাকিস্তানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট এই নেতার সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নেন।

আগেই বলেছি, দিনটি ছিল ছাব্বিশে রমজান–সাতাশের রাত–শবে কদর। তাই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলাম। এদিকে আজাদ বয়েজ ক্লাবের পাগলা মুস্তাক কাবাব হাতে আমার বাসায় হাজির। এক সাথে ইফতার করবে। বলা দরকার, এই মুস্তাককে খেলার মাঠের সবাই চিনে। তাই তাঁর পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। বেচারা ১৯৭১ সালে ঐ ক্লাব ঘরেই সৈন্যদের গুলিতে প্রাণ হারান। তাঁর বাড়ীঘর, বউ–বাচ্চা কিছুই ছিলনা।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় আমার বাসায় বহু লোক সমাগম হল। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় এসেছে নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা। দু'চার জন উঁচু পদের ইয়ার-দোস্তও এলেন সমবেদনা জানাতে। বললাম, যা ইফতারী আছে আসুন সবাই ভাগ করে খাই।

ইফতারী ও নামাজের পর অনবরত কবিতা আবৃত্তি করছিলাম ঃ 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান-অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।' উপস্থিত অনেকেই মনে করলেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং এটা বিশ্বাস করে কেউ কেউ কেঁদেও ফেললেন। আমি এসব দেখে খুব হাসছিলাম। আমাকে হাসতে দেখে যাঁরা এতক্ষণ সংশয়ের মধ্যে ছিলেন এখন তাঁরাও নিশ্চিত হলেন যে আমার সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাঁরা ভাবছিলেন আমার সব শেষ হয়ে গেল। আর আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। এবার সামনে নতুন ও মুক্ত জীবন। আমার সত্যি কোন দুঃখ হচ্ছিল না। চাকরি পাবার পর আমার শুভাকাংখী বলেছিলেন ঃ **'তখত ইয়া তাউস-আইদার দি থ্রোন অর দি গ্যালোজ।'** যা ঘটেছে তাতো এই দুই-এর বাইরে নয়।

কিছুক্ষণ পর এক সেকশন অফিসার এক চিঠি নিয়ে হাজির। ভদ্রলোকের গায়ের রং ভীষণ কাল। কিন্তু কথাবার্তায় দেখলাম অন্তরটা খুব ভাল। তিনি দেখা হওয়া মাত্র বললেন, 'স্যার, আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাকে জানি। এ চিঠি বহন করে নিয়ে আসতেও আমার লজ্জা হয়েছে।' একটি সাইক্লোস্টাইল চিঠি। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সেকশন অফিসার পাঠিয়েছেন। চিঠির মর্ম, আমাকে ৫৮ নং মার্শাল ল রেগুলেশনের অধীনে সাময়িকভাবে চাকরীচ্যুত করা হয়েছে।

তাঁকে বললাম, 'আপনার কোনই দোষ নেই। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। আমার কারো বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ নেই।'

রাত প্রায় এগারটার দিকে সবাই চলে গেলেন। বুঝতে পারলাম, বাড়ীর সামনে সাধারণ পোশাকে কয়েকজন পাহারাদার বসান হয়েছে। সামরিক সরকার হয়তো ভেবেছেন আমি যদি গা ঢাকা দেই।

পরদিন সকালে সকল পর্দা অপসারিত হল। আমার বাসার কমাপাউন্ডের ভেতরে পাহারাদার বসান হল। কেউ আমার সাথে দেখা করতে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। বন্ধু-বান্ধবদের নিষেধ করে দিলাম আসতে-এই ভেবে যে আমাকে সহানুভূতি জানাতে এসে তাঁরা অহেতুক বিপদে পড়ে না যান।

আমার দুর্ভাগ্য যে নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা ট্রাক ভরে এসে আমার বাসার সামনে মিছিল করল। আমার প্রতি সরকার যে অন্যায় করেছে, তারা তার প্রতিকার চায়। আমি

www.pathagar.com

এ খবর পেয়ে নিজের বাড়ীর ভেতরই এক কামরায় বলতে গেলে লুকিয়ে গেলাম। স্ত্রীকে বললাম দোতলার বেলকনীতে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ওদের বলতে যে ওদের এই সহানুভূতির জন্য আমাদের পরিবার ভীষণ কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই মিছিল ওদের সাহেবের ক্ষতি ছাড়া কোন উপকারে আসবে না। সুতরাং আপনারা দয়া করে যার যার কাজে চলে যান। কিছুক্ষণ পর ওরা চলে গেল ঠিকই। তবে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, মিছিল করতে করতে ডিআইটি বিল্ডিং- এ গেল। সেখানেও নানা স্লোগান দিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। ওদের এই 'আন্তরিকতা' ও 'আবেগের' খেসারত পরে আমাকে দিতে হয়েছে।

ঐদিন টাঙ্গাইল থেকে এক ভদ্রলোক এলেন আমার সাথে দেখা করতে। তিনি বললেন, মওলানা ভাসানী তাঁকে পাঠিয়েছেন। একটু অবাকই হলাম বটে। তিনি এও জানালেন যে মওলানা সাহেব বলেছেন যে প্রয়োজনে তিনি আমার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে যেতেও প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্য থাকলে তা মওলানা জানতে চেয়েছেন।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'মওলানা সাহেবকে আমার সালাম বলবেন। তাঁর এই আন্তরিকতার জন্য আমি গভীরভাবে অভিভূত। তবে আমার এই ব্যাপারটা কোন রাজনৈতিক রূপ নিক্ তা আমি চাই না।' ভদ্রলোক বিষন্ন বদনে চলে গেলেন। পরদিন পত্র-পত্রিকায় মওলানার এ সম্পর্কিত একটা বিবৃতি দেখলাম। তিনি কারো নাম উল্লেখ না করে বলেছেন যাঁদের বিরুদ্ধে সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কিছু লোককে তিনি জানেন যাঁরা পরীক্ষিত সৎ সরকারী কর্মচারী।

বলা দরকার যে, এসব বিবৃতিতে আমরা কেউ কেউ মনে মনে সান্তনা পেলেও কোন কাজের কাজ হয়নি। আমি জানতাম, এসবে কিছু হবে না। কারণ এর শিকড় অনেক গভীরে। এরই মধ্যে, আমার আট -দশ জন সহকর্মী দল বেঁধে আমার সাথে দেখা করতে এল। ওদেরকেও রবিঠাকুরের ঐ কবিতার অংশ বিশেষ শুনিয়ে দিলাম। ওদের একজন যাবার সময় বলে গেল, এখন আর কি করবে-বসে বসে টেলিভিশন দেখ।

ঢাকা শহরে তিনশ' তিন নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা চলছিল। গুজবে গুজবে ব্যাপারটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। একটা ইসলামী রাজনৈতিক দলের দৈনিক পত্রিকাতো আমাদের প্রকাশ্যে ফাঁসীর দাবী করে বসল। এ রকম অবস্থায় সবার মনো-বল এক রকম ছিল না। একদিন তিনশ' তিনের একজনতো (আমাদের সার্ভিসের নন) আত্মহত্যারই চেষ্টা করে বসলেন। যদিও তিনি সফল হননি, তবে এ থেকে এটা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে এঁরা কি দারুণ মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন।

আমাদের বিরুদ্ধে নানা রকম তদন্ত চলছে। কেন সাময়িকভাবে আমাদের কর্মচ্যুত করা হয়েছে, তার কারণ কিন্তু আমাদের জানান হয়নি। আমার একই ব্যাচের সহকর্মী বন্ধুরা ঐ যে একদিন দল বেঁধে বাসায় এসেছিল, এরপর তারা লাপাত্তা। আমাদের সাথে

www.pathagar.com

বেশী দেখা-সাক্ষাৎ করলে সরকারের কোপানলে পড়বার আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই হয়তো ওরা পরহেজ করছে। তবে কেউ কেউ হয়তো খুশীই হয়েছে, বেটা বড় এগিয়ে যাচ্ছিল-ঠিকই হয়েছে।

এরই মধ্যে একদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমার এক ব্যাচমেট বাসায় এসে হাজির। কুশলাদী বিনিময়ের পর সে বলল, আমি কোন সরকারী কাজে এখানে আসিনি। আমার আসার একমাত্র উদ্দেশ হল তোমাকে এ কথা বলা যে তুমি তোমার এই সংকটে একা নও, আমরা তোমার ব্যাচমেটরা তোমার সাথে আছি, থাকব। তুমি কোন দুশ্চিন্তা কর না।' সে আরো জানাল যে আমার ৫৪ সালের ব্যাচমেটরা সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে ওর প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সহকর্মী-বন্ধুদের এই আন্তরিকতা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে গেল। আমার এখানকার সহকর্মী বন্ধুদের আচরণের সাথে এই ঘটনার তুলনা করতে পারিনি কোনদিন। কারণ এতে আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতার যে চিত্র ফুটে উঠবে, তা না দেখাই ভাল।

পিয়ন মোহম্মদ আলী আমার এই সংকটে আমার সাথে যে উচ্চ মানবিক ব্যবহার করেছে, তা আমি কোনদিন বিস্মৃত হতে পারব না। সে বহু বছর আমার অধীনে কাজ করেছে। সে আমার এতই অনুরাগী হয়ে পড়েছিল যে আমি যেখানে যেখানে বদলী হয়ে যেতাম সেও আমার সাথেই যেত। ঈদ এল। তাকে বললাম, 'বাড়ী যাও, ছেলেমেয়েদের সাথে একত্রে ঈদ কর গিয়ে।' সে আমার নির্দেশ শুনে কেঁদে ফেলে বলল, 'স্যার, যারা আপনার ঈদ হারাম করেছে তাদের ঈদ হারাম না হওয়া পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী ঈদ করবে না।' ওর কথা শুনে, ওর কান্না দেখে আমার মন প্রবলভাবে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠল। আমি ওকে আর কিছুই বলতে পারলাম না। সত্যি সত্যি সে ঈদে বাড়ী গেল না -আমার কাছেই রয়ে গেল।

দেখতে দেখতে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের কেসের কোন খবর নেই। সব চুপচাপ। এক বৃষ্টির রাতে আমরা খেয়ে-দেয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ নিচ থেকে দারোয়ান এসে আমাদের জাগিয়ে দিল। ওকে খুব নার্ভাস লাগছিল। বলল, বাড়ীতে প্রায় পনের-বিশ জন আর্মি ও পুলিশ এসেছে। বাইরে ইপিআর ও পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। শান্ত কণ্ঠে ওকে বললাম, 'যাও, নিচে গিয়ে ওদের বসার ব্যবস্থা কর, আমি এক্ষণি আসছি।'এবার বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আবেগহীন কণ্ঠে বললাম, 'যদি ওরা আমাকে নিয়ে যায়, কোন হৈচৈ যেন না হয়।' নিচে নামলাম। দু'জন সিনিয়র পুলিশ অফিসার ছাড়া বাকী সবাই আর্মির লোক। পুলিশ অফিসার দু'জন আমার পরিচিত আর বাকীরা অপরিচিত। কামরায় ঢুকতেই ওরা নিয়মমাফিক স্যালুট ঠুকে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একটা সোফায় বসতে বসতে ওদেরও বসতে বললাম। একজন নন কমিশন্ড সামরিক অফিসার বিরাট একটা খাম নিয়ে সামরিক কায়দায় পা ঠুকে ঠুকে আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং দু'হাতে খামটা আমার

www.pathagar.com

সামনে মেলে ধরল। ওদের সিনিয়রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি আমাকে নিতে হবে?' তিনি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। খামটা খুলে দেখলাম প্রাপ্তি স্বীকার কাগজটাও ওর মধ্যে রয়েছে। এদের একজন একটা কলম এগিয়ে দিল। সই করে দাঁড়াতেই পুলিশ অফিসার দু'জন এগিয়ে এসে এক সঙ্গে বললেন, 'স্যার, আমাদের মাফ করে দেবেন। আমরা এ সবে জড়িত নই। চাকরী করি বলেই আমাদের আসতে হয়েছে।' হাসিমুখে তাঁদের সান্তনা দিয়ে বললাম, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। তাঁদের অসুবিধাটা কি আমি ভাল করেই বুঝি। ওরা আবার এক লাইনে দাঁড়িয়ে আরেকটি স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেল। আমিও খাম হাতে ওপরে ওঠে গেলাম। ভাবলাম, একটা চিঠি দেবার জন্য রাত গভীরে এত কান্ড!

সে রাতে আর ঘুম হল না। নিজ কামরার মেঝেতে বসে কাগজগুলো সব পড়ে ফেললাম। দশ দিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে। নতুবা এক তরফা (সঠিক সময়ে জবাব দিলে যেন দু'তরফা হবার সম্ভাবনা আছে) সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কাগজ-কলম নিয়ে তখনিই খসড়া জবাব লিখতে শুরু করলাম। যখন আমার লেখা শেষ হল তখন মসজিদে ফজরের আজান হচ্ছে।

একটু বেলাতে এল আমার জামালপুরের এসডিও-এখন স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী, নুরুল ইসলাম খান। সে সব শুনে বলল, 'স্যার আমি আপনার জবাব লেখায় সাহায্য করতে চাই।' বললাম, 'তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?' বলল, ' না স্যার, কোন অসুবিধা হবে না। 'আপনি নিশ্চিত থাকুন।' একে সহযোগিতা করলেন সমবায়ের একজন সহকারী রেজিস্টার এলহামূল হক ও একজন স্টেনো মুজিবর রহমান। আমার খসড়ার উপর ভিত্তি করে এরা একটা জবাব তৈরী করে ফেলল।

স্টেনোকে রসিকতা করে বললাম, তুমি এখানে এসে আঙ্গুল পোড়াচ্ছ কেন? সেও অনেকটা মোহম্মদ আলীর মতই জবাব দিল। বলল, 'স্যার, আজ যদি আপনার এতটুকু কাজে না আসতে পারি তবে নিজেকে মানুষ হিসাবে দাবী করব কিভাবে। আমি স্যার, চাকরির চিন্তা করি না-বাপের যা জমিজমা আছে তাতেই চলে যাবে।'

আমার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। ক) মিসকন্ডাকট খ) ক্ষমতার অপব্যবহার ও গ) দুর্নীতির।

ক) মিসকন্ডাকট ঃ অভিযোগে বলা হয়েছে, আসাম থেকে পালিয়ে আসা লোকদের তুমি মোমেনশাহী সীমান্তে অনুমোদন ছাড়াই পুনর্বাসিত করেছ।

খ) ক্ষমতার অপব্যবহার ঃ অভিযোগ করা হয়েছে যে তুমি যখন লাহোর স্টাফ কলেজে ট্রেনিং-এ ছিলে তখন তোমার যুগ্ম রেজিস্টার এএফএম ইয়াহিয়া তোমার পক্ষে শিল্প সমবায় সমিতির কার্যকরী সভায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাতে অমুক ব্যক্তি ফায়দা লাভ করেছে। এই যুগ্ম রেজিস্টার যেহেতু তোমার অধীনস্থ কর্মকর্তা সুতরাং তাঁর এই ভুল সিদ্ধান্তের সকল দায়-দায়িত্ব তোমার।

www.pathagar.com

গ) দুর্নীতি ঃ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে তুমি সমবায় ব্যাংকের গাড়ীতে মফস্বল সফরে গিয়েছিলে। তোমার ড্রাইভার তেল ও ডিএ বাবদ একশ' উনষাট টাকা সমবায় দফতর থেকে আদায় করেছে। তুমি এতে শরীক ছিলে।

ঘ) ডিআইটিতে থাকাকালীন সময়ে তোমার আচরণ সর্বজনবিদিত।

জবাব লেখার জন্য কোন ফাইল বা কাগজপত্র দেখতে পারব কিনা, সরকারী চিঠিতে তার কিছুই বলা হয়নি। চিঠি লিখে প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারীর কাছে ব্যাখ্যা চাইলাম। জবাব এল– কেন্দ্র থেকে এ রকম কোন ব্যবস্তার কথা বলা হয়নি। টেলিগ্রাম করলাম পিন্ডিতে। জবাব পেলাম, এসব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের আওতাধীন। বলা বাহুল্য, জবাব লেখার জন্য আমার কোন ফাইল বা কাগজপত্রের দরকার হয়নি। তবুও আইনের ফাঁকটা একটু ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র।

মাঝে-মাঝে স্টেডিয়াম যেতাম। ঐ বেচারা ডেপুটি সেক্রেটারী গাড়ী চালাত। দু'জন টিকটিকি মোটর সাইকেলে আমাদের সব সময় ফলো করত। একদিন এয়ারপোর্ট রোডের এক দোকানে আমরা গরম জিলাপি খাচ্ছিলাম। দেখলাম, ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মায়া হল, ওদের জিলাপি অফার করলাম।

মনে মনে ঠিক করলাম, সামরিক ট্রাইবুনালের সামনে হাজিরা দেব না, কেবল লিখিত জবাবটাই পাঠিয়ে দেব। কিভাবে জানি আমার ইচ্ছাটা জনাব মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরীর কানে গেল। আমি যখন সিরাজগঞ্জে এসডিও তিনি তখন পাবনার ডিসি। আমি যখন ঢাকায় শিক্ষা দফতরে ডেপুটি সেক্রেটারী ইনি তখন সিএন্ডবি দফতরে সেক্রেটারী। মোয়জ্জম সাহেব নিজেও তিনশ' তিনে পড়েছিলেন। তবে তাঁর জবাব দাখিল ও শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আরো অনেক পরে।

তিনি একদিন বাসায় এসে বললেন, 'নাজির, তোমাকে ট্রাইবুনালে হাজির হতে হবে।' বললাম, 'স্যার, আমি উল্টোটাই করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার দু'হাত তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, 'অন্তত আমার অনুরোধ রক্ষার খাতিরে হলেও তোমাকে যেতে হবে। এ প্রদেশে এই প্রথম ট্রাইবুবাল –ওরা বুঝুক আমাদের মুভ্‌টা!' চৌধুরী সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার ছিল না। কারণ, তিনি অন্তর দিয়ে আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর স্নেহে কোনদিন কোন খাদ ছিল না–আজো নেই। শুনানির দিন সকাল বেলা চৌধুরী সাহেব সশরীরে আমার বাসায় হাজির। তিনি দেখতে এসেছেন সত্যি সত্যি আমি যাচ্ছি কিনা। আমার বাসা থেকে বেরুবার আগে আর

এক উপদ্রব দেখা দিল। সকাল থেকেই আমার বাসার সম্মুখে ভীড় বাড়ছিল। কিছুক্ষণ পর যখন বেশ লোকজন জমা হল, স্লোগান শুনতে পেলাম। আমাকে তারা আর্মির হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে। বহু কষ্টে এদের নিবৃত্ত করলাম। প্রাদেশিক পরিষদ

বিল্ডিং–বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দফতর–এর এক কামরায় শুনানির স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দেখলাম, এসেমব্লি বিল্ডিং–এর রাস্তার দু'ধারে ব্যাপক পুলিশ–ইপিআর মোতায়েন করা হয়েছে। গাড়ী বারান্দায় পৌছতেই আর্মির এক জওয়ান দরজা খুলে

www.pathagar.com

দিল কারের। এক সামরিক অফিসার আমাকে নিয়ে গেলেন একটি কামরায়। বসতে অনুরোধ করতে করতে সিগারেট অফার করলেন। আমি নিজের ব্রান্ড ছাড়া খাই না বলে তাঁকে জানালাম। চা- খাব কিনা জানতে চাইলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, না।' ঠিক দশটায় ঐ অফিসারটি এসে আমাকে পাশের কামরায় নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনজন অফিসার দেখলাম। একজন মেজর জেনারেল, এয়ারফোর্সের এক বাঙ্গালী গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও নৌবাহিনীর সম পদমর্যাদার এক অফিসার। জেনালের সাহেব কালবিলম্ব না করে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করলেন, 'আপনি এখানে নির্ভয়ে এবং বিনা দ্বিধায় কথা বলতে পারবেন। কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। আপনি এখানে ন্যায় বিচার পাবেন।' হঠাৎ তাঁর কথার মাঝখানে বললাম, 'মাফ করবেন, শুনানির আগে আমার দু'টো প্রশ্ন আছে। করতে পারি কি?' তিনি তাঁর কথা থামিয়ে একটু দম নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, বলতে পারেন। বলুন।' বললাম, 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সত্তর-আশি জনকে তিনশ তিনের আওতায় বিচারে আনা হয়েছে। একমাত্র আমাকে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর জবাব লেখার জন্য কোন ফাইল বা কাগজপত্র দেখার অনুমতি দেওয়া হল না কেন? এটা কি আমার বিশেষ কোন পূণ্যের ফল- আপত্তি না থাকলে আমাকে এর কারণ জানান হোক।' আমার কথা শুনে মেজর জেনারেল সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি গ্রুপ ক্যাপটেনের সাথে ফিসফিস করে দু-তিন মিনিট কি সব আলোচনা করলেন। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'এখন যদি আপনাকে সে সুযোগ দেওয়া হয় আপনি কি তা গ্রহণ করতে রাজী আছেন?' বললাম, 'আমি যদি এখন সে সুযোগ নেই তবে যে জবাবটা লিখেছি তার অবস্থাটা কি হবে? আজকের এই শুনানির কি হবে? দ্বিতীয়তঃ এই কিছুক্ষণ আগে আমাকে ন্যায় বিচারের যে কথা বলা হল এবং আমি এখানে আমার সব কথা নির্ভয়ে বলতে পারব বলে যে আশ্বাস দেওয়া হল- সে প্রেক্ষিতে শুধু এটা জানতে চাই, ওপর থেকে আপনাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার বাইরে যাবার সত্যি সত্যি কি আপনাদের কোন এখতিয়ার আছে এই ট্রাইবুনালে?' জেনারেল সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় বিব্রত কর অবস্থায় পড়লেন মনে হল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর জেনারেল তপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'এ ছাড়া আর কিছু বলার আছে আপনার?' বুঝলাম তিনি চটে গেছেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, 'হ্যাঁ, আর একটা কথা বলার আছে। আমাকে কি সাজা দেওয়া হবে তা আগেই নিদ্ধারণ করে আপনাদের এখানে বসান হয়েছে। সুতরাং ন্যায় বিচারের কথাটা এখানে না বললেই ভাল হত। ন্যায় বিচার তখনই সম্ভব যখন আমাদের আজকের এই অবস্থানের রদবদল হবে। ধন্যবাদ, আমার আর কিছু বলার নেই।'

ট্রাইবুনালের কাজ আর এগুল না। মাত্র ছ'-সাত মিনিটেই শেষ। আমার কথার কেউ জবাব দিলেন না। শুধু গ্রুপ ক্যাপটেন কাউকে ডেকে বললেন, 'এঁকে গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এস।'

বাসায় ফিরে দেখি সবাই অধীর আগ্রহে আমার অপেক্ষা করছেন। পরিবারের লোকজন দোয়া দরুদ পড়ায় ব্যাস্ত। চৌধুরী সাহেব তো গাড়ী বারান্দায় পায়চারী করছিলেন অনেকক্ষণ যাবত। তিনিই প্রথম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাগারাগি

www.pathagar.com

করনি তো? এত তাড়াতাড়ি এলে কি করে?' রসিকতা করে বললাম, 'স্যার,ওরা রাখতে চাইল না তাই চলে এলাম।' বসার ঘরে ঢুকতেই এক সাথে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। পূর্ব পাকিস্তানে আমিই এক নাম্বার আসামী। আমিই সর্বপ্রথম ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হলাম। সুতরাং যাঁদের ডাক পরে আসছে, তাঁরা তো ট্রাইবুনালে কি হল, জানতে চাইবেনই। তা ছাড়া, সবার মনে ট্রাইবুনাল সম্পর্কে একটা প্রচন্ড ভীতি আছে, সেখান থেকে কিভাবে ফিরে এলাম – তা জানার আগ্রহ তো এদের কম নয়!

বন্ধুদের কাছে সবিস্তারে সব বলতে হল। আমার ভূমিকায় তাঁরা খুশী হতে পারলেন না। তাঁরা মনে করেন আমার নরম হওয়া উচিত ছিল।ওঁদের চটিয়ে ভাল কাজ করি নি। মানুষ আশাবাদী। ওঁদের না চটালে ওঁরাও হয়তো কোন উপকারে আসতেন। বন্ধু-শুভাকাঙ্খীদের কথা আমার মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারল না। উল্টো, আমি যে আমার মনের কথাগুলো ট্রাইবুনালের সামনে যথাযথভাবে বলতে পেরেছি– সেজন্য দারুণ আনন্দবোধ করছিলাম।

সামরিক সরকার আনীত অভিযোগগুলোর আমি যে লিখিত জবাব দিয়েছিলাম তা সংক্ষেপে এই ছিলঃ

(ক) ভারত থেকে বিতাড়িত অসহায় মুসলমানদের মোমেনশাহী সীমান্তে আমি ঠান্ডা মাথায় পুনর্বাসিত করেছি। এটা আমার মানবিক দায়িত্ব ছিল। আগামীতে আল্লাহ্ তালা আমাকে এ রকম সুযোগ দিলে আমি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব।

(খ) আমি লাহোর ষ্টাফ কলেজে থাকাকালে আমার সহকর্মী পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন– সরকার গেজেট জারী করেই তা করেছেন। তাঁর কোন সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে দায়ী করা সেই ঈশপের গল্পের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ সিংহ মেষ শাবককে বলছে তুই আমার পানি ঘোলা করিসনি তো কি হয়েছে, আগে তোর বাপ-দাদা কেউ করেছে। জবাবে এটাও লিখেছিলাম, যে কর্মকর্তা আমার বিরুদ্ধে এই চার্জটি নথিভূক্ত করেছেন তার চাকরী থাকা উচিৎ নয়।

(গ) আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মত আইনের ব্যাখ্যা করে কাজ করেছি। এতে ভুল হতেই পারে আর এর প্রতিকারের উপায় এই হতে পারত যে সরকার তা উল্টে দিতেন। তবে আমি এখনো মনে করি সমবায় কৃষি ঋণের সূদের হার শতকরা ১৮ থেকে ১৭ তে নামিয়ে কোন ভুল করিনি।

(ঘ) মানুষকে বেইজ্জত করতে চাইলেও তার একটা রীতি থাকা উচিৎ। কিন্তু আমাকে বেইজ্জত করতে গিয়ে কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত কাজ করা হয়েছে। একজন রেজিস্টার তাঁর গাড়ীর ড্রাইভারের সাথে ড্রাইভারের ডিএ একশ ঊনসত্তর টাকা ভাগ করে আত্মসাত করেছে– এটা শুধু হাস্যকরই নয়, নিতান্ত অপমানজনকও।

(ঙ) ডিআইটিতে থাকাকালে আমার আচরণ সর্বজনবিদিত ছিল– আমার জানা নেই– এটা কোন অভিযোগ হতে পারে কিনা!

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা থেকে

পি এ নাজির ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান সারা পাকিস্তান থেকে যে ৩০৩ জন সরকারী কর্মকর্তাকে চাকরীচ্যুত করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।